শতাব্দীর তথ্যপঞ্জী

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
শিলচর

শতাব্দীর তথ্যপঞ্জী

বরাক উপত্যকার সামগ্রিক তথ্য সঙ্কলন

(বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক)

প্রথম খণ্ড

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনট

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি

শিলচর

সম্পাদনা সমিতি
বিজিৎ চৌধুরী
বিজয় ধর
সুবীর কর
অনুরূপা বিশ্বাস
অমলেন্দু ভট্টাচার্য
নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী
নীতিশ ভট্টাচার্য (আহ্বায়ক)

প্রথম প্রকাশ
৪ শ্রাবণ: ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
২১ জুলাই। ১৯৯৮ ইংরাজী

প্রকাশক
নীতিশ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
শিলচর, আসাম।

গ্রন্থস্বত্ব
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
শিলচর, আসাম।

প্রচ্ছদ
দীপঙ্কর কর

মুদ্রক
প্রাসঙ্গিক প্রিন্টার অ্যান্ড পাবলিকেশনস্
সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-১
ফোন: ৩৭০৫৫

মূল্য ঃ ৬০ (ষাট) টাকা

ভাবী প্রজন্মের হাতে

ভূমিকা

'মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা', 'সুন্দরী শ্রীভূমি'র ছিন্ন-অঙ্গ আর কাছাড় জেলা সংযোগে গড়ে উঠেছে আজকের বরাক উপত্যকা। বিবিধ জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এই উপত্যকায় বাঙালিই সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সুরমা কুশিয়ারার মূল উৎসধারা হল বরাক। বরাকে যেমন জোয়ার জাগে না আসে প্লাবন, তেমনি এ-উপত্যকার মানুষের জীবনেও প্রাণের স্তিমিত স্পন্দনে হঠাৎ হঠাৎ বান ডেকেছে সময়ের স্রোতে, কালের সঙ্কটে। বিড়ম্বিত জীবনে সুখ-স্বপ্ন দেখার চেয়ে স্বদেশের এই প্রান্তীয় অধিবাসীদের সংগ্রাম করতে হয় ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও দারিদ্র্য আর বেকারত্বের অন্তহীন দুর্বিষহতার মধ্যে করতে হয় কালাতিপাত। আগ্রাসনের, শোষণের ও অবমাননার কৌশল বদলায়, কিন্তু চরিত্র পাল্টায় না। অবাঞ্ছিত, অপমানসূচক নানা প্রশ্ন, প্রভুত্ব আর প্রচারের সুবিধাজনক ব্যবহারে বিকৃত তথ্যের বেসাতি এর প্রতিরোধে জবাব দিতে হয়েছে 'বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'কে 'বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে সত্য ও তথ্য' পুস্তিকা প্রকাশ করে। কিন্তু অপপ্রয়াস বন্ধ হয়নি, বিভ্রান্তিও দূর হয়নি। এই উপত্যকা নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি হয়েছে বিস্তর, কিন্তু কোনও গ্রন্থে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সামগ্রিক পরিচিতিকে তুলে ধরার অপূর্ণতাটি থেকে গেছে। এই লক্ষ্য পূরণে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ১৩৯৯ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন কার্যসূচির সঙ্গে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের তথ্য ও ঘটনাবলি পঞ্জীয়নেরও উদ্যোগ গ্রহণ করে। শতাব্দীর ইতিহাস, সাহিত্য চর্চা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, ভাষা আন্দোলন, চারুকলা, আর্থ-সামাজিক স্বরূপ, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়া জগৎ প্রভৃতি বিষয়ের তথ্যভিত্তিক পরিচিতি তুলে ধরে ভাবী প্রজন্মকে তার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ারও একটি দায়বদ্ধতা 'সম্মেলন'-এর রয়েছে। এই তথ্যপঞ্জী সেই দায়িত্ব পালনে কিছুটা সমর্থ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এটি একটি প্রয়াস মাত্র এবং কোনও ইতিহাসই প্রথম প্রচেষ্টায় পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠেনা। এই তথ্যপঞ্জীর সূত্র ধরে পরবর্তীতে আরও বিস্তৃত ইতিহাস রচিত হবে বলে আমরা আশা পোষণ করি।

সমগ্র পরিকল্পনাকে দুটি ভাগে বিন্যস্ত করে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডে যে পাঁচটি বিষয় স্থান পেয়েছে সেগুলি হল— বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে সুরমা-বরাক ; প্রসঙ্গ : শিক্ষা বিস্তার: বাংলা সাহিত্য-চর্চার একশ বছর ; সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা; ভাষা আন্দোলনের রূপরেখা।

লেখক কিংবা অন্য কারও কাছে ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন অনাবশ্যক কেন না এ কাজ আমাদের সকলের।

প্রণাম জানাই অমর ভাষা শহীদদের যাঁদের রক্তের মূল্যে বাংলা ভাষার সাংবিধানিক অধিকার আমরা অর্জন করেছি, উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়েছে বাংলা বিদ্যাচর্চার জগৎ।

বিজিৎ চৌধুরী
সভাপতি

নীতিশ ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক
বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে সুরমা- বরাক

কামালুদ্দীন আহমদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

ইতিহাস প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য অনুষঙ্গটি হচ্ছে কাল। কালের নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমণ ইতিহাসকে কালভিত্তিক পর্যায়ে বিভক্ত করে। কালভিত্তিক এই বিভাজনের নামই পর্যাবৃত্তায়ন। এই পর্যাবৃত্তায়নই কোনও বিশেষ জাতি, দেশ, ভূখণ্ড বা সমস্ত মানবজাতির উৎপত্তি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ক্রমকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সংজ্ঞায়িত করে। ভারত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের পর্যাবৃত্তায়ন এই প্রক্রিয়ার এক উৎকৃষ্ট নজির। বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক বরাক উপত্যকার ইতিহাস প্রক্রিয়ায় একটি সঙ্কীর্ণ পর্যাবৃত্ত। এই সময়সীমায় উপত্যকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ঝোঁকটি মুখ্যত ক্রিয়াশীল তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণই উল্লেখিত শতাব্দীর আলোকে সৃষ্ট ইতিহাসের মৌলিক উপাদান। কিন্তু ইতিহাস প্রক্রিয়া কোনও বিশেষ সময় বা শতাব্দীর সূচনাকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয় না। ইতিহাসের প্রক্রিয়া নিত্য প্রবহমান-কাল থেকে কালান্তরে অবারিত গতি। সামাজিক বিকাশের বৈচিত্র্যময় এবং গ্রন্থিল বিন্যাস পরম্পরা তার গতিপথ নির্দেশ করে। কাজেই ইতিহাসের কোনও বিশেষ পর্যাবৃত্তের আলোচনায় তার অতীত প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে অনুস্যূত। কিন্তু যে-ভূখণ্ডকে ভিত্তি করে ইতিহাসের ধারা প্রবাহিত, ইতিহাস আলোচনায় সে-ভূখণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান প্রাথমিক আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

ভৌগোলিক অবস্থান : বঙ্গীয় ১৪০০ সালের বরাক উপত্যকা মূলত ১৩০০ সালের ব্রিটিশ ভারতের আসাম প্রদেশের সুরমা উপত্যকার এক খণ্ডিতাংশ। উপত্যকার বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান মুখ্যত ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে সংঘটিত স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফল। উত্তরে উত্তর কাছাড় জেলার পার্বত্য অঞ্চল দক্ষিণে ত্রিপুরা ও মিজোরামের পাহাড়, পূর্বে মণিপুর ও আঙ্গামি নাগা পাহাড়, অর্থাৎ উপত্যকাটি তিনদিকে পর্বত এবং পশ্চিমদিকে বাংলাদেশের সমতলভূমি পরিবেষ্টিত দক্ষিণ আসামের সমতল ভূ-ভাগ বর্তমান বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত। বরাক ও তার দুই শাখা নদী সুরমা ও কুশিয়ারা এবং তাদের অসংখ্য উপনদী বিধৌত এ-সমতল ভূখণ্ড কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি নামের তিনটি প্রশাসনিক জেলায় বিভক্ত। তিনটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা কোনো প্রশাসনিক অঞ্চল নয়, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান তাকে আসাম রাজ্যর মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। উত্তর কাছাড়ের দুরতিক্রম্য পর্বতরাজির মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে রেল যোগাযোগ এবং বিপদ-সঙ্কুল পার্বত্য পথে মেঘালয় রাজ্যের মধ্য দিয়ে সড়ক যোগাযোগ আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে এ-উপত্যকার সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এ-উপত্যকা বঙ্গ সমভূমির পূর্ব প্রান্তিক সম্প্রসারণ এবং সংস্কৃতিগতভাবে বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতির পরিসীমাভুক্ত। বিভাগ-পূর্ব পর্যায়ে এ-উপত্যকার পরিধি আরো বিস্তৃত ছিল এবং বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট ও আসামের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা সহ এই বিস্তৃত ভূভাগ ব্রিটিশ আসামের সুরমা উপত্যকা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে যেমন উপত্যকার প্রধান নগরী শিলচর বরাকের প্রাণকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে, ঠিক তেমনি বিভাগ-পূর্বকালে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট শহরই ছিল সুরমা উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র।

রাজনৈতিক পটভূমি : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে উত্তরণে সুরমা-বরাক উপত্যকা যে বিরাট কাল অতিক্রম করে এসেছে, তা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, উপত্যকার তিনটি

জেলার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া সব সময় একই সূত্রায়নে প্রবাহিত হয়নি। ফলে সামাজিক বিকাশও সমভাবে ঘটেনি। প্রাগৈতিহাসিক ধূসরতা-ক্লিষ্ট অতীতের বিবরণ এখনও অনাবিষ্কৃত থাকলেও একথা বলা যায়— ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এ-অঞ্চলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য ভূভাগের মতো প্রাগৈতিহাসিক যুগ প্রলম্বিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক যুগে এ অঞ্চল পর্যায়ক্রমে কামরূপ রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য সমতট এবং শ্রীহট্ট রাজ্য প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যযুগে বর্তমান করিমগঞ্জ জেলা পর্যায়ক্রমে তুর্ক আফগান ও মুঘলদের শাসনাধীন ছিল। বর্তমান কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলার অধীনস্থ ভুভাগে ত্রিপুরা রাজ্যের সম্প্রসারণ, স্থানীয় রাজাদের শাসন, কোচরাজ্যের সম্প্রসারণ এবং ডিমাসা রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডিমাসা শাসনকালে আহোম রাজত্ব এ দুই জেলায় সম্প্রসারিত হলেও সেটা ছিল এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর স্থায়িত্ব ছিল অতি স্বল্পকালীন। বর্তমান করিমগঞ্জ জেলা মুঘল শাসনকালে বাংলা সুবার সিলেট সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ১১৭১ বঙ্গাব্দে (১৭৬৫ খ্রিঃ) ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার দেওয়ানি লাভ করে, তখন করিমগঞ্জ সহ সমস্ত সিলেট সরকার কোম্পানির শাসনাধীনে চলে যায়। অবশ্য বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে কোম্পানির শাসন সম্প্রসারণ করতে ব্রিটিশ শাসকদের আরো সময় লেগেছিল এবং বেগ পেতে হয়েছিল। জেলার দক্ষিণাঞ্চলে প্রতাপগাড় রাজ্যে রাধারাম নামক জনৈক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী নবাব উপাধি ধারণ করে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং কোম্পানির সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে সে-অঞ্চলে ১১৯৩ বঙ্গাব্দের (১৭৮৬ খ্রিঃ) পূর্বে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হতে পারেনি।

অপর দিকে বর্তমান কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলাছয়ে ১২৩৯ বঙ্গাব্দ (১৮৩২ খ্রিঃ) পর্যন্ত ডিমাসা রাজাগণ স্বাধীনভাবে শাসন করেছিলেন। ১১৯৩ বঙ্গাব্দে করিমগঞ্জ এবং ১২৩৯ বঙ্গাব্দে কাছাড় ও হাইলাকান্দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির করায়ত্ত হয়ে ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ খ্রিঃ) আসাম ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বরাক উপত্যকায় কাছাড় ও হাইলাকান্দি এবং আসামের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠিত কাছাড় জেলা এবং করিমগঞ্জ সহ শ্রীহট্ট জেলা ব্রিটিশ ভারতের ঢাকা বিভাগের অধীনস্থ থাকে। ১২৮১ বঙ্গাব্দে আসামকে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে উন্নীত করার সময়ে নবগঠিত প্রদেশটিকে অর্থনৈতিক সক্ষমতা দানের অভিপ্রায়ে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দুটিকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই জেলা দুটি সুরমা উপত্যকা অভিধায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার : মহাকাব্যের যুগে যখন আর্য সংস্কৃতির বিস্তারে বঙ্গ সমভূমিতে আর্য-পূর্ব সংস্কৃতি এবং আর্য সংস্কৃতির মধ্যে আত্তীকরণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বর্তমান বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত হচ্ছিল তখনও সুরমা উপত্যকায় মঙ্গোলীয় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষী মঙ্গোলীয়দের মধ্যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। কালক্রমে ঐতিহাসিক যুগের প্রাথমিক পর্বে পশ্চিমবঙ্গ, ঢাকা এবং উত্তর ভারত থেকে আর্যভাষী অধিবাসীরা সুরমা উত্যকার উর্বর ভূমির আকর্ষণে এখানে প্রবেশ করতে থাকে এবং লাঙ্গল ভিত্তিক আর্য সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও এ-অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আর্যদের শান্তাশ্রয়ী জীবনদর্শন অভিবাসী আর্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় সুরমা বরাক উপত্যকার আমজনতার ব্যক্তি ও ব্যাষ্টি জীবনে জীবনদর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি অনুপ্রবেশ করতে পারল না, বরং লোকায়ত দর্শনই জীবনায়নের প্রগতিতে অভিকেন্দ্রিক শক্তিরূপে পূর্ববৎ বহাল থাকল। বৈদিক পূজা অনুষ্ঠান যাগ-যজ্ঞের চেয়ে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চক এবং জীবনায়নের সঙ্গে যুক্ত স্বাভাবিক ধারণাগুলির মূর্তায়নই আধ্যাত্মিকতার মুখ্য রূপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। সাংস্কৃতিক জীবনের এই রূপটির সঙ্গে বঙ্গ সমভূমির সাংস্কৃতিক রূপের বিশেষ ব্যবধান কিন্তু থাকল না।

বঙ্গদেশে তুর্ক আফগানদের অভ্যাগমের পূর্বে সুরমা উপত্যকায় যে-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা মোটামুটিভাবে বাঙালি সংস্কৃতিরই স্থানীয় রূপান্তর। তুর্কিদের বঙ্গ বিজয়ের পর সুরমা উপত্যকা সংস্কৃতিগতভাবে বাংলার একাংশ হয়ে পড়ে। কারণ, ওই সময়ে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা থেকে বিরাট সংখ্যক ব্রাহ্মণ এবং উচ্চকোটির বাংলাভাষী লোকেরা এ-অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। খ্রিস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই করিমগঞ্জ সহ শ্রীহট্ট জেলা তুর্কি সুলতানদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হয়ে যাওয়ার ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতার এ-অঞ্চলে তীব্রতর হয়।

তুর্কিদের সঙ্গে আগত সুফীবাদের আধ্যাত্মিক চেতনা বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে এক নতুন মাত্রা জুড়ে দিয়েছিল। সুরমা বরাকেও তার প্রভাব লক্ষিত হয়। হজরত শাহজালাল এবং তাঁর শিষ্যদের দ্বারা ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে এ উপত্যকায়। সুফীবাদের অভিঘাতে সারা ভারতে শাস্ত্র বর্জিত ভাবধর্ম বা ঈশ্বর ধর্মের যে উদ্ভব ঘটল তার প্রবল তরঙ্গ বঙ্গ সমভূমির এ-প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুভূত হলো। যাবতীয় শাস্ত্রতত্ত্বের প্রতিবাদী মহাবাউল শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত সহজ অনুরাগের ধর্ম সারা বঙ্গদেশে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে যে ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল তার তীব্র প্রভাবে বরাক উপত্যকার সাংস্কৃতিক জীবনকে বেগবন্ত করে তুলেছিল। বৈষ্ণব ধর্মের এই প্রেমধারা এত প্রবল ছিল যে নব্য হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত শাক্ত ডিমাসা রাজাগণ কিন্তু তাঁদের নামকরণে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব মুক্ত হতে পারেননি।

উত্তরাধিকার স্রোত ও ঐতিহ্য পরম্পরায় নির্মিত বরাকের এই সাংস্কৃতিক প্রবৃদ্ধিতে বাংলাই একমাত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে মুঘল যুগে শ্রীহট্টের স্থানীয় দলিল দস্তাবেজে এবং ডিমাসাদের রাজত্বকালে তাঁদের শাসন কার্যের ব্যবহৃত ভাষা ছিল বাংলা।

এ-জাতীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে প্রথমে শ্রীহট্ট জেলা ও পরে কাছাড় জেলা কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনার পূর্বেই বাংলাদেশে উদ্ভুত খ্রিস্টিয় উনিশ শতকীয় নবজাগরণের প্রবাহ এ-উপত্যকায় বিস্তার লাভ করার ফলে এ-অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনেও আধুনিকতার স্পর্শ স্পষ্টত অনুভূত হয়েছিল।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম : বরাক উপত্যকার বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান মুখ্যত ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে ভারতের ইতিহাসে দেশ বিভাগ নামক যে বিদারণ ঘটেছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। ১৩০১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পর্যাবৃত্তে বর্তমান বরাক উপত্যকা ছিল তদানীন্তন সুরমা উপত্যকা নামক আসাম প্রাদেশিক প্রশাসনিক বিভাগের একটি অংশ। সুতরাং বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে বরাক উপত্যকার ইতিহাস প্রক্রিয়ায় প্রধানত দুটি পর্যায়ক্রম বিদ্যমান। প্রথমটিকে সুরমা উপত্যকা পর্যায় অভিধায় ভূষিত করা যায়। আবার উভয় পর্যায়েই বঙ্গীয় সমভূমির প্রত্যন্ত এ অঞ্চলের ইতিহাসের সাধারণকৃত চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে ইতিহাস প্রক্রিয়ার তিনটি ঝোঁক একটি সর্বভারতীয়, দ্বিতীয়টি প্রাদেশিক বা রাজ্য পর্যায়ের এবং তৃতীয়টি স্থানীয়। তবে প্রশাসনিক বিন্যাসে কোনো পর্যায়েই এ-উপত্যকার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত না থাকলেও উপত্যকার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য সকল পর্যায়েই স্বীকৃত থাকায় এ ভূখণ্ডের ইতিহাস প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট এঙ্কংঃ এই আঞ্চলিক প্রবৃদ্ধিই জাতীয় ইতিহাস প্রক্রিয়ায় বিশেষ অবদান যোগাতে সমর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুরমা উপত্যকা পর্যায়

সুরমা উপত্যকার প্রশাসনিক অবস্থান : সুরমা উপত্যকা পর্যায়ে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার প্রশাসনিক অবস্থানে তিনটি পর্যায়ক্রম বিদ্যমান। ১৩০১ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত জেলা দুটি চিফ কমিশনার শাসিত আসাম প্রদেশের সুরমা উপত্যকা নামে পরিচিত ছিল। তখন বর্তমান কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা দুটি কাছাড় জেলার শিলচর ও হাইলাকান্দি নামক দুটি মহকুমা এবং করিমগঞ্জ জেলা শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার বৃহদাংশে বিস্তৃত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাছাড় জেলার অপর মহকুমাটি ছিল উত্তর কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জেলার অন্যান্য মহকুমাগুলি ছিল শ্রীহাট সদর, মৌলবিবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ। ১৩১২ বঙ্গাব্দে লর্ড কার্জন ঔপনিবেশিক শাসকদের 'ভেদ ও শাসন' নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করলে সুরমা উপত্যকাও নববিন্যস্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারত ইতিহাসে এই প্রশাসনিক বিন্যাস 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও আন্দোলনের তোড়ে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং আসাম একটি গভর্নর শাসিত প্রদেশে উন্নীত হয়। কিন্তু বঙ্গ সমভূমির পূর্ব প্রান্তিক প্রত্যন্ত অঞ্চল সুরমা উপত্যকাকে আবার আসাম প্রদেশের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দুটি দুজন ডেপুটি কমিশনার ও মহকুমাগুলির প্রত্যেকটিতে একজন সাবডিভিশন্যাল অফিসার বা মহকুমাধিপতি ছিলেন প্রশাসক। সুরমা

উপত্যকা এবং লুসাই পাহাড়, নাগা পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় ও গারো পাহাড় জেলাগুলি একজন কমিশনারের প্রশাসনিক অঞ্চলরূপে পরিগণিত হয়। সুরমা উপত্যকার এই প্রশাসনিক স্থিতি ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে দেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল।

ইতিহাস প্রক্রিয়ার মূল প্রবাহ : সুরমা উপত্যকা পর্যায়ের কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে ১৩০৪ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প, ১৩২২ ও ১৩৩৬ সালের অভূতপূর্ব প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উদ্ভুত বিশ্ব পরিস্থিতির পরোক্ষ প্রভাবে আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে সিলেটে মুরারীচাঁদ কলেজ, ১৩৪২ সনে শিলচরে গুরুচরণ কলেজ এবং ১৩৫৩ সনে করিমগঞ্জে করিমগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠা, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের চট্টগ্রাম-শিলচর রেলপথের বদরপুর ও গুয়াহাটি-তিনসুকিয়া রেলপথের লামডিং-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন কল্পে ৩৭ সুড়ঙ্গ বিশিষ্ট পাহাড় লাইন নির্মাণ এবং ১৩১০ বঙ্গাব্দে এর উদ্বোধন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দে করিমগঞ্জ থেকে কলকলিঘাট এবং এর পরবর্তী সময়ে বারৈগ্রাম, দুর্লভছড়া ও কাটাখাল-লালাঘাট রেলপথের সম্প্রসারণ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দে সুরমা ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ এবং পরবর্তী সময়ে তা থেকে করিমগঞ্জ-অলিভিয়াছড়া সড়ক, শিলচর-হাইলাকান্দি সড়ক প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ ও শ্রীহট্ট কাছাড় জেলায় চা শিল্পের প্রসার প্রভৃতির ফলে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এসব কর্মকাণ্ডের অনুষঙ্গ হিসেবে নগরায়ন প্রক্রিয়াও অব্যাহত ছিল। ফলে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে শিলচর পৌরসভা, ১৩২০ বঙ্গাব্দে করিমগঞ্জ পৌরসভা এবং পরবর্তীকালে ১৩৩১ বঙ্গাব্দে হাইলাকান্দি নগর সভা (Town committee) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব সত্ত্বেও ইতিহাস প্রক্রিয়ার মূল ধারাটি প্রবাহিত হচ্ছিল চেতনার উন্মেষ ও বিকাশে। সর্ব-ভারতীয় আবেদন, প্রাদেশিক স্তরে দ্বন্দ্ব এবং স্থানীয় সমস্যাবলি ইতিহাস প্রক্রিয়ার গতিপথ নির্দেশ করেছিল।

সর্ব-ভারতীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুরমা উপত্যকার অবস্থান : ইতিহাসের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সুরমা উপত্যকা যখন বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকে প্রবেশ করে তখন ভারতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিণত পর্যায়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকশিত অবয়বে তত দিনে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। কারণ ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রসাদে সৃষ্ট ও লালিত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থানের অনিবার্যতা তখন প্রকটিত, কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল না হওয়ায় ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন ও আপসের নীতি অবলম্বন করলে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক আরম্ভহওয়ার মাত্র আট বছর আগে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে (১২৯২ বঃ) ব্রিটিশ ব্যুরোক্র্যাসির সুধী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। তরুণ ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রাচীন ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের অপরিহার্য সংঘাতের মোকাবিলায় ও ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ পুঁজির আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সমর্থন লাভের জন্য ঔপনিবেশিক শাসকরা ভেদ ও শাসনের নীতি প্রয়োগে তৎপর হন। পশ্চিমী চিন্তা চেতনার অভিঘাতে খ্রিস্টিয় উনিশ শতকে এদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লগ্নে এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ দ্বিজাতিতত্ত্বের সূত্রায়নে দ্বিধাবিভক্তির লক্ষণাক্রান্ত ছিল। তাই ব্রিটিশ শাসকরা তাদের ভেদ ও শাসন নীতির সফল প্রয়োগের অনুকূল পরিবেশ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সর্বভারতীয় ইতিহাস প্রক্রিয়ায় যখন এই টানাপোড়েন বিদ্যমান, তখন সুরমা উপত্যকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাগ্রসর অংশের চেতনায়ও এর অনুরণন ধ্বনিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসকরা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও বাণিজ্যিক স্বার্থ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ভারতের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পায়নের প্রসার ও নগরায়নের প্রক্রিয়ায় তাঁদের প্রয়োজনভিত্তিক তৎপরতা দেখালেও ভারত ইতিহাসে এসব পদক্ষেপ ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উদ্ভাবনে এগুলির ইতিবাচক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুরমা উপত্যকায়ও এর অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল এবং সর্বপ্রথম এর ব্যাপক অভিব্যক্তি ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে।

সুরমা উপত্যকায় রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ : ১৩১২ বঙ্গাব্দে সুচিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সুরমা উপত্যকায় স্বাদেশিক চেতনার বিকাশ ঘটলেও এর পূর্ববর্তী কয়েকটি ঘটনা উপত্যকার প্রাগ্রসর শ্রেণীতে রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় করিমগঞ্জের লাতু অঞ্চলে মালেগড় টিলায় ও হাইলাকান্দির মোহনপুরে সংঘটিত দুটি খণ্ড যুদ্ধ ছাড়াও বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক আরম্ভের পূর্বে ঘটিত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। ১২৭৮ বঙ্গাব্দে (১৮৭১ খ্রিঃ) তরুণ বাঙালি আই সি এস সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় (১২৫২-১৩৩২ বঃ) সিলেটের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে নথিপত্রে কাটাকুটি করার অজুহাতে মাসিক ৫০ টাকা অনুকম্পা বৃত্তিসহ অপসারিত হন। সুরেন্দ্র নাথের প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদে সিলেটের বুদ্ধিজীবীরা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

২। ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ খ্রিঃ) শ্রীহট্ট জেলাকে তার শতশত বছরের বঙ্গীয় অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং প্রায় চার দশক পূর্বে অধিকৃত বঙ্গভাষী কাছাড়ি রাজ্যকে জেলায় পরিণত করে যখন আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তখন সিলেটের আইনজীবীরা এর প্রতিবাদ করে বড়লাট নর্থব্রুকের নিকট স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন।

৩। বর্তমান করিমগঞ্জ জেলার লাতু অঞ্চলের কবি প্যারীচরণ দাস কলকাতায় কোনো অফিসে করণিকের কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বচসা, হাতাহাতি এবং ধস্তাধস্তির পরিণতিতে প্যারীচরণের এক অনিচ্ছাকৃত আঘাতে ভদ্রলোকের মৃত্যু ঘটে। আদালতে সত্য কথা বলার জন্য প্যারীচরণের মাত্র তিনমাসের কারাদণ্ড হয় এবং কারাবাসের ম্যাদান্তে তিনি সিলেটে চলে আসেন ও ১২৮২ বঙ্গাব্দে (১৭৭৫ খ্রিঃ) শ্রীহট্ট প্রকাশ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাই সুরমা উপত্যকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। স্বাদেশিক চিন্তাধারা উন্মেষে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৪। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২ খ্রিঃ) মাইবং-এ সম্বুধাম নামক জনৈক ডিমাসার অভ্যুত্থান, লোকসংগ্রহ, ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, মেজর বিওডকে (Byod) হত্যা এবং অবশেষে পরাজিত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কাছাড়ের প্রতিক্রিয়ারূপে গণ্য হয়।

৫। ১৩০০ বঙ্গাব্দে (১৮৯৩ খ্রিঃ) সংঘটিত বালাধন হত্যা মামলার সঙ্গে রাজনৈতিক কারণ যুক্ত না থাকলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মণিপুরিদের প্রতিক্রিয়াই প্রকটিত হয়েছে। বালাধন চা বাগানে গভীর রাত্রে বাগানের ম্যানেজার ও চৌকিদারকে হত্যা করা হয়েছিল। ছয়জন মণিপুরিকে গুর্খা সৈন্যরা গ্রেপ্তার করেছিল, সিলেট দায়রা আদালতে তাদের চারজনকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং মুজনকে দ্বীপান্তরের শাস্তি দিলে বাবু কামিনী কুমার চন্দ কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। মামলাটি সমস্ত বঙ্গদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মামলা পরিচালনার জন্য কামিনী কুমার চন্দকে অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। বালাধন হত্যা মামলার বিবরণ এত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে ডব্লিউ এস কেইন (W. S. Caine) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই মামলার পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে গোঁজামিল এবং সিলেট দায়রা আদালতে এর বিচারে পক্ষপাতদুষ্টতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

উপযুক্ত ঘটনাবলি পরবর্তীকালে স্বাদেশিক চেতনা উন্মেষে কোনো প্রত্যক্ষ অবদান না রাখলেও জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকার সচেতনতার অঙ্কুরোদ্গমে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ও সুরমা উপত্যকার প্রতিক্রিয়া : বঙ্গভঙ্গ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুসৃত 'ভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগের এক নিকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচীন রোমের সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই নীতি তাঁদের সাম্রাজ্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। ১৮২১ খ্রিঃ (১২২৮ বঃ) এশিয়াটিক জার্নাল পত্রিকায় জনৈক ইংরাজ কর্মচারী রোমের অনুকরণে ভারতে ইংরাজ সরকারকে ভেদনীতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। স্যর জন সুন্নাচির মতো দক্ষ কর্মচারী ভারতীয়দের ধর্মগত বিভেদের সুযোগ গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের পর ইংরাজ সরকার এই নীতি অনুসরণ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সমর্থন করেন। ইংরাজ সরকারের ধারণা হয় যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের জন্য প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ই দায়ী। সুতরাং মুসলিম সম্প্রদায়কে দাবিয়ে রাখার জন্য তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের সরকারি চাকুরিতে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করেন। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ইংরাজ সরকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়কে কাজে লাগাতে আরম্ভ করেন। এই পরিস্থিতিতে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩১২ বঃ) তাঁর বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ। এ-ছাড়া বাঙালিদের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র জাতিসত্তাবোধের অস্তিত্ব অনুভব করে আশঙ্কিত ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। তাই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিকে রোধ করা ও বাঙালি জাতিকে সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভাজন করার জন্য লর্ড কার্জন পশ্চিমবাংলা, বিহার ও ওড়িশা নিয়ে একটি প্রদেশ এবং পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে আরেকটি প্রদেশ গঠন করেন। মুসলমান প্রধান পূর্ব বাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি মুসলিম বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গকে বিহার, ওড়িশার সঙ্গে যুক্ত করে একটি অবাঙালি প্রধান প্রদেশ গঠনের দ্বারা তিনি বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা করেছিলেন।

কার্জনের রাজনৈতিক ব্যবচ্ছেদের বেদনায় বাঙালি জাতি শিহরে ওঠে। বেদনা থেকে ক্রোধ এবং ক্রোধ প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়। সারা বঙ্গদেশ জুড়ে আরম্ভ হয় প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে তিনটি পর্যায়ক্রম লক্ষিত হয়। প্রথম পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিমদের সভাসমিতিতে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। সুরেন্দ্র নাথ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর পাশে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, বিপিনচন্দ্র, মৌলবি আব্দুল রসুল প্রমুখ নেতাও এসে দাঁড়ান। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কায়েম হলে বাঙালি জাতি অরন্ধন, উপবাস করে এর প্রতিবাদ জানায়। হিন্দু, মুসলমান ও দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে রাখীবন্ধন পালন করা হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এইভাবে প্রথম প্রতিবাদী আন্দোলনের পালা সাঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই আন্দোলন চরমপন্থীদের হাতে চলে যায়। শ্রীহট্ট সন্তান বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার ও শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। বাঙালি জাতি বিলাতি সামগ্রী বর্জন ও বয়কট করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন গঠন করে।

তৃতীয় পর্যায়ে 'স্বদেশীর' আদর্শ গৃহীত হয়। স্বদেশী আন্দোলন বলতে বিলাতি জিনিসের পরিবর্তে দেশে তৈরি জিনিস ব্যবহারের আন্দোলন বোঝায়। এটা ছিল বয়কট আন্দোলনের পরিপূরক। বয়কট ছিল নেতিবাচক, আর স্বদেশী ছিল ইতিবাচক। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম সক্রিয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রভাব ক্রমে বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও লালা লাজপৎ রায়, মাদ্রাজে সুব্রহ্মণ্য আয়ার, চিদাম্বরণ পিল্লাই এবং দিল্লিতে সৈয়দ হায়দর রেজা এই আন্দোলন গঠন করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরাজ সরকার আন্দোলনের চাপে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৮ বঃ) বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগে কিন্তু সুরমা উপত্যকা আসামের সঙ্গেই থেকে যায়।

কার্জনি ব্যবচ্ছেদে সুরমা উপত্যকার বাঙালিরা তাদের প্রদেশ ভিত্তিক সংখ্যালঘিষ্ঠ অবস্থান থেকে বাংলার বৃহত্তর অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হলেও ব্রিটিশ সরকারের দূরভিসন্ধি তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

তাই বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও প্রভূত সাড়া পড়ল। ১৩১২ বঙ্গাব্দে কামিনী কুমার চন্দকে সভাপতি, অবনী নাথ দত্ত সম্পাদক, মহেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, কালিমোহন দেব, রাধারমণ দর, দুর্গা শঙ্কর দত্ত, ড' নগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, দীননাথ দত্ত, রামতারক ভট্টাচার্য, নুর মোহাম্মদ লস্কর, কুশীরাম নমঃশূদ্র প্রমুখকে সদস্য করে কাছাড় স্বদেশী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কাছাড়ে আন্দোলন পরিচালনা করে এবং বয়কট ও স্বদেশীর আদর্শ প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে। শ্রীহট্ট জেলায় এই আন্দোলন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পরিচালিত হয়। বিপিন চন্দ্র পাল, কামিনী কুমার চন্দ, ড' সুন্দরী মোহন দাস, শ্রীশচন্দ্র দত্ত, সতীশ চন্দ্র দেব, দুলাল চন্দ্র দেব, শ্যামাচরণ দেব এবং শ্রীভূমির অন্যান্য কৃতি সন্তানের যৌথ নেতৃত্বে সমস্ত সুরমা উপত্যকায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপক সাড়া জাগায়। এছাড়া সিলেট থেকে প্রকাশিত সিলেট ক্রনিকল, পরিদর্শক, শ্রীভূমি, শিলচর থেকে প্রকাশিত শিলচর এবং করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ইসার্ন ক্রনিকূল প্রভৃতি সংবাদপত্র জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশী চেতনা ও দর্শন প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

এই পরিস্থিতিতে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সিলেটের তেলিহাওরে হিমেন্দ্র নাথ পালের বাড়িতে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কামিনী কুমার চন্দ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। বহুলোকের সমাবেশে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ সূচক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং স্বদেশী আদর্শ গ্রহণের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই সময়ে সিলেটে একটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবু অবিনাশ চন্দ্র দত্ত, হবিগঞ্জের সুরেশ চন্দ্র দেব এবং শিলচরের ভুবনমোহন বিদ্যার্শব ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। পরে শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে হবিগঞ্জে আরেকটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মৌলবি বাজারের মহেন্দ্র চন্দ্র দে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

সে-বৎসর বিপিন চন্দ্র পাল শিলচর আগমন করেছিলেন এবং মালুগ্রামে প্রকাশ্যস্থানে একটি বিরাট জনসভায়, সদরঘাটে আয়োজিত শিলচর শহরের শুক্লবৈদ্য সম্প্রদায়ের এক সভায় এবং মহেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে মহিলাদের এক সভায় ভাষণ দান করে স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। ফলে ব্যাপকভাবে বিদেশী বস্তু বর্জন আরম্ভ হয়েছিল এবং শিলচরের শুক্লবৈদ্য সম্প্রদায় বিদেশী বস্ত্র ধোলাই না করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ওই বৎসর পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর (ছোটলাট) মিঃ ফুলারের হবিগঞ্জ আগমন উপলক্ষে উকিল দেবেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও অন্যান্য স্বদেশী নেতৃবৃন্দের ধর্মঘটের আহ্বান অভূতপূর্ব সাফল্য লাভকরেছিল। ছোটলাটকে পায়ে হেঁটে সাত মাইল অতিক্রম করতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার নানাবিধ দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তারমধ্যে একটি ছিল কারলাইল সার্কুলার। এ-সার্কুলার অনুযায়ী ছাত্রদের আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারি নির্দেশনামা অগ্রাহ্য করে শিলচর সরকারি হাইস্কুলের ছাত্ররা জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ অব্যাহত রাখেন। এমন কি ছোটলাট ফুলারের শিলচর আগমন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার প্রয়োজনে ধার্য চাঁদা দিতেও কয়েকজন ছাত্র আপত্তি করেন। তাঁরা একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্যাপন করেন। ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা অধিকর্তা শিল্ডর সরকারি হাইস্কুলের ৩৯ জন ছাত্রকে বরখাস্ত করার আদেশ দেন। তার মধ্যে ৩৮ জন ক্ষমা প্রার্থনা করে শাস্তিভোগ থেকে অব্যাহতি পান। কিন্তু অপূর্ব কুমার চন্দ (কামিনী কুমার চন্দের পুত্র) ক্ষমা প্রার্থনা না-করে শান্তিনিকেতনে চলে যান।

এদিকে, স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন আরম্ভ হয়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে বিপিনচন্দ্র পালকে গ্রেপ্তার করে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সে বছর ড' রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিভাজন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং চরমপন্থীরা কিছুকালের জন্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শেষদিকে বিপিনচন্দ্র পাল জেল থেকে বেরিয়ে সুরমা উপত্যকা ভ্রমণে আসেন। এর কিছুদিন পরই অনুষ্ঠিত হয় সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে করিমগঞ্জ শহরের রমণী মোহন দাসের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যকার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাধা বিনোদ দাস, প্রধান অতিথি ছিলেন ঋষি অরবিন্দ এবং মুখ্য বক্তার আসনে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। এই অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষা এবং কংগ্রেসের বিভাজন রোধের অনুকূলে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের মধ্যে বিভাজন লক্ষ্য করে নরমপন্থীদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে বড়লাটের (ভাইসরয়) কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য এবং ছোটলাটের (প্রাদেশিক গভর্নর) কার্যনির্বাহী পরিষদে কয়েকজন ভারতীয় সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, যেসব প্রদেশে আইন পরিষদ নেই সেগুলিতে আইন পরিষদ গঠন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলিতে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যাবৃদ্ধির বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়। এতেও কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায়নি।

মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণয়নের এক বৎসর পর সুরমা উপত্যকার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। জলসুকায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। এই অধিবেশনেও বিপ্লবী স্বাদেশিকতার বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং শ্যামাচরণ দেবকে প্রধান শিক্ষক করে আরেকটি স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

দমনমূলক নীতি, লোভনীয় আইন প্রভৃতি কিছুতেই যখন আন্দোলন দমিত হলো না, তখন ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করে নেন ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১২ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রিঃ) এবং ওই বৎসরই (জানুয়ারি, ১৯১২ খ্রিঃ) তা কার্যকর হয়। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরিত হয়, সুরমা উপত্যকা সহ আসাম পুনরায় একটি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হয়। সুরমা উপত্যকায় কিন্তু আন্দোলন থামেনি। উপত্যকার নেতৃবৃন্দ শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বঙ্গদেশ ভুক্তির দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সিলেট বেঙ্গল রিইউনিয়ন লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, রায় বাহাদুর গিরিশ চন্দ্র নাগ, রায় বাহাদুর রমণী মোহন দাস প্রমুখ নেতা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'শ্রীহট্টের মুসলমানেরা প্রথমদিকে স্বদেশী আন্দোলনে কিছুটা আকৃষ্ট হলেও আন্দোলনে ক্রমশঃ হিন্দু ধর্মীয় ভাবধারা ও আচার আচরণের অনুপ্রবেশ দেখে সরে যেতে শুরু করেন।' (রণেন্দ্র মোহন দেব শ্রীহট্ট পরিচয়, ১৯৮৩, পৃঃ ২০৫) এছাড়া 'শ্রীহট্টের মাহিষ্য সমাজ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। সুনামগঞ্জ ও ঢাকা থেকে ইস্তাহার প্রকাশ করে তারা রাজদ্রোহমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়'। (প্রাগুক্ত)

সুরমা উপত্যকায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ : ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দুই বিপরীতমুখী ভাবাদর্শের প্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল ইংরেজদের ন্যায় বিচারের প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করে সংসদীয় প্রক্রিয়ায় ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। 'স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা' তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। এঁরা ইতিহাসে নরমপন্থী বা আপসপন্থী বলে পরিচিত। শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, এঁরা ছিলেন সমাজের উচ্চকোটি ও আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত সফল শ্রেণীর লোক। সার ফিরোজ শাহ মেহতা, দাদাভাই নওরোজি, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ছিলেন নরমপন্থীদের নায়ক। আপসহীন অন্য দলের লক্ষ্য ছিল 'স্বরাজ'। তাঁরা আবার স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী দয়ানন্দ প্রচারিত

ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে উদ্ভুত সংগ্রামী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ইতিহাসে এঁরা চরমপন্থী অভিধায় খ্যাত। সুরমা উপত্যকার কৃতি সন্তান বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রিঃ) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই নব্য-জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে স্পষ্টতর বিভাজনের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। সুরাট কংগ্রেসের পর সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতার পরিচালনায় জাতীয় ভাবধারায় পরিণত হয়। এরপর থেকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ তিনটি খাতে প্রবাহিত হয়। যথা— (১) আত্মশক্তি গঠন, গ্রাম উন্নয়ন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, কুটির শিল্প ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের উপর জোর দেওয়া; (২) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বয়কট, স্বদেশী প্রভৃতি এবং (৩) সশস্ত্র বিপ্লব।

সুরমা উপত্যকায় এই তিন খাতেরই প্রভাব পড়েছিল। স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বয়কট ও স্বদেশী প্রভৃতির কথা উপরে আলোচিত হয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনার জন্য 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠা হয়। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে (১৯০২ খ্রিঃ) কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ব্যায়ামাগারে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়। হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই পরবর্তীকালে এই অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়েছিলেন। যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির প্রভাবে সুরমা উপত্যকায়ও কয়েকটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্রীশচন্দ্র দত্ত, বসন্ত দাস পুরকায়স্থ, দেবেন্দ্র নাথ চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ধর, রমণী মোহন রায়, উপেন্দ্র রায়, মনোরঞ্জন সিংহ, মোহিনী বর্মন প্রমুখ বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ নেতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুহৃদ্ সমিতি। উপেন্দ্র ধর, তারাকিশোর বর্ধন, কালীরাম ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পরিচালনা করেন তরুণ সঙ্ঘ এবং লীলা নাগের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রীসন্তেঘর কর্মতৎপরতা প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খ্রিঃ) ঠাকুর দয়ানন্দ (পূর্বনাম গুরুদাস চৌধুরী) এবং তারাকিশোর চৌধুরী শিলচরের নিকটে অরুণাচল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর কিছুদিন পরই প্রতিষ্ঠিত হয় মৌলবি বাজারের জগৎসী আশ্রম। অরুণাচল আশ্রমে রাজদ্রোহের প্রস্তুতি চলছে এবং বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এই অজুহাতে পুলিশ আশ্রম বন্ধ করে দেয়। স্বামী দয়ানন্দ তখন জগৎসী আশ্রমে অবস্থান করতে থাকেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের (১৩১৯ বঙ্গাব্দে) ৮ জুলাই রাত্রে মহকুমা শাসক মিঃ জি গর্ডনের আদেশে পুলিশ বাহিনী জগৎসী আশ্রমে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে স্বামী দয়ানন্দের শিষ্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্র চন্দ্র দে-কে আহত করে এবং পরে তিনি মারা যান। স্বামী দয়ানন্দকে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই ঘটনা খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং মৌলবি বাজারের মহকুমা শাসক মিঃ গর্ডন বিপ্লবীদের আক্রমণের লক্ষ্য হন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের (১৩২০ বঙ্গাব্দ) ২৭ মার্চ রাত্রে লোকেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী নামক অনুশীলন সমিতির সদস্য জনৈক যুবক গর্ডনকে হত্যা করতে গিয়ে বোমা ফসকে পড়ায় মৃত্যুবরণ করেন। গর্ডন তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবে বদলি হয়ে যান, কিন্তু সেখানেও বিপ্লবীরা তাঁকে অনুসরণ করলে তিনি পদত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান।

সিলেট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান করিমগঞ্জ জেলা) আয়লাবাড়ি চা বাগানে বিপ্লবী নেতা অরুণ গুহ (স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), ভূপতি মজুমদার (বাংলার মন্ত্রী), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য সেন ও রাজেন দাস ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রিঃ) কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন এবং ফলে শিলচর, হাইলাকান্দি ও হবিগঞ্জে যুগান্তর দলের কর্মতৎপরতা প্রসারিত হয়। অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলি ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীও শ্রীহট্ট কাছাড়ে এসেছিলেন। ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের সীমান্তের একটি জনবিরল স্থানে তাঁরা বোমা তৈরির গোপন কারখানা বানাতে চেয়েছিলেন। শ্রীসন্তেঘর সুধীর নাগ ও অনিল দাস মৌলবি বাজারে তাঁদের সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ ভগৎ সিংহের ফাঁসির পর মুরারীচাঁদ কলেজের ছাত্ররা ভগৎ সিংহ ও দীনেশ গুপ্তের প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করেছিলেন।

সুরমা উপত্যকায় ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি স্বদেশী ডাকাতির ঘটনা থেকে। ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশটি বন্দুক চুরির ঘটনা, মৌলবি বাজারে গুদাম ভেঙে কার্তুজ ও গুলি চুরির চেষ্টা, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি দুই রানারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ছিনতাই, মার্চ মাসে ইটাখলা রেলস্টেশনে মেল ডাকাতি ও হবিগঞ্জের উমেদপুরে সংঘটিত ডাক ছিনতাই, সেপ্টেম্বর মাসে আরেকটি মেল ডাকাতি, ৫ ডিসেম্বর আরেকটি মেল ডাকাতি ও ৮ ডিসেম্বর আজমিরিগঞ্জের ডাকঘর পুড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও সুরমা উপত্যকার বিপ্লবীরা উপত্যকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

এসব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য বানিয়াচঙ্গের সুশীল সেন নদীয়া জেলার প্রাণপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন, ইটাখলার ডাকাতির জন্য কুমিল্লা কলেজের ছাত্র হবিগঞ্জের অসিত ভট্টাচার্যের সিলেট জেলে ফাঁসি হয়, মৌলবি বাজার মহকুমার ভোজপুরের নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজা দত্ত কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এবং পরে আগ্রা জেলে প্রাণত্যাগ করেন। উমেদপুরের ছিনতাই ঘটনার সঙ্গে জড়িত গোপেন্দ্রলাল রায় ও সত্যেন্দ্র দাসের দ্বীপান্তর হয় এবং বিভিন্ন স্থানে বোমা নিক্ষেপ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বহু যুবকের কারাদণ্ড ও দ্বীপান্তর হয়।

সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন : সুরমা উপত্যকায় কংগ্রেস অনুসৃত স্বদেশী ধ্যান-ধারণা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সারদা চরণ শ্যাম ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ও আইনের স্নাতক এবং চা কর সারদা চরণ শ্যাম শ্রীহট্ট জেলার ইন্দেশ্বর পরগণায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুরমা উপত্যকায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রথম তিনটি অধিবেশনের কথা বিবৃত হয়েছে। এই তিনটি অধিবেশন যথাক্রমে তেলিহাওর, করিমগঞ্জ ও জলসুকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (জুলাই ১৯২০) শ্রীশচন্দ্র দত্তের সংগঠনে করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। এই অধিবেশনে একটি তীব্র সংগ্রাম সংগঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (সেপ্টেম্বর ১৯২০) সিলেট শহরে রতনমণি লোকনাথ টাউন হল প্রাঙ্গণে এই সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মৌলবি আব্দুল করিম এবং বক্তা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, মৌলানা আক্রাম খাঁ ও সুন্দরী মোহন দাস। কংগ্রেসের সংগঠন সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের গুরুত্ব হ্রাস পায় ও ক্রমে তা লুপ্ত হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন : ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই সুরমা উপত্যকায় কংগ্রেসের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত না হলেও এর প্রথম অধিবেশনেই উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কাছাড় নেটিভ জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ম্যানেজার দীননাথ দত্ত, হবিগঞ্জের ছাতিয়াইন গ্রামের কলকাতা প্রবাসী ছাত্র (কর্মজীবনে শিলচরের অধিবাসী) কামিনী কুমার চন্দ (১৮৬২-১৯৩৬), ব্রাহ্মসমাজ সংগঠক বাগ্মী বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২, জন্মস্থান সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার তরফ পরগণার পৈলগ্রাম) ও কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত ব্যবহারজীবী জয় গোবিন্দ সোম (নেটিভ খ্রিস্টান জন্মস্থান আখালিয়া, সিলেট) সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সুরমা উপত্যকার নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন এবং খ্রিস্টিয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক সুরমা উপত্যকার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের কর্ম তৎপরতার মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচি সুরমা উপত্যকার জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কংগ্রেস মহলে একটি আশার সঞ্চার হয়েছিল যে যুদ্ধের অবসান হলে ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ চুক্তির দ্বারা কংগ্রেস মর্লি-মিন্টো

সংস্কার আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা মেনে নেয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টে গু-চেক্সফোর্ড আইনেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এই আইনে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার বিধিবদ্ধ না হওয়ায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঞ্চিত হয়েছেন বলে মনে করেন। এই সঙ্কটকালে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্বে বৃত হন। গান্ধীজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে দেশবাসীকে আহ্বান জানান। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৭ বঙ্গাব্দে) গান্ধীজি সিলেট ও কাছাড় ভ্রমণ করেন এবং তখন থেকেই সুরমা উপত্যকায় সূচিত হয় কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া।

নিয়মতান্ত্রিক কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠন হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) এবং প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে কামিনী কুমার চন্দ ও শ্যামলেন্দু দেব। ওই বৎসরই করিমগঞ্জ মহকুমা কমিটি গঠিত হয় এবং সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদে বৃত হন যথাক্রমে সতীশ চন্দ্র দেব, হাজি মতছিম আলি চৌধুরী ও রমণী মোহন রায়। তখন থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সুরমা উপত্যকার সক্রিয় যোগাযোগ সংগঠিত কংগ্রেসের দ্বারাই পরিচালিত হয়।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন : ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার তিন দশকাধিক কালের পুরাতন 'আবেদন নিবেদন নীতি' বা 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' ত্যাগ করে সক্রিয় আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। এই সংগ্রামের হাতিয়ার ছিল অহিংস অসহযোগ। এই সময় তুরস্কের খলিফার পদলোপ এবং ইসলামের পবিত্র স্থানগুলিতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের প্রতিবাদে ভারতের মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস খেলাফত দাবিকে সমর্থন জানায়। ফলে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একই সঙ্গে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে সুরমা উপত্যকা পুনরায় উত্তাল হয়ে ওঠে। সুরমা উপত্যকার রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন ছাড়াও করিমগঞ্জ, জকিগঞ্জ, বীরশ্রী, লাউতা, কুরুয়া, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে খেলাফত সভা আহূত হয়েছিল। ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব প্রমুখ নেতা অসহযোগ আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজ ও মাদ্রাসার অনেক ছাত্র পড়াশোনা ত্যাগ করে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। ২৫ জানুয়ারি তাঁরা একটি শোভাযাত্রাও বের করেন। ৭ মার্চ মৌলবি বাজারের যোগিডহবে আসাম প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। এই সভায় ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিলেটের মৌলানা আব্দুল মুসাব্বির, মৌলানা আব্দুল হক, মৌলানা সফিকুল হক এবং মৌলানা আব্দুর রসিদ কাছাড় জেলা ভ্রমণ করেন এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় জেলা খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। মধুরবন্দের পির মহম্মদ আলিকে সভাপতি করে এই কমিটি গঠিত এবং শিলচরে স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌলানা পির মহম্মদ ইয়াকুর, খান সাহেব রশিদ আলি লস্কর প্রমুখ ছিলেন মুখ্য খেলাফত কর্মী। মহিমচন্দ্র বিশ্বাস, ড° নগেন্দ্র নাথ দত্ত, দীননাথ দত্ত, গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত, সতীন্দ্র মোহন দেব প্রমুখ কংগ্রেস নেতা খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। নব্বই হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সতীন্দ্র মোহন দেব ও মহঃ গুলেজর আলি মজুমদার যথাক্রমে বাহিনীর অধিনায়ক ও সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিদেশী পণ্য বর্জন, চরকায় সূতা কাটা, খদ্দর পরিধান, ইংরেজি স্কুল-কলেজ বর্জন, আইন-আদালত ত্যাগ প্রভৃতি ছিল অহিংস অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্গত।

করিমগঞ্জে এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মৌলবি ইদ্রিছ আলি ও তাঁর ভ্রাতা মাহমদ আলি (পরে খান বাহাদুর), মৌলানা খুর্শিদ আলি, মৌলানা আহমদ আলি, মতাছিম আলি চৌধুরী, নীলামবাজারের হাজি আব্দুল আজিজ (আর্জদ হাজি নামে পরিচিত) এবং কনকপুরের মৌলানা মোহাম্মদ আলিম প্রমুখ। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে করিমগঞ্জের খেলাফত পন্থীরা তাঁদের অসহযোগিতা অব্যাহত রাখেন

এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জ এম ই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই এম ই মাদ্রাসা পরবর্তীকালে হাই মাদ্রাসায় উন্নীত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনে উপত্যকার চা বাগানগুলিতে কুলিরাও দীর্ঘদিনের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার আশায় উদ্বেলিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২ তারিখে করিমগঞ্জ মহকুমার চরগোলা ও লঙ্গাইয়ের তেরোটি চা বাগানের কুলিরা অকস্মাৎ ধর্মঘট ঘোষণা করে। এরা করিমগঞ্জ থেকে সুরমা মেলে ভ্রমণ করে দলে দলে চাঁদপুর স্টেশন চত্বরে সমবেত হয়, উদ্দেশ্য ছিল পদ্মা পার হয়ে গোয়ালন্দ থেকে ট্রেন ধরে দেশ অভিমুখে রওনা হবে। চাঁদপুর স্টেশনে ২১ মে তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নির্দেশে গুর্খা সৈন্যরা তাদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। সমগ্র দেশে এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সুরমা উপত্যকার খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন প্রবল বেগে চলছিল, কিন্তু দু-এক জায়গায় কিছু হিংসাত্মক ঘটনার সূত্রপাত হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধীজি অকস্মাৎ সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দিলেও সুরমা উপত্যকায় তার জের চলছিল দীর্ঘদিন ধরে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল মাইজভাগের খেলাফত কর্মী মগফুর আলি আমিনের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার মিথ্যা অজুহাতে খানাতল্লাসি করতে গিয়ে গোলাপগঞ্জ থানার দারোগা আব্দুল হামিদ আখন্দ গুর্খা ফৌজ ও পুলিশ সহ বাড়ির লোকজনের উপর অত্যাচার করে এবং বইপত্র ও কোরাণশরিফ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। আমিন ছেঁড়া কোরাণ নিয়ে সিলেট শহরে যান এবং জনসমক্ষে ঘটনাটি তুলে ধরেন। জনশক্তি পত্রিকায় ঘটনাটির সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক সতীশচন্দ্র দেব ও মুদ্রক অনাথবন্ধু দাসকে রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত করা হয়। সতীশচন্দ্র দেব ও অনাথবন্ধু দাস জেলা জজের আদালতে আপিল করেন। এই সময় সিলেটের জেলা জজ ছিলেন বি এন রাও। তিনি গোপনে মগফুর আলি আমিনের বাড়ি গিয়ে বিষয়টির সত্যতা নির্ধারণ করেন এবং অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দেন। এই ঘটনাটি মাইজভাগের ছিন্ন কোরাণের ঘটনা নামে বিখ্যাত।

এই ঘটনার জের সুদুরপ্রসারী হয়েছিল। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজধানী শিলং শহরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে সিলেট সদর থেকে নির্বাচিত সদস্য রণিকালির আব্দুল হামিদ চৌধুরী ছিন্ন কোরাণের নায়ক আব্দুল হামিদের বরখাস্তের ব্যাপারে বাংলা ভাষায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করায় সরকার পক্ষ থেকে জুডিশিয়াল মেম্বার উত্তর না দিয়ে নীরবতা পালন করেন। তখন হবিগঞ্জের সদস্য গোপেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী ও সিলেটের সদস্য ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পীড়াপীড়িতে সরকার পক্ষ থেকে জুডিশিয়াল মেম্বার জানান যে বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করলে উত্তর দেবার বিধান আইনে নেই। এই কথার পর পরিষদে তুমুল বিতর্ক হয় এবং ঘণ্টা দেড়েক বাক্-বিতণ্ডার পর আব্দুল হামিদ চৌধুরীকে বাংলায় বক্তৃতা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে ১৯২৭ সালে আসাম পরিষদে বাংলা ভাষার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ কানাইঘাট মাদ্রাসার বার্ষিক জলসা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সুরমা উপত্যকার কমিশনার মিঃ ওএবস্টার নিজে উপস্থিত হয়ে ১৪৪ ধারা কার্যকর করার চেষ্টা করলে উন্মত্ত জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে ঘটনাস্থলে ছয়জনের মৃত্যু হয়। পরে কানাইঘাটে পিটুনি পুলিশ বসিয়ে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

সুরমা উপত্যকায় আইন-অমান্য আন্দোলন : ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়। লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাছাড় জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামাচরণ দেব এবং সিলেট জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী সুরমা উপত্যকায় আইন

অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, সতীন্দ্র মোহন দেব, গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত, পৃথ্বিশ নাগ, সাজিদ রাজা মজুমদার, খুশিদ আলি, সতীশচন্দ্র দেব, শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ নেতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ছাত্ররাও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আসামের শিক্ষা অধিকর্তা মিঃ কানিংহাম এক নির্দেশ জারি করে মাধ্যমিক স্কুল সমূহের ছাত্র ও তাঁদের অভিভাবকদের যে-কোনও ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবেন বলে লিখিত মুচলেকা দিতে আদেশ দেন। বহু ছাত্র এর তীব্র প্রতিবাদ করে শিলচর, করিমগঞ্জ ও সিলেটের সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল ত্যাগ করেন। তখন ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, সতীন্দ্র মোহন দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শিলচরে কাছাড় স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বি সি গুপ্ত নামক এক বাঙালি সদাশয় চা কর সহ স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান দেন। ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত স্কুলের সম্পাদক ও অবৈতনিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। এছাড়া গিরিজা মোহন দত্ত, প্রমোদ কুমার ভট্টাচার্য, কামিনী কুমার চক্রবর্তী ও গোলাম ছবির খান প্রমুখ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। করিমগঞ্জেও অনুরূপভাবে পাব্লিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠায় শ্রীশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র দাম এবং ইন্দ্রকুমার দাস প্রমুখ নেতা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সিলেটের জমিদার রায় বাহাদুর গোপিকারমণ রায় স্কুলের ভূমি দান করেছিলেন এবং প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসরাজ দাস।

গান্ধীজির ডান্ডি অভিযানের অনুসরণে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ধীরেন্দ্র কুমার দাসগুপ্ত নোয়াখালি অভিমুখে যাত্রা করেন। ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের জনসাধারণকে চৌকিদারি কর না দেওয়ার নির্দেশ দেন। করিমগঞ্জের একটি স্থানে লবণ আইন ভঙ্গ করার নেতৃত্ব দেওয়ায় সুরেশচন্দ্র দেবকে ছয়মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শ্রীহট্ট জেলায় আন্দোলনের পুরোভাগে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বসন্ত কুমার দাস, হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু কিশোর সেনগুপ্ত, নীরেন্দ্র নাথ দেব, শিবেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭ মে হরতালের ডাক দিয়ে ১৪৪ ধারা ভেঙে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রার উপর আসাম রাইফেলস-এর গুর্খা সৈন্যরা নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল। সতীন্দ্র মোহন দেব, ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত ও করিমগঞ্জের মতছিম আলি সহ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এই আন্দোলনে অনেক মহিলাও অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং শিলচর ও করিমগঞ্জে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বছর ২২ থেকে ২৪ এপ্রিল শিলচরে সুরমা উপত্যকার যুব সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধীজি শূন্যহাতে ফিরে এলে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক কংগ্রেস বয়কট করে। ইতিমধ্যে নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন পরিকল্পিতভাবে দমন নীতি চালিয়ে আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবার চেষ্টা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয়। আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, বসন্ত কুমার দাস এবং শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ নেতৃত্ব দেন। ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব ভানুবিলে কৃষক সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার কৃষক সরকার ও জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ক্ষীরোদ চন্দ্র দেবকে গ্রেপ্তার করে দেড় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভানুবিল সত্যাগ্রহ সারা ভারতে এবং ব্রিটিশ সংসদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। শ্যামাচরণ দেব, সতীশচন্দ্র দেব, হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, প্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে, গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত, হেমচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, সনৎ কুমার দাস প্রমুখ নেতাও এই পর্বে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। সুনীল মোহন এন্দ, মহীতোষ পুরকায়স্থ, সত্যদাস রায়, অচিন্ত্য কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতা শিলচরে কংগ্রেসকে একটা সংগ্রামী শক্তিতে রূপান্তরিত

করেছিলেন। পরমানন্দ দেবনাথ, সাজিদ রাজা মজুমদার, রাজেন্দ্র চন্দ্র পুরকায়স্থ, কাজি রহমত বক্স, রাজচন্দ্র দেশমুখ্য, উমাকান্ত দেব, হুরমত আলি বড়লস্কর, গোলাম ছবির খান প্রমুখ নেতা শিলচর মহকুমার গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। হাইলাকান্দি মহকুমায় মৌলবি আব্দুল মুতলিব মজুমদার, বিদ্যাপতি সিংহ এবং হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ নেতা জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে গান্ধীজি আবার আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়। এরপর সারা বিশ্বে এবং ভারতে কতগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে যার প্রভাব সুরমা উপত্যকায়ও অনুভূত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবি, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান এবং পরে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ এবং এর অব্যবহিত পরই কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি কর্তৃক ভারত ত্যাগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা সারা ভারতের ইতিহাস পর্যায়ের অগ্রগতিতে এক নতুন মোড় নেয়।

সুরমা উপত্যকায় বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলন : ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত ত্যাগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের আহ্বানে সারা দেশে এক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট সচলতা লক্ষিত হয়। সুরমা উপত্যকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সর্বব্যাপী সত্যাগ্রহ প্রসারের জন্য একটি যুদ্ধ পরিষদ (War Council) গঠন করেন। জমিয়তে উলামায়ে-হিন্দের স্থানীয় কর্মীরা কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, জমিয়তে উলামায়ে-হিন্দ নামক মুসলমান ধর্মবিদদের একটি সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গোড়া থেকেই কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিল। আসামের মধ্যে সুরমা উপত্যকায় এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। খান বাহাদুর মাহমদ আলি, মৌলবি আব্দুল মতলিব মজুমদার, মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী প্রমুখ স্বনামখ্যাত কংগ্রেস নেতা মূলত জমিয়তে উলামার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের পতাকা তলে এসেছিলেন। যাই হোক, বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলনে সত্যাগ্রহীরা বদরপুর ও লালা থানা আক্রমণ করেছিলেন। তাছাড়া সমস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা বিকল করে দিতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সরকার নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কংগ্রেস ও জমিয়ত উলেমার নেতৃবৃন্দ ও বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক ও বামপন্থী আন্দোলন : খ্রিস্টিয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে সভ্যতার যে-সমস্যা ও সংকট মূর্ত হয়ে ওঠে তার মৃত্যু-করাল ছায়া সুরমা উপত্যকার জন-জীবনেও পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানের কল্যাণকর মূর্তিটাই মানুষের কাছে বেশি করে প্রতিভাত হতো। কিন্তু মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানের মারণ-কৌশল দেখে মানব সমাজ আতঙ্কগ্রস্ত হল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আকাঙ্ক্ষিত নবজীবনের কোনও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। কোটি কোটি প্রাণের বিনিময়ে যা পাওয়া গেল তার অকিঞ্চিৎকরতা ও অসারতা মানুষের প্রমাদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দেখা দিল মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, মহামারী, নৈতিক বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা এবং ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে গভীর হতাশা। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হল। দেশে দেশে শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় যে-নবশক্তির অভিব্যক্তি ঘটল, তার উদ্বেল ঢেউ সুরমা উপত্যকার শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনেও আছড়ে পড়ল। তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই এ-উপত্যকায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে চরগোলা ও লঙ্গাই চা বাগান থেকে শ্রমিক নিষ্ক্রমণ বিশ্বজোড়া শ্রমিক অসন্তোষেরই এক অসংগঠিত অভিব্যক্তি। তবে এই সময় থেকেই সুরমা উপত্যকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের সূচনা হয়। হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী নামক শ্রীহট্টের এক খ্যাতিমান নেতা পুঁজিতন্ত্র ও জমিদারি প্রথা অবলুপ্তির দাবি জানিয়েছিলেন। সিলেট রায়ত সম্মেলন এবং কৃষক সম্মেলন তখন থেকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তবে কৃষক আন্দোলন প্রথম দিকে কোনোরূপ রাজনৈতিক আদর্শ-প্রণোদিত ছিল না। ১৯৩১

সালে খান সাহেব রশিদ আলি লস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাছাড় জেলা কৃষক সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন অনুরূপ একটি অরাজনৈতিক সমাবেশ ছিল। তবে ত্রিশের দশকেই কৃষক আন্দোলনের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। এই দলকেই কেন্দ্র করে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আসাম বিধানসভার সদস্য অরুণ কুমার চন্দ বিধানসভার ভাষণে বামপন্থী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন
'The spectre of class war is worrying the world and I can see this spectre is looming larger and larger on the horizon of this country everyday.' ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তীব্র প্রভাব ফেলেছিল বলে আইনসভায় তা আলোচ্য বিষয় হয়েছিল। শ্রীহট্টের প্রজাদের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সুনামগঞ্জ থেকে নির্বাচিত আইনসভার সদস্য করুণা সিন্ধু রায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আসাম আইনসভায় দাবি উত্থাপন করেছিলেন। এদিকে, শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ, সদর ও সুনামগঞ্জ মহকুমায় কিষান আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুরমা উপত্যকারয় কিষান সভার সংখ্যা প্রভুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে করিমগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রজা-জমিদার বিরোধের বিভিন্ন প্রকার অভিব্যক্তি ঘটেছিল। এসব আন্দোলনে যাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বীরেশ মিশ্র, চন্দ্রবিনোদ দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, আঙ্গিরা শর্মা, লালা শরদিন্দু দে, অচিন্ত্য কুমার ভট্টাচার্য, করুণা সিন্ধু রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রবোধানন্দ কর, জ্যোতির্ময় নন্দী, সত্যব্রত দত্ত, যজ্ঞেশ্বর দাস, শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, সুধাংশু শর্মা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

করিমগঞ্জ মহকুমা কৃষক অধিবেশন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বারইগ্রামের নিকট তেঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তদানীন্তন বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী সুরেশ চন্দ্র দেব। ওই বৎসরই আবুল হায়াতের সভাপতিত্বে সুরমা উপত্যকার কৃষক সম্মেলন মৌলবি বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সুরমা উপত্যকার শ্রমিক আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের প্রথম দিকে আরম্ভ হলেও উপত্যকার চা-বাগানগুলিতে শ্রমিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বারীন দত্ত এবং প্রবোধানন্দ কর প্রমুখের প্রচেষ্টায় সিলেট-কাছাড় চা মজদুর সংগঠন কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে এই সংগঠন সিলেট-কাছাড় চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন নামে পঞ্জীভুক্ত হয় এবং অরুণ কুমার চন্দ ও সনৎ কুমার আহির যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে বৃত হন। চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে উপত্যকার বিভিন্ন চা বাগানে ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। ১৯৩৯ সালে বরদলৈ মন্ত্রিসভা Tea Garden Labour unrest Enquiry Committee গঠন করেন। এফ ডব্লু হবেনহাল, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, অরুণ কুমার চন্দ, দেবেশ্বর শর্মা এবং হাইকোর্টের একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা না করায় এবং হকেনহালের পদত্যাগের ফলে কমিটি অকেজো হয়ে পড়ে।

১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকায় কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীরা কংগ্রেসের সদস্য হয়ে এবং বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে তাঁদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ১৯৪০ সালে কৃষক আন্দোলনে যোগদানের জন্য বিরাট সংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে যে পনেরোজন কংগ্রেস সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জিতেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য ও যজ্ঞেশ্বর দাস সহ অন্তত নয়জন কম্যুনিস্ট ছিলেন। ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে কৃষক সভার উদ্যোগে শ্রীহট্টের বিভিন্ন গ্রামে যেসব নানকার প্রজা জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন তকবির আলি, মহম্মদ দেদার বক্ত, আব্বাছ আলি পাট্টাদার, শেখ আজহর আলি প্রমুখ।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিলেটে চিত্তরঞ্জন দাস, বারীন দত্ত, দিগেন দাশগুপ্ত প্রমুখ কম্যুনিস্ট সদস্যরা গোপনে তাঁদের কর্মতৎপরতা নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতেন। প্রাণেশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং জ্যোতির্ময় নন্দী নামক দুই কলকাতা প্রবাসী কম্যুনিস্ট সদস্য ওই বৎসরই সিলেটে ফিরে আসেন এবং জ্যোতির্ময় নন্দী

'নয়া দুনিয়া' নামক কম্যুনিস্টদের স্থানীয় মুখপত্র সম্পাদনা আরম্ভ করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুরমা উপত্যকার ছাত্র সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর সংগঠন ও কর্মসূচিতে কম্যুনিস্ট আদর্শের ছাপ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সুরমা উপত্যকার শাখা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা দক্ষিণে অনুষ্ঠিত একটি গোপন অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ওই বৎসর বীরেশ মিশ্র কংগ্রেস ছেড়ে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। অচিন্ত্য ভট্টাচার্য অবশ্য ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন।

আসামের আইন পরিষদ ও আইন সভা এবং সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব : ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আসাম গভর্নর শাসিত প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী আসামে ৫৩ সদস্যের আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ৫৩ সদস্যের মধ্যে ৩৮ জন নির্বাচিত, ৬ জন মনোনীত এবং অবশিষ্ট ১ জন পদাধিকার বলে সদস্য ছিলেন। ৩৮ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ১৩ জন সুরমা উপত্যকা থেকে নির্বাচনের বিধান ছিল। কংগ্রেস এই নির্বাচন বয়কট করেছিল বলে আসামের প্রথম আইন পরিষদে ইউরোপীয় সদস্য, নরমপন্থী ও খেতাবধারী ভারতীয়রাই নির্বাচিত হয়েছিলেন। শ্রীহট্ট জেলা থেকে রায় বাহাদুর রমণী মোহন দাস (করিমগঞ্জ), রায় বাহাদুর প্রমোদ চন্দ্র দত্ত, খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ, খান বাহাদুর আব্দুল হামিদ এবং মৌলানা সুনাওর আলি এবং কাছাড় জেলা থেকে রায় বাহাদুর বিপিন চন্দ্র দেব লস্কর এবং খান সাহেব রশিদ আলি লস্কর নির্বাচিত হয়েছিলেন। আব্দুল মজিদ শিক্ষামন্ত্রী পদে এবং পরের বছর প্রমোদ চন্দ্র দত্ত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এঁদের অনেকেই অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং কেউ কেউ কারাবরণও করেছিলেন। প্রথম আইন পরিষদের সভাপতি প্রথমে একজন ইউরোপীয় ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করলে সিলেটের জমিদার রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত দস্তিদার এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেস আবার বয়কটের পক্ষে মত প্রকাশ করতে চাইলেও কংগ্রেস সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হেকিম আজমল খান প্রমুখ নেতার যুক্তিতে এবং দৃঢ়তায় কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য রক্ষার জন্য বয়কট প্রত্যাহার করা হয়। তখন কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল গঠিত হয় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। সুরমা উপত্যকায় ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব এই দলের একজন সক্রিয় কর্মীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯২৩ সালের আইন পরিষদে কাছাড় থেকে বিপিনচন্দ্র দেব লস্কর ও রশিদ আলি লস্কর এবং শ্রীহট্ট থেকে রমণী মোহন দাস, ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব, ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, আব্দুল মজিদ, প্রমোদ চন্দ্র দত্ত, গোপেন্দ্র লাল চৌধুরী, বসন্ত কুমার দাস এবং সুনাওর আলি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হলেও পরে স্বরাজ্য দলে যোগদান করে দলের উপনেতা পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন ডিব্রুগড় থেকে নির্বাচিত সদস্য মৌলবি ফৈজনুর আলি।

স্বরাজ্য দলের গোপেন্দ্র লাল দাশ চৌধুরী (হবিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত) পরিষদের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রায় বাহাদুর প্রমোদ চন্দ্র দত্ত এবারও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত পরিষদের সভাপতি পদটি ছিল সরকার মনোনীত। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে স্বরাজ্য জাতীয়তাবাদী নির্দল কোয়ালিশনের মনোনীত প্রার্থী সিলেটের আব্দুল হামিদ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

আইন পরিষদের তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পরিষদের কার্যকাল ছিল। এই নির্বাচনে সুরমা উপত্যকা ও শিলং কেন্দ্র থেকে শ্রীশচন্দ্র দত্ত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রাদেশিক আইন পরিষদে কাছাড় থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন

যতীন্দ্র মোহন দেব লস্কর এবং মৌলবি আরজান আলি মজুমদার। সিলেটের ১৩টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনে স্বরাজ্য দলের মনোনীত প্রার্থী এবং অপর ৮টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এইবার স্বরাজ্য দলে বসন্ত কুমার দাসও যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মনোনীত সদস্য কামিনী কুমার চন্দ অবসর গ্রহণ করার ফলে প্রমোদ চন্দ্র দত্ত কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু তিনি পরে আবার প্রাদেশিক পরিষদে ফিরে আসেন এবং আইন ও অর্থ দপ্তরের সচিব নিযুক্ত হন। এই পদে দিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে সিলেটের মৌলবি আব্দুল হামিদ চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে আসীন থাকেন।

চতুর্থ এবং শেষ আইন পরিষদের অধিবেশন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়। এই পরিষদেও গোপেন্দ্র লাল দাশ চৌধুরী সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান সুরমা উপতাকাবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কাজেই প্রাদেশিক আইন পরিষদকে বিরূপ করার জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চিরতন মুচি ও কালীচরণ মুচি নামক দুজন অশিক্ষিত চর্মকারকে দক্ষিণ শ্রীহট্ট ও সুনামগঞ্জ কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আসামে ২২ সদস্য বিশিষ্ট বিধান পরিষদ ও ১০৮ সদস্য বিশিষ্ট বিধানসভার ব্যবস্থা হয়। সদস্যপদগুলি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পুরণ করার আইন বিধিত হয়। এই সময় বসন্ত কুমার দাস কেন্দ্রীয় আইনসভা থেকে প্রাদেশিক রাজনীতিতে ফিরে আসায় ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে সুরমা উপত্যকা থেকে উল্লেখযোগ্য নির্বাচিত সদস্য ছিলেন কাছাড় থেকে অরুণ কুমার চন্দ, হেমচন্দ্র দত্ত, হরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ এবং শ্রীহট্ট থেকে বসন্ত কুমার দাস, মৌলানা সুনাওর আলি, ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব, প্রমোদ চন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্র নাথ আদিত্য, কামিনী কুমার সেন এবং খান বাহাদুর মাহমদ আলি (করিমগঞ্জ) প্রমুখ। এছাড়া বৈদ্যনাথ মুখার্জি সুরমা উপত্যকার চা করদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর স্যর সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। কংগ্রেস সদস্য বসন্ত কুমার দাস অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। গোপীনাথ বরদলৈ কংগ্রেস বিধায়িনী দলের নেতা এবং করিমগঞ্জের ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব উপনেতা পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে ক্ষীরোদ চন্দ্র দেব মহাশয়ের তিরোধান হলে উপনেতা পদে অরুণ কুমার চন্দ নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে সাদুল্লাহ মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং গোপীনাথ বরদলৈ কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভায় করিমগঞ্জ পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি কামিনী কুমার সেন এবং করিমগঞ্জ দক্ষিণ নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি খান বাহাদুর মাহমদ আলি যথাক্রমে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, আইন, বিচার ও সাধারণ বিভাগ এবং সমবায় সমিতি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন।

পরের বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ভারতকে সেই যুদ্ধে টেনে নেবার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি ইস্তফা দেয়। ফলে বরদলৈ মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল শেষ হয় এবং সাদুল্লাহ আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত সাদুল্লাহ মন্ত্রিসভাই আসামে বলবৎ ছিল। অবশ্য ১৯৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত আসামে কোনও মন্ত্রিসভা ছিল না।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ৫০টি আসন দখল করলেও কতিপয় নির্দল সদস্যের সহযোগিতায় গোপীনাথ বরদলৈ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এবারে সুরমা উপত্যকার উল্লেখযোগ্য কংগ্রেস সদস্যরা ছিলেন বসন্ত কুমার দাস, খান বাহাদুর মাহমদ আলি, সতীন্দ্র মোহন দেব, নিবারণ চন্দ্র লস্কর, আব্দুল মতলিম মজুমদার, বিদ্যাপতি সিংহ প্রমুখ। অরুণ কুমার চন্দ কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। বরদলৈ মন্ত্রিসভায় সুরমা উপত্যকা থেকে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বসন্ত কুমার দাস, আব্দুল মতলিব মজুমদার (হাইলাকান্দি), বৈদ্যনাথ মুখার্জি এবং আব্দুর রসিদ (সিলেট) সদস্য ছিলেন। বরদলৈ

মন্ত্রিসভার সময়েই দেশ স্বাধীন হয় এবং শ্রীহট্ট জেলা বিভাজিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সুরমা উপত্যকা : সুরমা উপত্যকার কাছাড় জেলা ভারতের প্রায় পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ছিল বলে তা জাপানি আগ্রাসনের শিকার যেকোনো সময় হতে পারে, এই ভাবনায় সমস্ত জেলাকে প্রায় একটি সামরিক ছাউনিতে পরিণত করা হয়েছিল। ফলে খাদ্যাভাব প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনের পতনের পর বার্মিজ শরণার্থীরা কাছাড়-সিলেটে প্রবেশ করলে তাদের জন্য আশ্রয় শিবির নির্মাণ করা হয়েছিল। এদিকে ডার্বি বাগানে বোমা নিক্ষেপের ফলে জনসাধারণের মধ্যে সীমাহীন আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। শহরগুলি খালি করারও সরকারি চিন্তা জনসাধারণকে আরও ভাবিয়ে তুলেছিল। এদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দু সরকার গঠনের সংবাদ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার, কোহিমা ও ইম্মল পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের আগমন প্রভৃতি সংবাদও সুরমা উপত্যকার জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

স্বাধীনতা লাভ ও শ্রীহট্ট বিভাজন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের জয় হলেও তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করেন। এই মিশন ভারতকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে একটি ফেডারেল সরকার গঠনের প্রস্তাব সহ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দিলে কংগ্রেস সম্মত হয়, কিন্তু মুসলিম লিগ প্রথমে আপত্তি করলেও অবশেষে রাজি হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লিগের পক্ষে লিয়াকৎ আলি খান উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ড° রাজেন্দ্র প্রসাদকে সভাপতি করে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় সংবিধান সভা। এদিকে মন্ত্রী মিশনের গ্রুপ প্রস্তাবে, আসামকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার বিরোধিতায় অসমিয়া নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই মুখর ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ জুলাই আসামের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ নিজে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও আসামের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার বিরোধিতা করে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন। এসব কারণে মহাত্মা গান্ধীও অসমিয়া নেতৃবৃন্দের পক্ষে ঝুঁকে পড়েন। অপরদিকে মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করে এবং পাকিস্তানের দাবিতে আবার অটল হয়ে পড়ে। দেশে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কাছাড় ও সিলেটের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পাকিস্তানের দাবির সমর্থনে জনসমাবেশ হতে থাকে। অবশ্য সুরমা উপত্যকার বহু মুসলিম নেতা পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বদরপুরের পির মৌলানা মোঃ ইয়াকুব এ-জাতীয় একজন নেতা ছিলেন। এই অবস্থায় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা করেন যে ভারতে যাই ঘটুক না কেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইংরেজ সরকার লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করেন।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আসামের জাতীয়তাবাদী মুসলিম অভিবর্তন শিলচরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন মৌলানা মকদ্দছ আলি, মৌলানা মছমন আলি, মৌলবি হরমত আলি বড় লস্কর, এ কে নুরুল হক, কাজী রহমান বক্স, মোঃ সাজিদ রাজা মজুমদার, ইব্রাহিম আলি চৌধুরী (করিমগঞ্জ) এবং খান বাহাদুর মাহদম আলি এম এল এ প্রমুখ। কানাইঘাট থানার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৌলানা ইব্রাহিম চতুলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভার উদ্বোধন করেন তদানীন্তন মন্ত্রী আব্দুল মতলিব মজুমদার এবং যুবনেতা মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী (সিলেট পরে বদরপুর এবং বিধায়ক) এবং জৈন্তার মৌলানা মশাহিদ প্রমুখ নেতা। এই অভিবর্তনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের দাবি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সরকারের অনমনীয় মনোভাব এবং মুসলিম লিগের আন্দোলনের তোড়ে এ-জাতীয় উদ্যোগ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এসে কংগ্রেস ও লিগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর আলোচনা করে ৩ জুন একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। এই শ্বেতপত্র অনুযায়ী পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়। পাঞ্জাব ও ব্যংলা বিভাজন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্টে গণ ভোটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়।

মাউন্টব্যাটেনের শ্বেতপত্র ঘোষিত হওয়ার পর সুরমা উপত্যকায় তীর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিলচর পৌরসভার সভাপতি ও বিধায়ক সতীন্দ্র মোহন দেবের আহ্বানে শিলচরে ৮ জুন এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আসামের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বসন্ত কুমার দাসের গৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, রবীন্দ্র নাথ আদিত্য, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, আব্দুল মতলিব মজুমদার, ললিত মোহন কর, কামিনী কুমার সেন, হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, মোজাম্মিল আলি, লাবণ্য কুমার চৌধুরী, গিরীন্দ্র নন্দন চৌধুরী, গোপেশ চন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁদের অগ্নিগর্ভ ভাষণে শ্রীহট্টের ভারতভুক্তি দাবি করেন।

সমস্ত দাবি উপেক্ষা করে দেশ খণ্ডিত রূপে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭জুলাই সিলেটে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। আসাম সরকারের আইন মেম্বার মিঃ এইচ এ স্টর্ক রেফারেন্ডাম কমিশনার নিযুক্ত হন। গণ ভোটের ফলাফল বের হলে দেখা গেল ২,৩৯,৬১৯ ভোট সিলেট পাকিস্তান ভুক্তির পক্ষে এবং ১,৮৪,০৪১ ভোট আসামে থাকার পক্ষে পড়ে। কাজেই সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিলেট জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং করিমগঞ্জ সহ সমস্ত সিলেট জেলায় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত হয়। তবে সীমানা কমিশনার রেডক্লিফের রোয়েদাদ অনুযায়ী করিমগঞ্জ মহকুমার সাড়ে তিন থানা, বদরপুর, গাথারকান্দি, রাতাবাড়ি এবং করিমগঞ্জ থানার অর্ধেক আবার আসামের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষিত হওয়ার ফলে ১৮ আগস্ট করিমগঞ্জে পুনরায় স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত হয়। করিমগঞ্জ মহকুমার এই সাড়ে তিন থানা করিমগঞ্জ মহকুমা নামে কাছাড় জেলার একটি মহকুমায় পরিণত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাছাড় ও বরাক উপত্যকা পর্যায়

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সুরমা উপত্যকার অধিকাংশ ভূখণ্ড পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপত্যকার খণ্ডিত অবশিষ্টাংশ নিয়ে কাছাড় জেলা পুনর্গঠিত হয়। ফলে এই ভূখণ্ডকে আর কোনো সাধারণ ভৌগোলিক পরিচয়ে চিহ্নিত করার প্রয়োজন থাকে না। প্রশাসনিক জেলা পরিচয়েই এই ভূখণ্ড ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ (১৩৯০ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত আসামের মানচিত্রে এক পৃথক জেলারূপে পরিগণিত থাকে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ মহকুমাকে জেলাস্তরে উন্নীত করার ফলে ভাষ্য-সংস্কৃতি ও জনবিন্যাসের বৈচিত্র্যে সাধারণ চরিত্র অথচ আসামের মূল ভূখণ্ড থেকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন এই অঞ্চলকে একটি সাধারণ অভিধায় আখ্যায়িত করার অনিবার্যতা দেখা দেয়। ফলে এই ভূখণ্ডের প্রধান নদী বরাকের নামানুসারে কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা বরাক উপত্যকা নামক সাধারণ ভৌগোলিক পরিচয় লাভ করে। ১৯৮৯ সালে কাছাড়ের হাইলাকান্দি মহকুমাকে পৃথক জেলা জরে উন্নীত করার ফলে এই সাধারণ ভৌগোলিক পরিচয় আরও পাকাপোক্ত হয়। বর্তমানে বরাক উপত্যকা বলতে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পুনর্গঠিত কাছাড় জেলার তিনটি মহকুমাই বোঝায়। ১৯৯৭ সালে দেশ ভাগের পর শূনগঠিত কাছাড় জেলায় চারাটি মহকুমা ছিল শিলচর, হাইলাকান্দি, উত্তর কাছাড় ও করিমগঞ্জ। ১৯৫২ সালে উত্তর কাছাড় ও মিকির পাহাড় নিয়ে সংযুক্ত উত্তর

কাছাড় জেলা গঠিত হওয়ায় কাছাড়ের একটি মহকুমা কমে গিয়েছিল।

দেশভাগের পর পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আগমনের ফলে কাছাড়ের জনসংখ্যা সাংঘাতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং কাছাড় থেকে কিছু লোকের পাকিস্তান গমনের ফলে জনবিন্যাসে নতুন সমীকরণের উদ্ভব ঘটে। এরূপ সামাজিক পরিস্থিতিতে স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাস প্রক্রিয়াই কাছাড়ের ইতিহাসের মূল স্রোত নির্ধারণের নিয়ামক হয়। অপর দিকে, আসাম রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রাজ্যের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রক্রিয়ায়ও কাছাড় অর্থাৎ বরাক উপত্যকার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ বর্তমান। তথাপি ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে আসামের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে অনৈক্য, এমনকি বিরোধ, বরাক উপত্যকার ইতিহাস প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে বলে এখানে এক আঞ্চলিক ইতিহাস প্রক্রিয়া বর্তমান।

বরাকে স্বাতন্ত্র্য চেতনা : ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা যখন আসাম প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তখন শ্রীহট্টের অধিবাসীরা তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। সিলেটের আইনজীবীরা এর প্রতিবাদ করে বড়লাট নর্থব্রুকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন। জাতীয় চেতনা বিকাশের যুগে সিলেট ও কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটিদ্বয় আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের অধীন না থেকে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের অধীন ছিল। রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সিলেট ও কাছাড়ের এই অবস্থান ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল। অপরদিকে, বাংলাভাষী সিলেট ও কাছাড় জেলাদ্বয় আসামের সঙ্গে থাকায় ব্রহ্মক্ষপুত্র উপত্যকার বুদ্ধিজীবীদের বৃহদাংশে এক ধরনের বাঙালি ভীতি প্রবল ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জওহরলাল নেহরু যখন আসাম ভ্রমণ করেন, অসমিয়া সংরক্ষিণী সভার পক্ষ থেকে নীলমণি ফুকন এবং অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী একখানা স্মারকপত্র প্রদান করে বলেছিলেন, সিলেট এবং কাছাড় আসাম থেকে পৃথক করে দিলে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অভিবাসীর স্রোত বন্ধ করে দিলে অসমিয়া লোকেরা কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থকে পরিণত হবে। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তার নির্বাচনী ইস্তাহারে সিলেটকে আসাম থেকে পৃথক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গোপীনাথ বরদলৈ সর্দার প্যাটেলকে লিখেছিলেন 'মৌলানা সাহেব (আজাদ) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বলে মনে হয় যে, এইসব ব্যাপারে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে বাংলাভাষী সিলেট ও কাছাড় জেলাকে পৃথক করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা, যে উৎকৃষ্ট প্রস্তাবের প্রতি অসমিয়া লোকেরা গত ৭০ বছর ধরে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে।' (Sardar Patel's Correspondence 1945-50 Vol. 3 P. P. 194-6 Ahmedabad 1972-অনুবাদ আমাদের)। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের প্রশাসনিক একত্রীকরণের দ্বারা ও সুরমা উপত্যকার ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীরা মানসিক ঐক্য বোধ করতে পারেননি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আসাম বিধানসভায় গভর্নর এবং শাসকদলের নেতৃবৃন্দের ভাষণে এই মনোভাবই অভিব্যক্ত হয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়া, পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে আসাম বিধানসভার অধিবেশন বসে। তখন আসামে গোপীনাথ বরদলৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার ৫ নভেম্বর গভর্নর সার আকবর হায়দরী বিধানসভায় যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে শুধু আসাম সরকার নয়, অসমিয়া প্রাগ্রসর শ্রেণীর অধিকাংশের মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি তাঁর ভাষণের একাংশে বলেছিলেন 'The native of Assam are now masters of their own house. They have a Government which is both responsible and responsive to them. They can take what steps are necessary for the encouragement and propagation of Assamese language and culture and of the languages and custornes of the tribal people, who are their fellow citizens and who also must have a share in the formation of such policies. The Bengalee has no longer the power, even if he had the will to impose anything on the people of these hills and valleys which constitue Assam. The

basis of such feeling against him as exist is fear, but there is no cause for fear. I would, therefore, appeal to you to exert all the influence you possess to give the stranger in our midst a fair deal, provided, of course, he in his turn deals loyally with us.'

(আসামের স্থানীয় অধিবাসীরা এখন নিজেরাই নিজ রাজ্যের প্রভু। তাদের সরকার তাদের কাছে যুগপৎ দায়বদ্ধ এবং সংবেদনশীল। অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতি এবং অসমিয়াদের সহ-নাগরিক এবং নীতি নির্ধারণে অনিবার্য অংশগ্রহণকারী উপজাতিদের ভাষা ও রীতি-নীতির উন্নয়নে উৎসাহ ও প্রসার সাধনে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করতে পারবেন। সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত আসামের অধিবাসীদের উপর বাঙালি কোনও কিছু আরোপ করতে চাইলেও করতে পারবে না, কারণ বাঙালি এখন আর কোনও শক্তিই নয়। তার বিরুদ্ধে এ জাতীয় মানসিকতার ভিত্তি অবশ্য ভয়, কিন্তু এখন আর ভয়ের কোনও কারণ নেই। বহিরাগত যদি আনুগত্য প্রদর্শন করে তবে তাকে আমাদের মধ্যে রেখে তার প্রতি ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ প্রদর্শন করতে সকল প্রভাব প্রয়োগ করতে আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।)

গণ ভোটে বাংলাভাষী সিলেট জেলার অধিকাংশ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় অসমিয়া শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যে আত্মশ্লাঘার উদ্রেক হয়েছিল গভর্নরের উপরোক্ত ভাষণাংশে তার অভিব্যক্তিই প্রকটিত। তদানীন্তন অসমিয়া শাসকগোষ্ঠী সম্ভবত আনন্দের আতিশয্যে এতই আবেগতাড়িত হয়েছিলেন যে, নবগঠিত কাছাড় জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের প্রায় নব্বই শতাংশ যে বাঙালি তা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কাছাড় জেলায় তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

এই পটভূমিতে ১৯৪৮ সালে কাছাড় জেলাকে ত্রিপুরা ও মণিপুরের সঙ্গে যুক্ত করে একটা রাজ্য গঠনের প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাব 'পূর্বাচল প্রস্তাব' নামে পরিচিত। পঞ্চাশের দশকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি জোরদার হতে থাকায় ১৯৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন সংসদে। তদনুযায়ী সৈয়দ ফজল আলিকে চেয়ারম্যান এবং সর্দার কে এম পানিক্কর ও পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরুকে সদস্য করে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট 'পূর্বাচল পুনর্বিবেচিত' (Purbachal Reconsidered) নাম দিয়ে এই প্রস্তাবটি দাখিল করা হয়েছিল। অবশ্য কাছাড় কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগ এই প্রস্তাবে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃতস্বন্ধে পূর্বাচল প্রস্তাবের কোনো গণভিত্তি ছিল না এবং তা শহুরে প্রাগ্রসর শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং সীমাবদ্ধ থাকায় এর সমর্থনে কোনও গণ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি।

ষাটের দশক শুরু হতে না হতেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের উত্থানের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চিন্তাধারার প্রভাবে ১৯৬০ সালে আসাম বিধানসভায় অসমিয়াকে একমাত্র রাজ্য ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে আসামের ভাষা আইন প্রণয়ন হয়। কাছাড়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং কাছাড়বাসীর স্বাতন্ত্র্য চেতনার অভিব্যক্তি ঘটে কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ১৯৬১ সালের ১৯ মে সমস্ত কাছাড় জেলায় ধর্মঘট পালিত হয়। শিলচর রেল স্টেশনে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে এবং একজন যুবতী সহ এগারোজন যুবক শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। এই আত্মাহুতির ফলে আসামের রাজ্য ভাষা আইন সংশোধিত হয় এবং কাছাড়ে বাংলা ভাষাই সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

১৯৬৭ সালে কাছাড়ে জন মঙ্গল পরিষদ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ তিনটি বিকল্প সহ একটি প্রশ্নর উত্থাপন করেছিল।

(১) আসাম ও সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গঠন করে কাছাড়কে সেই যুক্তরাজ্য কাঠামোর একটি স্বতন্ত্র একক রূপে গণ্য করতে হবে।

অথবা

(২) মেঘালয়, মিজোরাম ও কাছাড় নিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গঠন করে কাছাড়কে একটি স্বতন্ত্র একক রূপে গণ্য করতে হবে।

অথবা

(৩) কাছাড়কে একটি ইউনিয়ন টেরিটরি রূপে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু গণভিত্তির অভাবে এই প্রস্তাবের পক্ষেও কোনও আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এই পটভূমিকায় ১৯৭০ সালে ইউনিয়ন টেরিটরি ডিমান্ড কমিটি গঠিত হয়। এই সংস্থার জন্ম লগ্ন থেকে ইউনিয়ন টেরিটরির দাবি জানিয়ে ১৯৭০, ১৯৮০, ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরির যৌক্তিকতা জনসাধারণ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারেনি। তবে কাছাড় অর্থাৎ বরাক উপত্যকার ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াসে ১৯৭২ সালে কাছাড় জেলা শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি ও ১৯৭৭সালে সংগঠিত কাছাড় জেলা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (পরে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন) সক্রিয় আন্দোলন অব্যাহত রেখে চলেছে। এই দুটি সংস্থার সংগঠনে এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতায় বরাক উপত্যকার সংস্কৃতি কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ উল্লেখের দাবি রাখে। তবে এই প্রসঙ্গে শিলচর নরসিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা মাধ্যম অসমিয়া করার প্রস্তাব এবং ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩৯২ বঙ্গাব্দে) আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অসমিয়া বাধ্যতামূলক পাঠ্য করার নির্দেশে বরাক উপত্যকায় এক তীব্র সঙ্কট সৃষ্টি হয়। বরাকের লোকেরা এই দুটি ঘটনাকে তাঁদের ভাষা-সংস্কৃতির উপর অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করে থাকেন। ১৯৭২ সালে গৌহাটি

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবিদ্যা পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে অসমিয়া ভাষাকেই বেছে নেন এবং দশ বছরের জন্য অসমিয়ার সঙ্গে ইংরেজিও রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সারা বরাক উপত্যকায় তুমুল আন্দোলন শুরু হয় এবং আন্দোলন প্রশমনের জন্য বরাক উপত্যকায় একটি বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন শরৎচন্দ্র সিংহ পরিচালিত সরকার। বরাকবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং তখন থেকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হতে থাকে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির গণ অভিবর্তনে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির অধিবেশনে কাজিক্ষত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'পূর্বভারতী' রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আশির দশকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিকে গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে আরও কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়।

এদিকে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আসাম ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় যেসব ঘটনা ঘটে যায়, তারও প্রভাব বরাকবাসীর উপর তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আসামে লক্ষ লক্ষ বিদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এরূপ একটি গণ-ভীতির উপর ভিত্তি করে সদৌ অসম ছাত্র সস্থা (All Assam Students' Union সংক্ষেপে AASU) বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন প্রথমে কন্ধে, হরতাল, স্কুল কলেজ বয়কট, রেল রোকো, রাস্তা রোকো প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে তা সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। আসামের অনসমিয়াদের হত্যা, ওদের ঘর-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ এবং নির্বাচিতভাবে অনসমিয়া উচ্চপদস্থ অফিসার, ডাক্তার এবং প্রকৌশলীদের হত্যা প্রভৃতি ঘটনা এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। এমনকি নেলি, গহপুর প্রভৃতি স্থানের নজিরবিহীন গণহত্যা সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বরাক উপত্যকায় এ সবের সোচ্চার প্রতিবাদ হয়। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের (১৩৯২ বঙ্গাব্দ) পনেরো আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আন্দোলনকারী ছাত্র সস্থার সঙ্গে একটি চুক্তি করেন, যা 'আসাম চুক্তি' নামে বিখ্যাত। এই চুক্তিতে আসামের অসমিয়া জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতিকেই প্রকারান্তরে আসামের একমাত্র ভাষা-সংস্কৃতি বলে স্বীকার করে

নেওয়া হয়। এছাড়া আসামের অসমিয়া জনগোষ্ঠীর অধিবাসী ছাড়া অন্যান্যদের নাগরিকত্বকে সন্দেহজনক বলে বিবেচনা করার মতো অনুচ্ছেদও চুক্তিতে সন্নিবেশিত হয়। বরাক উপত্যকায় এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির করিমগঞ্জ অধিবেশনে সমস্ত বরাক উপত্যকায় পদযাত্রা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পদযাত্রীদল শিলচরে সম্মিলিত হয়ে এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে আসাম চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে কিছুদিন পরই আসামে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়ার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এবং বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন। নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে এবং আসুর নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গঠিত 'অসম গণ পরিষদ' সংক্ষেপে এ জি পি দল ক্ষমতা লাভ করে। ছাত্র নেতা প্রফুল্ল কুমার মহন্ত মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন।

আসাম থেকে বহিরাগত বিতাড়ন অসমিয়া সংস্কৃতির প্রসার এবং একমাত্র অসমিয়া জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে দায়বদ্ধ অসম গণ পরিষদ সরকারের প্ররোচনায় আসাম মধ্য শিক্ষা পর্ষদ তাদের ১৯৮৩ সালের স্থগিত ভাষা সার্কুলার পুনরায় চালু করার নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ বলে আসামের অনসমিয়া বিদ্যালয়সমূহের ছাত্ররা বাধ্যতামূলকভাবে অসমিয়া ভাষা শিখবে। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের এই সার্কুলার বরাকবাসীরা সঙ্গত কারণে আসামের ভাষা আইনে স্বীকৃত বরাক উপত্যকার ভাষা সংস্কৃতির উপর একটি আগ্রাসন রূপে চিহ্নিত করে। বরাক উপত্যকার বাংলাভাষীরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন পরিচালনা করতে আরম্ভ করে। ছাত্র ও যুব সংগ্রাম সংস্থাগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয় বরাক উপত্যকা সংগ্রাম সমন্বয় সমিতি। সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালের জুন মাস থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন চলতে থাকে। ঘটনা প্রবাহে পরিস্থিতি যখন অগ্নিগর্ভ তখন অসম গণ পরিষদ পরিচালিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তের বরাক উপত্যকা সফরের কার্যসূচি ঘোষিত হয়। ২১ জুলাই তাঁর ভ্রমণের দিন স্থির হয়। ইতিমধ্যে সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির ১৫ জন সত্যাগ্রহীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আটক রাখা হয়েছিল। ১১ জুলাই কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (স), ইউ এম এফ (সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা) জনতা পার্টি, এস ইউ সি আই মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি আই, ভারতীয় জনতা পার্টি ও সি পি আই (এম-এল) দলের করিমগঞ্জ জেলা নেতৃত্ব আটক বন্দীদের মুক্তি না দিলে মুখ্যমন্ত্রীর সফর বয়কট করবেন বলে স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়ে দেন। কিন্তু সরকার পক্ষ নির্বিকার থাকেন।

বরাক উপত্যকা সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির ডাকে এবং উপরোক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থনে একুশে জুলাই কন্ধের ডাক দেওয়া হয়। ওই দিন সকালে মিছিলের উপর বিনাপ্ররোচনায় পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস শহীদের মৃত্যুবরণ করেন এবং আরও অনেকেই আহত হন। গুলিচালনার খবরে শহরের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আবেগ ও উত্তেজনায় ক্রোধান্ধ জনতার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ক্রুদ্ধ জনতার হাতে তিনটি সরকারি গাড়ি অগ্নিদগ্ধ হয়, সরকারি কার্যালয়ে ভাঙচুর হয় এবং তিনজন এ এস আর এফ জওয়ান প্রাণ হারায়। এরপর শুরু হয় পুলিশি সন্ত্রাস যা দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকে। ভাষা সার্কুলার আবার স্থগিত হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ) ভারতের সংসদে কাছাড়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন হয়। ১৯৯৪ সালের ২১ জানুয়ারি (১৪০০ সালের ৭ মাঘ) থেকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায়। কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, উত্তর কাছাড় ও কার্বি আংলং জেলাগুলির কলেজসমূহ নব প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাবিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষিক ও জাতিগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্তিত্ব চেতনা : বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসের বিশ্লেষণে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও মণিপুরি এবং উপজাতিরাও

ইতিহাস প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ ছাড়া চা শিল্পে উদ্যোগ ও বিকাশে যেসব হিন্দিভাষী শ্রমজীবী বরাকে এসেছিলেন, অঞ্চলের জনবিন্যাসে তাঁরাও বিশেষভাবে চিহ্নিত রয়েছেন। এ ছাড়া মান আক্রমণ বা তৎপূর্ববর্তী মোয়ামরিয়া বিদ্রোহের সময় কিছু সংখ্যক অসমিয়াভাষী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বরাক উপত্যকায় আশ্রয় নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। স্বল্প হলেও বরাকের ইতিহাস প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে তাঁরাও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় প্রয়াসী। এবম্বিধ জাতিগত ও ভাষাগত জন বৈচিত্র্যে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে অস্তিত্ব চেতনা ও পরিচয় সংরক্ষণের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মহাসভা, আসাম মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ, অল আসাম মণিপুরি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, করিমগঞ্জ জেলা ট্রাইবাল সংঘ, ঝাড়খণ্ডি চা শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন এ-জাতীয় চেতনা ও প্রবণতারই অভিব্যক্তি। অপরদিকে ১৯৯১ (১৩৯৮ বঙ্গাব্দ) খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ঐক্যমঞ্চ নামক একটি সংস্থা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় ব্রতী আছে।

স্বাধীন ভারতের নির্বাচন ও কাছাড় (বরাক উপত্যকা) : ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন (The Independence of India Act, 1947) ব্রিটিশ ভারতকে বিভাজন করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি ডোমিনিয়নের জন্ম দেয়। ডোমিনিয়ন দুটিকে তাদের স্ব স্ব সংবিধান প্রণয়নের অধিকারও সেই আইনে বিধিত হয়। এই আইন বলে ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত গণ পরিষদ সার্বভৌমত্ব লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ২৯ আগস্ট ড° বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকারকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করে সাত সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান খসড়া সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে আসামের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লাহ অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এই সমিতি প্রণীত খসড়া সংবিধান বিভিন্ন সংশোধনী সহ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকরী হয়। এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ১৯৫২ সাল থেকে স্বাধীন ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলিও সংসদের পঞ্চবার্ষিক নির্বাচন শুরু হয়।

১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী সংসদ ও বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রগুলির বিন্যাস করা হয়। তদানীন্তন কাছাড় জেলা (উত্তর কাছাড়সহ) এবং লুসাই পার্বত্য জেলা (বর্তমান মিজোরাম রাজ্য) নিয়ে দুই আসন বিশিষ্ট একটি যুক্ত সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হয়। এই দুই আসনের মধ্যে একটি আসন তফসিলি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে এই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সুরেশ চন্দ্র দেব (সাধারণ) ও নিবারণ চন্দ্র লস্কর (তফসিলি) ভারতের সংসদে নির্বাচিত হন।

কাছাড় জেলাকে ১২টি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। তার মধ্যে লক্ষ্মীপুর ও পাথারকান্দি-রাতাবাড়ি কেন্দ্র দুটির প্রত্যেকটি দুই আসন বিশিষ্ট ছিল এবং এ-দুটির প্রত্যেকটিতে একটি আসন তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ স্বাধীনত্তোর কাছাড় জেলা থেকে আসাম বিধানসভায় ১৪ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে ১২ জনই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিধায়ক ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখার্জি, খান বাহাদুর মাহমদ আলি, মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী, আব্দুল মুতলিব মজুমদার, গৌরীশঙ্কর রায়, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, মইনুল হক চৌধুরী, রাম প্রসাদ চৌবে এবং নন্দকিশোর সিংহ প্রমুখ। পশ্চিম শিলচর ও উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র দুটি থেকে যথাক্রমে অধ্যাপক মেহরাব আলি লস্কর ও রণেন্দ্র মোহন দাস (কৃষক মজদুর পার্টি) নির্বাচিত হয়েছিলেন। কৃষক মজদুর পার্টি ও সোস্যালিস্ট পার্টি একত্রিত হয়ে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি সংগঠিত হলে এই দুই বিধায়ক সেই দলের সদস্য হন।

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পূর্বেই আসামের কংগ্রেস নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৫০ সালে স্বাধীনতা-

উত্তর আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈর মৃত্যু হলে বিষ্ণুরাম মেধি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে আসাম বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় বিষ্ণুরাম মেধিই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন। কাছাড় থেকে নির্বাচিত বিধায়ক বৈদ্যনাথ মুখার্জি এবং আব্দুল মুতলিব মজুমদার বিষ্ণুরাম মেধি মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে সংসদীয় ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলি অপরিবর্তিত থাকে। সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দুজন প্রার্থীই জয়লাভ করেন। সাধারণ আসনে দ্বারিকানাথ তিওয়ারি নির্বাচিত হন এবং সংরক্ষিত আসনে নিবারণ চন্দ্র লস্কর পুনরায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে কাছাড়ের ১৪টি আসনের মধ্যে ১১টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুকূলে যায় এবং অবশিষ্ট তিনটির দুটিতে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ও একটিতে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি মনোনীত প্রার্থী জয়লাভ করেন। কংগ্রেস মনোনীত ১১ জন বিধায়কের মধ্যে মইনুল হক চৌধুরী, রামপ্রসাদ চৌবে, নন্দকিশোর সিংহ, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর ব্রায়, আব্দুল মুতলিব মজুমদার এবং মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী ছিলেন পুনর্নির্বাচিত এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, তজমুল আলি মজুমদার এবং আব্দুল হামিদ চৌধুরী প্রমুখ নতুনভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উত্তর করিমগঞ্জ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির রণেন্দ্র মোহন দাস পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাথারকান্দি ও রাতাবাড়ি যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন প্রজা স্যোস্যালিস্ট পার্টির বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এবং ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির গোপেশ নমঃশূদ্র। উল্লেখযোগ্য পরাজিতের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মুখার্জি। এবারও আসাম বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বিষ্ণুরাম মেধি মুখ্যমন্ত্রী পদ লাভ করেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে নির্বাচিত বিধায়ক আব্দুল মুতলিব মজুমদারকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরই বিষ্ণুরাম মেধি পদত্যাগ করে মাদ্রাজের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হন এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন বিমলা প্রসাদ চালিহা। বিমলা প্রসাদ চালিহা তাঁর মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে মইনুল হক চৌধুরীকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিমলা প্রসাদ চালিহা যখন মুখ্যমন্ত্রী পদ লাভ করেন, তখন তিনি বিধানসভার সদস্য ছিলেন না। এর অব্যবহিত পরই বদরপুর থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরীর নির্বাচন আদালত কর্তৃক অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। বদরপুরে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিমলা প্রসাদ চালিহা নির্বাচিত হন। অপরদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুল হামিদ চৌধুরীর নির্বাচনও আদালত কর্তৃক বাতিল হয় এবং এখান থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মনোনীত প্রার্থী খান বাহাদুর মাহমদ আলি পুনরায় নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালে নির্বাচিত বিধানসভার মেয়াদ ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেল স্টেশনে ভাষা সংগ্রামী সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে অধিকাংশ বিধায়কই পদত্যাগ করেছিলেন।

১৯৬১ সালের আদমসুমারির উপর ভিত্তি করে কাছাড় জেলার নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে। এই পুনর্বিন্যাসে কাটিগড়া বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র ছাড়া শিলচর মহকুমা ও লুসাই পার্বত্য জেলা (বর্তমান মিজোরাম) নিম্নো কাছাড় সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র গঠিত হয়। কাছাড়ের করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মহকুমা এবং শিলচর মহকুমার কাটিগড়া নিয়ে গঠিত হয় করিমগঞ্জ সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র। শেষোক্ত কেন্দ্রটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়। কাছাড় ও করিমগঞ্জ উভয় আসনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস লাভ করে এবং এ দুটি আসন থেকে নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ও নীহাররঞ্জন লস্কর। ১৯৬২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কাছাড় জেলাকে ১৪টি নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। তারমধ্যে দুটি কেন্দ্র তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই নির্বাচনে ১০টি কেন্দ্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈদ্যনাথ মুখার্জি, রামদেব মাল্লাহ, আব্দুল মুনয়ীম চৌধুরী, মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী, গৌরী শঙ্কর রায়, মইনুল হক চৌধুরী, রাম প্রসাদ চৌবে, দ্বারিকা নাথ তিওয়ারি এবং পুলকেশী সিংহ। কংগ্রেস মনোনীত পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে আব্দুল মুতলিব মজুমদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে একষট্টির ভাষা আন্দোলনের প্রভাব খুব কম ছিল না। ভাষা আন্দোলনের প্রভাবেই কাছাড়ের তিনটি শহর কেন্দ্রিক নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটেছিল। উত্তর করিমগঞ্জ নির্বাচন। কেন্দ্র থেকে দুবার বিজয়ী প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির রণেন্দ্র মোহন দাস এ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে দাঁড়িয়ে ভাষা সংগ্রামের অন্যতম নেতা রথীন্দ্র নাথ সেনের কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন। শিলচর শহর কেন্দ্রিক নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন নির্দল প্রার্থী এবং ভাষা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন্দকুমার সিংহ। এর আগের দুটি নির্বাচনেই তিনি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। কাটিগড়া থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন ভাষা সংগ্রামের আরেক নেতা তারাপদ ভট্টাচার্য। হাইলাকান্দি নির্বাচন কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল মুতলিব মজুমদারকে পরাজিত করেছিলেন রামপীরিত রুদ্রপাল। ভাষা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী যেসব নেতা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা শিলচর রেলস্টেশনে পুলিশের গুলির বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশের দাবিতে বিধানসভায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। বাষট্টির নির্বাচনেও আসাম বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বিমলা প্রসাদ চালিহা মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হন। চলিহার এই মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে নির্বাচিত মইনুল হক চৌধুরী একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেন।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কাছাড়ের দুটি সংসদীয় আসনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ও নীহাররঞ্জন লস্কর জয়লাভ করেছিলেন। কাছাড়ের ১৪টি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ১০টিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। এঁরা হলেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, প্রফুল্ল চৌধুরী, মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী, আব্দুল মুতলিব মজুমদার, সতীন্দ্র মোহন দেব, আব্দুল কুদ্দুস নুরুল হক, আলতাফ হোসেন মজুমদার, মেরাচৌবা সিং, জগন্নাথ সিংহ এবং মইনুল হক চৌধুরী। এবারে উল্লেখযোগ্য পরাজিত প্রার্থী ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখার্জি। তিনি পাথারকান্দি নির্বাচন কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী মতিলাল কানুর কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন। এবারের নির্বাচনে কাছাড় থেকে নির্বাচিত অন্যান্য নির্দল সদস্য ছিলেন উত্তর করিমগঞ্জ থেকে রথীন্দ্র নাথ সেন, কাটলিছড়া থেকে তজমুল আলি লস্কর এবং ধোলাই থেকে যতীন্দ্র মোহন বড়ভূঞা। এবারেও কংগ্রেস নেতা বিমলাপ্রসাদ চালিহা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে সতীন্দ্র মোহন দেব ও আব্দুল মুতলিব মজুমদার পূর্ণমন্ত্রীরূপে এবং আলতাফ হোসেন মজুমদার প্রতিমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। আব্দুল মুতলিব মজুমদারকে অবশ্য কিছুদিন পরে পদত্যাগ করতে হয়। বিমলা প্রসাদ চালিহা ১৯৭১ সালে পদত্যাগ করলে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী হন। পূর্বতন মন্ত্রিসভার বিশেষ কোনও রদবদল হয় না।

১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালের এই পঞ্চবার্ষিক পর্যায়ক্রমটি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাল। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার রাজন্য ভাতা লোপ এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তঃকলহ দেখা দেয়। দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার বিরোধ প্রকাশ্যে আসে ১৯৬৯ সালে ড' জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী নীলম সঞ্জীব রেড্ডির বিরোধিতা করে বিবেক ভোটদানের জন্য দলীয় সদস্যদের কামে আবেদন করেন। ফলে কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থীর পরাজয় ঘটে এবং নির্দল প্রার্থী বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি জয়লাভ করেন। কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-র নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অংশটি সংগঠন কংগ্রেস নামে পরিচিতি লাভ করে। ইন্দিরা গান্ধী পরিচালনাধীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অপরাংশের সভাপতি নির্বাচিত হন বাবু জগজীবন রাম। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয় মধ্যবর্তীকালীন সংসদীয় নির্বাচন। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের পূর্বতন সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে বিপুল সমর্থন নিয়ে সংসদে নির্বাচিত হন। কাছাড়ের দুটি নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এবং নীহাররঞ্জন লস্কর সংসদে নির্বাচিত হন। নীহাররঞ্জন লস্কর ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর আসন লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দর মৃত্যু হলে কাছাড়ে

উপ-নির্বাচন হয় এবং ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) মনোনীত প্রার্থী নুরুল হুদা জয়লাভ করেন। কংগ্রেস প্রার্থী মহীতোষ পুরকায়স্থের পরাজয় ঘটে।

১৯৭১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে মইনুল হক চৌধুরী ধুবড়ি থেকে জয়লাভ করে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রীরূপে যোগদান করেছিলেন। রাজ্য-রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেও বাহাত্তরের বিধানসভা নির্বাচনে কাড়ের কংগ্রেস রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা তিনিই পালন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কাছাড়ের চৌদ্দটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন। কংগ্রেসের এই বিপুল সাফল্যে যাঁরা বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন সুরঞ্জন নন্দী, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, সুদর্শন দাস, আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী, আব্দুর রহমান চৌধুরী, সন্তোষ কুমার রায়, আব্দুল হামিদ মজুমদার, ড° লুৎফুর রহমান, মহীতোষ পুরকায়স্থ, জগন্নাথ সিংহ, শুভঙ্কর সিংহ, নুরুল হক চৌধুরী এবং দিগেন্দ্র নাথ পুরকায়স্থ। আসাম বিধানসভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় শরৎ চন্দ্র সিংহ মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে নির্বাচিত ড° লুৎফুর রহমান, জগন্নাথ সিংহ এবং মহীতোষ পুরকায়স্থ যোগদান করেন। মন্ত্রিসভা গঠনের অব্যবহিত পরই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা মাধ্যম একমাত্র অসমিয়া বলে ঘোষণার বিরোধিতায় কাছাড়ে আন্দোলন শুরু হয়। কাছাড়ে একটি বাংলা মাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বিধায়সভায় গৃহীত হয়। কিন্তু কোনও আইন প্রণয়ন করা হয়নি। কাছাড়ের আপামর জনসাধারণ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কাছাড় জেলার কংগ্রেস সমন্বয় কমিটি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য বিধানসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বিধায়কদের মধ্যে মন্ত্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ, মৌলানা আব্দুনা জলীল চৌধুরী, সুদর্শন দাস এবং সন্তোষ কুমার রায় ব্যতীত কেউই এই সিদ্ধান্ত মানেননি। মহীতোষ পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করে তাঁকে শুধু মন্ত্রিসভা থেকেই বাদ দিয়ে ক্ষান্ত হননি মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়সভায় তাঁকে ভর্ৎসনাও করা হয়।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। ভারতের মানুষ লাভ করেন এক অনাস্বাদিত পূর্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা। জাতীয় স্তরের বিরোধী নেতা থেকে শুরু করে মহকুমা বা তফসিল স্তরের নেতাদেরও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। এই পটভূমিতে ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় নির্বাচন। ইতিমধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলে শিলচর মহকুমার ভৌগোলিক অঞ্চল নিয়ে কাছাড় এবং করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মহকুমা নিয়ে করিমগঞ্জ (সংরক্ষিত) সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র পুনর্বিন্যস্ত হয়। ১৯৭৭ সালের সংসদীয় নির্বাচনে সারা ভারতে ইন্দিরা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস বিপর্যস্ত হলেও কাছাড়ের দুটি আসন কংগ্রেসই লাভ করে। কাছাড়ে রশিদা হক চৌধুরী এবং করিমগঞ্জে নীহাররঞ্জন লস্কর জয়লাভ করেন। সংগঠন কংগ্রেস, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি প্রধান বিরোধী দলগুলির সম্মেলনে নব গঠিত জনতা পার্টি কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করে। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু দু বছর পূর্ণ হতে না হতে জরুরী অবস্থার বিরোধিতায় সংগঠিত জনতা পার্টির বিভিন্ন মতাদর্শ বিশিষ্ট উপদলগুলির মধ্যে বিরোধ প্রকট হতে লাগল। ১৯৭৯ সালে মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করেন এবং লোক দল গঠন করে চৌধুরী চরণ সিংহ প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সমর্থনে। এদিকে ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আবার বিভক্ত হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস (ইন্দিরা) নামক নতুন দল সংগঠিত হয়। রশিদা হক চৌধুরী মূল কংগ্রেসেই থেকে যান। এবং চরণ সিংহের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীপদ লাভ করেন। মূল কংগ্রেস পরে কংগ্রেস (স) বা কংগ্রেস (সমাজতান্ত্রিক) দল নামে পরিচিত হয়।

এদিকে ১৯৭৮ সালে আসাম বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় জেলাকে তখন ১৫টি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়েছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কাছাড়ে উভয় কংগ্রেসেরই বিপর্যয় ঘটে। অবশ্য অনেক কংগ্রেস নেতাই নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে রাতারাতি জনতা পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। তবে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাছাড়ের লোকেরা সংঘবদ্ধ হননি। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ৪, জনতা পার্টির ৪, কংগ্রেস (স)-র ৩, কংগ্রেস (ই)-র ২ এবং নির্দল ২ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করেছিলেন কাছাড়ের নির্বাচক মণ্ডলী। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির চার বিধায়ক ছিলেন নিশীথ

রঞ্জন দাস, রামেন্দ্র দে, দীপক ভট্টাচার্য এবং নুরুল হুদা। জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন লীলাময় দাস, আবুল ফজল গোলাম ওসমানি, আলতাফ হোসেন মজুমদার এবং জগন্নাথ সিংহ। কংগ্রেস(স)-এর বিধায়করা ছিলেন আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, গৌরী শঙ্কর রায় এবং আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। কংগ্রেস (ই)-র মনোনীত প্রার্থীরূপে জয়লাভ করেছিলেন নেপাল চন্দ্র দাস এবং শিশির কুমার দাস। আর নির্দল প্রার্থীরূপে জয়লাভ করে অধ্যাপক ফখরুল ইসলাম ও কাজি কুতুব আহমদ জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। এই হল ১৯৭৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনোত্তর কাছাড়ের রাজনৈতিক চালচিত্র।

১৯৭৮ সালের আসামে জনতা পার্টির গোলাপ বরবরা মুখ্যমন্ত্রী হন। তাঁর মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে আবুল ফজল গোলাম ওসমানি ও জগন্নাথ সিংহ পূর্ণ মন্ত্রীরূপে এবং লীলাময় দাস প্রতিমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। কিছুদিন পরই অবশ্য লীলাময় দাস পূর্ণমন্ত্রী হন। কিন্তু গোলাপ বরবরার মন্ত্রিসভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (AASU) নেতৃত্বে আসাম থেকে তথাকথিত বিদেশী বিতাড়নের নামে এক অসমিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। আসুর দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সরকারি উদ্যোগে পুলিশের সহায়তায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হয়। এ-জাতীয় সংশোধনে আসামের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেবার প্রয়াস প্রকটভাবে প্রদর্শিত হতে থাকে। অবশ্য নির্বাচন আয়োগের হস্তক্ষেপের ফলে এ জাতীয় তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। গোলাপ বরবরা মন্ত্রিসভার দুই সদস্য আবুল ফজল গোলাম ওসমানি ও জহিরুল ইসলাম এ-জাতীয় সংশোধন তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় গোলাপ বরবরা এই দুই সদস্যকে বাদ দিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন। তখন লীলাময় দাস পূর্ণমন্ত্রীপদে উন্নীত হন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আসে এবং গোলাপ বরবরা সরকারের পতন হয়। এরপরই আসামের রাজনীতিতে শুরু হয় সীমাহীন অস্থিরতা। অসম জনতা নাম দিয়ে জনতা পার্টির একদল বিধায়ক নতুন দল গঠন করেন। গোলাম ওসমানি এবং তাঁর সমর্থক বিধায়করা গঠন করেন লোকদল। অসম জনতা দলের যোগেন্দ্র নাথ হাজরিকার নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের উভয় দল, লোকদল, সি পি আই, সি পি এম প্রভৃতির সমর্থনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে নির্বাচিত বিধায়ক আলতাফ হোসেন মজুমদার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন লাভ করেন। ভোটার তালিকা থেকে বিদেশীদের নাম বাদ দেওয়ার নামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে গোলাম ওসমানি তৎপর হন। নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতি গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে কাছাড় থেকে ওসমানির সঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ ও মন্ত্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ এবং প্রাক্তন সাংসদ নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীও যুক্ত হন।

হাজরিকা মন্ত্রিসভা একমাসও স্থায়ী হয়নি। আলতাফ হোসেন মজুমদার সহ মন্ত্রিসভার এগারোজন সদস্য একসঙ্গে পদত্যাগ করায় এবং সমর্থনকারী দলগুলি সমর্থন প্রত্যাহার করায় যোগেন্দ্র নাথ হাজরিকা পদত্যাগ করেন। আসামে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়। বিধানসভার কর্মক্ষমতা নিলম্বিত হয়ে থাকে। আসুর নেতৃত্বে তথাকথিত বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। হত্যা, লুঠতরাজ, নাশকতামূলক কাজ, প্রভৃতি আসামের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এদিকে ভারতের লোকসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় নির্বাচন। আসুর আন্দোলনের প্রভাব এত বেশি ছিল যে কাছাড়ের দুটি সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র ছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ১২টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কাছাড় থেকে এবারের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন কংগ্রেস (ই) মনোনীত প্রার্থী সন্তোষ মোহন দেব এবং নীহাররঞ্জন লস্কর। নীহাররঞ্জন লস্কর ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর আসন লাভ করেন।

এদিকে আসামের রাজনীতিতে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস (স)-র অনেক বিধায়ক কংগ্রেস (ই)-তে যোগদান করেন। ফলে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে দুবার কংগ্রেস (ই) দলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এভাবে আনোয়ারা তাইমুর ও কেশব চন্দ্র গগৈ পরপর মুখ্যমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রিসভাগুলিতে কাছাড়ের যে-সব বিধায়ক স্থান পেয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আবুল ফজল গোলাম ওসমানি, লীলাময় দাস, আলতাফ হোসেন মজুমদার, আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, ফকরুল ইসলাম, নেপাল চন্দ্র দাস প্রমুখ। আনোয়ারা তাইমুরের মন্ত্রিসভায় যোগদানের ফলে গোলাম ওসমানির সংগ্রামী চরিত্র কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছিল।

এরূপ রাজনৈতিক পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন। কাছাড়ের ১৫টি আসনের ১৩টিতেই কংগ্রেস (ই) মনোনীত প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। মাত্র দুটিতে নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেন। কংগ্রেস (ই) মনোনীত বিজয়ী তেরোজন বিধায়ক হলেন কেতকী প্রসাদ দত্ত, আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, গোলাম সুবহানী চৌধুরী, সুবল চন্দ্র দাস, মৌলানা আব্দুল জলীল চৌধুরী, আব্দুল মুহিব মজুমদার, নেপাল চন্দ্র দাস, আলতাফ হোসেইন মজুমদার, জগন্নাথ সিংহ, জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী, দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা, নুরুল হক চৌধুরী এবং দিগেন্দ্র পুরকায়স্থ। পাথারকান্দি ও কাটলিছড়া থেকে নির্দল প্রার্থী রূপে জয়লাভ করেন যথাক্রমে- মইন উদ্দিন আহমদ ও তজমুল আলি লস্কর। কংগ্রেস (ই) দলের হিতেশ্বর শইকীয়া মুখ্যমন্ত্রী পদে বৃত হন। তাঁর মন্ত্রিসভায় কাছাড় থেকে আব্দুল মুহিব মজুমদার, জগদীশ চন্দ্র চৌধুরী এবং জগন্নাথ সিংহ পূর্ণমন্ত্রী এবং আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী প্রতিমন্ত্রীর আসন লাভ করেন। নির্বাচন হলেও আসামে আসুর নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। আন্দোলনকারীরা ভোট বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কেন্দ্রগুলিতে অভিলেখ সংখ্যক কম ভোট পড়েছিল। নির্বাচনের পরও আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলতে থাকে। আন্দোলনের অনুষঙ্গ হিসেবে গণহত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। এ-সব ঘটনার মধ্যে নেলির গণহত্যায় সবচেয়ে বেশি লোক নিহত হয়েছিল।

১৯৮৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হন। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন গরই আবার লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আসামে নির্বাচন হল না। রাজীব গান্ধী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসামে আন্দোলনকারী সংস্থা আসুর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৮৫ সালের আগস্টে নিখিল আসাম ছাত্র সংস্থার (AASU) সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটা আসাম চুক্তি নামে জনসাধারণ্যে পরিচিত হলেও বোঝাপড়ার স্মারকলিপি (Memorandum of Agreement)ই এর আইনানুগ অবস্থান। এই চুক্তির অলিখিত ধারামতে আসামের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে আসামে বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ততদিনে কাছাড় জেলা করিমগঞ্জ ও কাছাড় নামক দুই জেলায় বিভক্ত হয়ে গেছে এবং এই দুই জেলা বরাক উপত্যকা নামক সাধারণ অভিধায় পরিচিত হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে বরাক উপত্যকার দুটি লোকসভা আসনে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী সন্তোষ মোহন দেব ও কংগ্রেস (স) প্রার্থী সুদর্শন দাস জয়লাভ করেন। কেন্দ্রে রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভা ছিল। সন্তোষ মোহন দেব রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রীর আসন লাভ করেন।

নির্বাচনের পূর্বে নিখিল আসাম ছাত্র সংস্থা অসম গণ পরিষদ নামক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। অপরদিকে আসাম চুক্তির বিরোধিতায় আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংস্থার আহ্বানে হোজাইয়ে এক গণ অভিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিবর্তনে গোলাম ওসমানির নেতৃত্বে সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। গোলাম ওসমানি মোর্চার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলে- 'সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা কোনও গতানুগতিক রাজনৈতিক দল নয়। এটা এক আন্দোলন। আসামের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার দৃঢ়ভিত্তির প্রতিষ্ঠা কল্পে এই সংস্থা নির্বাচন সহ সকলরকম আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।' এই পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হল ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে আসামের বিধানসভা নির্বাচন। বরাক উপত্যকার ১৫টি নির্বাচন কেন্দ্রের প্রায় সবটিতেই সংযুক্ত সংখ্যালঘু মোর্চা ও অসম গণ পরিষদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু উভয় দলের কেউই একটি আসনও লাভ করতে পারেননি। ১৫টি আসনের মধ্যে ১০টিতেই কংগ্রেস (ই) প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। এই দশজন বিধায়ক হলেন মণিলাল গোয়ালা, কুমারী রবিদাস, আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, আব্দুল মুহিব মজুমদার, গৌতম রায়, কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, আলতাফ হোসেন মজুমদার, আব্দুর রব লস্কর, দিগেন্দ্র পুরকায়স্থ এবং দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা। কংগ্রেস(স)-র প্রার্থী আব্দুল হামিদ মজুমদার এবং সি পি আই(এম) প্রার্থী রামেন্দ্র দে যথাক্রমে কাটিগড়া ও বদরপুর থেকে জয়লাভ করেন। বিধানসভায় অসম গণ পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে

এবং ছাত্রনেতা প্রফুল্ল কুমার মহন্ত বিধায়িনী দলের নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী হন। এদিকে বরাক উপত্যকা থেকে নির্বাচিত নির্ণল প্রার্থী শহীদুল আলম চৌধুরী, সিরাজুল হক চৌধুরী এবং জয়প্রকাশ তেওয়ারি অসম গণ পরিষদে যোগদান করেন এবং শহীদুল আলম চৌধুরী মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

অসম গণ পরিষদের শাসনকালে বরাক উপত্যকার সাময়িক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে অসমিয়া বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসেবে চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বরাকের সকল রাজনৈতিক দল এবং সমাজসেবামূলক সংস্থা সোচ্চার হন। ২১ জুলাই করিমগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ২ জন।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বরাক উপত্যকায় শেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় খ্রিস্টিনা ১৯৯১ সালে। ১৯৮৯ সালে ভারতে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আসামে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সমর্থনে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থিত উগ্র সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দাঙ্গা ভারত ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সংযোজন ঘটায়। বরাক উপত্যকায় তার কিছু অনুরণন লক্ষিত হলেও উপত্যকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বৃঢ় হস্তক্ষেপের ফলে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এই পটভূমিতে অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন। লোকসভা দুটি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ এবং দ্বারকানাথ দাস (সংরক্ষিত) জয় লাভ করেন। বিধানসভার পনেরোটি আসনের মধ্যে নয়টিতে ভারতীয় জনতা পার্টির রামপ্যারে রবিদাস, মধুসুদন তেওয়ারি, প্রণব নাথ, মিশন রঞ্জন দাস, কালিরঞ্জন দেব, সমরেন্দ্র নাথ সেন, পরিমল শুক্লবৈদ্য, বদ্রীনারায়ণ সিংহ এবং চিত্তেন্দ্র নাথ মজুমদার বিজয়ী হন। কংগ্রেস(ই) মনোনীত প্রার্থী আবু সালেহ নজমুদ্দিন, গৌতম রায়, জগন্নাথ সিংহ ও দীনেশ প্রসাদ গোয়ালা পূর্ণমন্ত্রী এবং অপর দুজন প্রতিমন্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন। অপর দুটি আসনে জনতা দল ও অসম গণ পরিষদের যথাক্রমে ড° আব্দুল মতিন মজুমদার ও শহীদুল আলম চৌধুরী জয়লাভ করেন।

ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভায় কাছাড় তথা বরাক উপত্যকা থেকে স্বাধীনোত্তর কালে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে চারজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁদের সকলেই কংগ্রেস মনোনীত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে সুরেশ চ৬। দেব, ১৯৬৬ সালে মহীতোষ পুরকায়স্থ, ১৯৭২ সালে নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী এবং ১৯৮৪ সালে কমলেন্দু ভট্টাচার্য বরাক উপত্যকা থেকে নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নগরায়ন ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া : দেশ যখন স্বাধীন হয়ে কাছাড় জেলা পুনর্বিন্যস্ত হয় তখন এ-জেলায় চারটি শহর ছিল। এই চারটির মধ্যে শিলচর ছিল জেলা সদর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও হাফলং শহরগুলি ছিল মহকুমা সদর। শিলচর ও করিমগঞ্জ শহর দুটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র রূপে গুরুত্বপূর্ণ থাকলেও চারাটি শহরেরই শুরুর ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে। শিলচর শহরে উপায়ুক্ত ও আরক্ষী অধীক্ষকের কার্যালয় এবং জেলা ও দায়রা জজের আদালতই প্রধান প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কার্যালয়। অপর তিনটি শহরে মহকুমা অধিকারিক ও আরক্ষী উপ-অধীক্ষকের কার্যালয় এবং ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতই ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। এ-ছাড়া বদরপুর রেলওয়ে শহরটিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রশাসন কেন্দ্র না থাকলেও শহরটিতে রেলযোগাযোগের ত্রিমুখী সঙ্গমস্থল ও রেলওয়ে প্রশাসন দপ্তর থাকায় নাগরিক জীবনের আবহ বর্তমান ছিল। ১৯৫২ সালে উত্তর কাছাড় পৃথক হয়ে যাওয়ায় কাছাড়ে বদরপুর ছাড়া তিনটি পহর বিদ্যমান থাকে। এই শহরগুলির মধ্যে শিলচর ও করিমগঞ্জ শহরে পৌরসভা ছিল এবং হাইলাকান্দিতে ছিল শহর সমিতি। শিলচর ও করিমগঞ্জ শহর দুটির সঙ্গে রেল, সড়ক ও নদী পথের যোগাযোগ

ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকায় কাছাড়ের চা রপ্তানির বিশেষ কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত ছিল। এছাড়া বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যেরও বিপণন কেন্দ্র হিসেবে শহর দুটির খ্যাতি ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে করিমগঞ্জের গুরুত্ব কিছুটা কমে যায় এবং শিলচরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষভাবে লুসাই পার্বত্য জেলার (পরবর্তীকালে মিজোরাম রাজ্য) সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ সহজ হওয়ায় শিলচরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ-ছাড়া শিলচরে পলিটেকনিক, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শহরটির আয়তন ও লোকসংখ্যাও তরতর করে বাড়তে থাকে। বেতার ও দূরদর্শন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ফলে শহরটির মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। পূর্ত, কন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসিঞ্চন প্রভৃতি বিভাগের অধীক্ষক অভিযন্তার কার্যালয় এবং আরক্ষী বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয় শহরটিকে জেলা ভিত্তিক স্তরে রাখেনি, অনেকটা রাজ্যে স্তরের শহরের মর্যাদা দান করেছে। ফলে এখানকার নাগরিক জীবনে আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের উন্মেষ ঘটে গেছে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই।

করিমগঞ্জের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্যিক গুরুত্ব কমে গিয়েছিল দেশভাগের ফলে। ১৯৮৩ সালে শহরটি জেলা শহরে উন্নীত হওয়ায় প্রশাসনিক কার্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র। সামগ্রিকভাবে নগর জীবনের তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। হাইলাকান্দিতে নগর সমিতি ছিল। ১৯৬৩ সালে তা উন্নীত হয়েছে পৌরসভায়। ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দি পৃথক জেলায় পরিণত হওয়ায় এখানেও প্রশাসনিক কার্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র নাগরিক জীবনের তেমন কোনও উন্নতি ঘটেনি।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে শিলচর-চট্টগ্রাম রেলপথ এবং গৌহাটি-তিনসুকিয়া রেলপথের সঙ্গে সংযোগকারী পাহাড় লাইনের সঙ্গমস্থল রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বদরপুরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আসামের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে আবাসিক এলাকা ছিল বদরপুর। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের শিলচর-চট্টগ্রাম লাইনের অধিকাংশ অর্থাৎ করিমগঞ্জের পর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লাইন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বদরপুরের গুরুত্ব কমে যায়। স্বাধীনতার পর বদরপুরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং রেলওয়ে আবাসিক এলাকার বাইরেও নাগরিক জীবনের উন্মেষ ঘটতে থাকে। ফলে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩৭১ বঙ্গাব্দে) বদরপুর শহর সমিতি গঠিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পৌরজীবনের পত্তন ঘটে।

এছাড়া লালা উপশহরটিকে শহর সমিতি গঠিত করে শহরে উন্নীত করা হয়। লক্ষ্মীপুর উপ-শহরটি শহরে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে তা মহকুমা শহরে উন্নীত হয়েছে।

কাছাড় তথা বরাক উপত্যকায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল চা শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্বাধীনতা লাভের পর চা শিল্পের আর তেমন উন্নতি হয়নি। কাছাড়ে সরকারি উদ্যোগে প্রথম শিল্পায়নের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ১৯৭৩ সালে (১৩৮০ বঙ্গাব্দে) করিমগঞ্জের আনিপুরে কাছাড় সুগার মিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯৭৬-৭৭ সালে এই সুগার মিল উৎপাদন শুরু করে। কিন্তু ১৯৮৫ সালে কোনও অজ্ঞাত কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সেটি ব্যক্তিগত মালিকানায় সমঝে দেবার সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

আরেকটি সরকারি উদ্যোগে শিল্পায়নের চিহ্ন হচ্ছে পাঁচগ্রামে প্রতিষ্ঠিত কাছাড় পেপার মিল। হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন নামক ভারত সরকারের একটি সংস্থা দ্বারা ১৯৮৬ সালে (১৩৯৩ বঙ্গাব্দে) তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ১৯৮৮ সাল থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই মিলকে কেন্দ্র করে পাঁচগ্রামে একটি শহরও গড়ে উঠছে।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের একশো বছরে সুরমা উপত্যকার বিভাজন, কাছাড় জেলার পুনর্গঠন এবং কাছাড় জেলাকে তিনটি জেলায় পুনর্বিন্যাস ও বরাক উপত্যকার অভিধার আবির্ভাব প্রভৃতি হচ্ছে প্রশাসনিক রূপান্তর। জনজীবনে কৃষিজীবী সমাজের স্বপ্নচারিতার সঙ্গে নাগরিক জীবনের মিশ্রণের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। ইতিহাসের এই মোড় ফেরার মধ্যে অবশ্যই এক উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অভিঘাত ক্রিয়াশীল।

……

১। এই নিবন্ধে উল্লেগির রাজনৈতিক ঘটনাবলির কতকগুলো তথ্য প্রাক্তন সাংসদ নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী মহাশয় সরবরাহ করে লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

২। এই নিবন্ধের কিছু অংশ করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *দিগ্বলয়* পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কামালুদ্দীন আহমদ।

প্রসঙ্গ : বরাক উপত্যকায় শিক্ষাবিস্তার

অনুরূপা বিশ্বাস

প্রাক্‌কথন

বঙ্গীয় শতক ১৩০১-১৪০০ এই সময়সীমায় আবর্তিত এই অঞ্চলের শিক্ষাগত দিক আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই ভূমিকা হিসাবে কিছু কথা বলতে হয়। অধুনা বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত অঞ্চল-ভূভাগের এক শতাব্দীর ঘটনাবলির বিবরণ দিতে গেলে অবশ্যই পার্শ্ববর্তী সিলেট জেলার কথা এসে পড়বে। জনবিন্যাস, ভাষা-সংস্কৃতির বিচারে জাতিত্ব নিয়ামক সূত্রে এই উভয় অঞ্চল একত্রে বিচারযোগ্যও বটে।

সমতল কাছাড় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ অধিকারে যাবার আগে দেড়শো বছরকাল ছিল স্বাধীন হৈড়ম্ব রাজ্যের অংশ। সংলগ্ন শ্রীহট্ট চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ছিল বাংলার সুলতানী শাসনাধীন। এই কারণে ঐতিহাসিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় কিছু তারতম্য অতীত আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে।

সুলতানী আমলেও শ্রীহট্ট ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পূর্ববর্তী প্রসার ধারায় সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। পাশাপাশি ফারসি ও উর্দু ভাষা শিক্ষা ও চর্চার ব্যবস্থাও চালু ছিল। এই সময়ে কাছাড় রাজ্যে ডিমাচা রাজারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে রাজ আনুকূল্যে এই অঞ্চলেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, কাছাড়ে এই সময়ে যে সব রাজপণ্ডিত বা অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন তারা বেশির ভাগ ছিলেন শ্রীহট্ট আগত। এদের মধ্যে পঞ্চখণ্ড থেকে আগত পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল সমধিক। দক্ষিণবঙ্গের বিক্রমপুর থেকেও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন। প্রধানত এঁদের দ্বারাই সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা ও কালক্রমে এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কাছাড়ে রাজ-ভাষা ছিল বাংলা এবং এই রাজারা অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষাচর্চায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখানে কাছাড়ের আদি কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও গোবিন্দ নারায়ণ, কবি অনন্তরাম ও চন্দ্রমোহন বর্মনের নামোল্লেখ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

রাজনৈতিক পটভূমিকা ও শিক্ষা প্রসার

আগেই বলা হয়েছে যে ইংরেজ অধিকারে যাবার আগে প্রায় চারশো বছর শ্রীহট্টে ছিল সুলতানী শাসন। বঙ্গেশ্বরের ফৌজদার বা আমিল এই অঞ্চল শাসন করতেন- একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা তার ছিল না, পরিচিতি ছিল সুবে বাংলার একটি সরকার হিসেবে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাংলার দেওয়ানি লাভ করলে শ্রীহট্টেও তাদের শাসনাধিকার বিস্তৃত হয়। ইংরেজ আমলে শাসন করতেন একজন রেসিডেন্ট। তাদের কাজ প্রথমে ছিল রাজস্ব আদায়। ক্রমে শাসনকার্য ভারও রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত হয়। পূর্ববর্তী নবাবি আমলের বিধি ব্যবস্থা থেকে ইংরেজ প্রবর্তিত বিধিব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়াটি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ১৮শ শতাব্দীর শেষ দশকে এসে অনেকটা সুস্থিতির পরিবেশ আনতে সমর্থ হয়েছিল।

কাছাড় তখনও স্বাধীন হৈড়ম্ব রাজ্য। ১৮শ শতাব্দীর শেষ দশকে অন্তিম দশায় উপনীত। এই সময়কার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শেষ পর্যায়ে উপর্যুপরি মণিপুরী বার্মিজ ও কুকি আক্রমণে এমন বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন যে বাধ্য হয়ে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র নারায়ণকে ইংরেজ সাহায্য চাইতে হল। ইংরেজ শাসকরা তো এই সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল। সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে এক সূত্রে গেঁথে শাসন ও শোষণের এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার খসড়াকে কার্যকরী করতে একে একে ঘুঁটি চালাচ্ছিল। ১৮২৯-এর ২৮শে জুলাই কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজের সন্ধি হয় এবং ১৮৩২-এ কাছাড়ের রাজ্যশাসন ভার ইংরেজের হাতে চলে যায়। এই সময়ে কাছাড়ের অন্তর্বর্তী ভূভাগ ছিল - যমুনামুখ, ধরমপুর হয়ে হোজাই, ডবকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৮৩২-এর নভেম্বর মাসে এই অঞ্চলকে কাছাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের

সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।[*১] ১৮৩৫-এ জয়ন্তিয়া রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা পর্বে বৃহত্তর কাছাড়ের ভৌগোলিক সীমাকে বারবার সংকুচিত করা হয়েছে। জয়ন্তিয়া রাজ্য সংলগ্ন ভূমি, মণিপুর রাজ্য সংলগ্ন জিরি অঞ্চল, বড়াইল পাহাড়ের উত্তরাংশের বৃহৎ এলাকা কেটে বাদ দেওয়া হয়।[*২] অবশ্যই এই বিভাজনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৮২৯-এ যখন কমিশনার ডেভিড স্কট কাছাড়ের রাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে তুলারাম সেনাপতিকে উত্তর কাছাড়ের শাসক রূপে মেনে নিতে বাধ্য করেন। এই ঘটনাটি কাছাড়কে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে ভাগ করে দেবার পথ প্রশস্ত করে দিল।[*৩] দেখা যায় যে, ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের আগেও ব্রিটিশ শাসকরা বারবার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে বহুবার দেশ ভাগ করেছে। পার্থক্য কেবল আয়তনিক। দেশ ছেড়ে যাবার আগে ব্রিটিশ শাসক গোটা দেশকে ব্যবচ্ছেদ করে দিয়ে গেল আর পূর্বাঞ্চলে শাসনের সূচনা কালেই ইচ্ছামতো ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে বারবার কেটেছেঁটে বিড়ম্বিত করে দুর্বল করে রেখেছিল। এইভাবে একে একে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অধিগত করার পরে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে আসাম প্রদেশের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হল। ১৮৭৪-এর ৬ই ফেব্রুয়ারি আসাম প্রদেশের জন্ম হল কাছাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দরং, নগাঁও, শিবসাগর, লক্ষীমপুর, গারো পাহাড়, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও নাগা পাহাড় জেলাকে নিয়ে। ওই বছরই ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীহট্ট জেলা আসাম প্রদেশের অঙ্গীভূত হয়। ১৮৯৮-তে যুক্ত হয় লুসাই পাহাড় জেলাটি।[*৪] উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি সংসাধিত হয়েছিল বঙ্গীয় শতকারম্ভের নিকটবর্তী সময়ে মোটামুটি অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে। প্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণার আগে আলোচ্য অঞ্চল ভূমির আর্থ-রাজনৈতিক রূপান্তর এবং এই সব পরিবর্তনের কালসীমাটিকে অবশ্যই আমাদের বুঝে নিতে হবে।

ব্রিটিশ শাসনকালে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের আসাম অন্তর্ভুক্তি সুরমা উপত্যকা হিসেবে এই অঞ্চল ভূ-ভাগের আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্ত্বাকে একত্রে এক নব পরিচিতি দান করেছিল, এটা যথার্থ এক বাস্তবসম্মত ব্যাপার। বৃহত্তর বঙ্গভূমির স্বাভাবিক সন্নিহিত অঞ্চল বঙ্গভাষা-ভাষী বহু মানুষের বাসভূমি হিসাবে এই অঞ্চল বঙ্গদেশের অংশ হয়ে থাকাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। সুরমা উপত্যকাকে এবং রংপুর জেলার অন্তর্বর্তী গোয়ালপাড়াকে আসাম চিফ কমিশনারের শাসনাধীনে নিয়ে আসাটাকে আমরা প্রথম বঙ্গবিভাগ বলে ধরে নিতে পারি। সত্যি এলতে, উপরে উল্লিখিত এই সব অংশকে একত্র করে আসাম প্রদেশ গঠনের পেছনে ছিল ব্রিটিশ রাজের শাসন পদ্ধতিগত কৌশল, কিন্তু শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে অঙ্গীভূত করার পেছনে ছিল অর্থনৈতিক কারণ।[*৫] ১৮৭৩ সালেই শ্রীহট্টকে নবগঠিত আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনমতের তীব্র বিস্ফোরণে বড়লাট নর্থ ব্রুককে শ্রীহট্ট আসতে হয়েছিল। জনসাধারণের ব্যাপক প্রতিবাদ সত্ত্বেও শ্রীহট্ট জেলাকে আসামে জুড়ে দেওয়া হল। বঙ্গদেশের অংশ হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই জেলা সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার কারণে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রসার সর্বপ্রথম এখানেই আরম্ভ হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৮শ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এখানে শাসনকার্যে ফারসি ভাষার চল ছিল। উনিশ শতকেও দীর্ঘদিন বিশেষভাবে আদালতের কাজে তা অক্ষুণ্ণ থাকে।[*৬]

জীবন-জীবিকার তাগিদে, উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার প্রেরণায় ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ এবং দাবি সমাজের মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। ক্রমে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা প্রণালীও ধসে পড়ছিল। গ্রামীণ জনজীবনেও তখন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। আধুনিককালের উন্মেষে যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়ছে, এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে জেলার নানা স্থানে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা একের পর এক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ এই রকম সময়েই হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

মিশনারি মিঃ এডামের রিপোর্ট অনুসারে বাংলার প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সিলেট বাংলার অন্তর্ভুক্ত থাকায় ১৮৪০-৪১ সালে সেখানে একটি সরকারি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। নতুন শিক্ষা প্রণালীতে জনসাধারণের অনীহার ফলে স্কুলে ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতা হেতু

১৮৫৭-তে এই স্কুল উঠে যায়। সুরমা উপত্যকার আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ রেভারেন্ড প্রাইজ সাহেব এর কিছুদিন পরে আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটি মিশনারি স্কুল গড়ে তোলেন এবং ১৮৫৯ সালে এই স্কুল থেকে সর্বপ্রথম ৪ জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন। কেবল নবকিশোর সেন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মোটামুটিভাবে গত শতকের ষাটের দশকেই সিলেটে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হতে দেখা যায়। সিলেটে সরকারি উচ্চ ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৯ সালে।

আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলায় স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৮ ও ছাত্রসংখ্যা ১,১২৭ জন। ছাত্রদের অর্ধেকের বেশি ছিলেন শহরের বাসিন্দা। ২৮টি স্কুলের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী, মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বঙ্গ এই তিন শ্রেণীর স্কুল ছিল। ১৯০০ সালে সিলেট জেলায় ১টি কলেজ, ৭টি হাইস্কুল, ৪৬টি মধ্য ইংরাজী, ১৫টি মধ্য বঙ্গ, ৪৭টি উচ্চ প্রাইমারি স্কুল ও ৮৩৩টি নিম্ন প্রাইমারি স্কুল ছিল বলে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে।[*৭]

১৮৯২ সালে সিলেটে মুরারী চাঁদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাগের আগেই সিলেটের প্রতিটি মহকুমায় একটি করে কলেজ ছিল। ১৯২২ সালে একটি সরকারি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে প্রথম নজর দেন শ্রীহট্ট সম্মিলনী। তাঁরা কলকাতার প্রেস থেকে ছাপানো প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। সিলেটের ব্রাহ্মসমাজও শ্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। রাজচন্দ্র চৌধুরী ও হেমন্তকুমারী চৌধুরী ছিলেন এই বিষয়ে অগ্রণী। ১৯০৩ সালে সিলেটে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় এঁদের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। ওয়েল্স প্রেসবিটেরিয়ান মিশনও বহুদিন একটি বালিকা বিদ্যালয় চালু রেখেছিলেন। পরে এটি কিশোরী মোহন বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। হবিগঞ্জ শহরেও মিশনারিদের পরিচালিত একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল।[*৮]

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে গ্রন্থাগারের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। পঞ্চখণ্ডের কালীকমল পণ্ডিত মহাশয়ের অনিপণ্ডিত গ্রামস্থিত বাসভবনে এক সুরম্য দ্বিতল গৃহে অনিপণ্ডিত সংস্কৃত গ্রন্থাগারটি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারেও বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদে ছিল বহু মূল্যবান বাংলা পুঁথি সংগ্রহ ভাণ্ডার। অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহেও পুঁথির সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার। তিনি দেশ বিভাগের পর এই বিরাট সংগ্রহ প্রথমে তাঁর কর্মস্থল গুয়াহাটিতে এবং পরে কলকাতার সন্তোষপুরস্থিত তাঁর নিজ বাসভবনে স্থানান্তরিত করেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে বহু যত্ন ও পরিশ্রমে গড়া 'মোক্ষদা লাইব্রেরি'র যাবতীয় সংগ্রহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সংগ্রহশালায় দান করে গেছেন।

পাবলিক লাইব্রেরিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল প্রাইজ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি। এ-ছাড়াও সিলেট শহরে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার ছিল বিপিন চন্দ্র গ্রন্থাগার ও দরগা মহল্লার কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের লাইব্রেরি।[*৯]

করিমগঞ্জ শহরের আদিতম হাইস্কুলের নাম রতনমণি হাইস্কুল। এই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শ্যামাচরণ দেব। সেকালের আদর্শ শিক্ষক শ্যামাচরণ দেব মহাশয়ের জীবনীতে দেখা যায় ১৮৯৪ সালে তিনি ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। জীবনীতে অবশ্য স্কুলের নাম নেই। করিমগঞ্জ শহরের এক নব প্রতিষ্ঠিত স্কুল বলে উল্লিখিত আছে।[*১০] পরে এই স্কুলটি সরকারি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। উপরোক্ত তথ্যে স্কুল স্থাপনের সাল উল্লিখিত ছিল না। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যায়, ১৮৬৪ সালে প্রথম স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া নগেন্দ্র নাথ তিলক চাঁদ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় করিমগঞ্জ শহরে ১৮৯৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল।

দেশ বিভাগের আগে করিমগঞ্জ মহকুমায় স্থাপিত উচ্চ ইংরাজী, মধ্যবঙ্গ/মধ্য ইংরাজী ও মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : -

১। করিমগঞ্জ সরকারি হাইস্কুল (বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক)

২। নীলমণি হাইস্কুল ১৯১৬ (পরে উচ্চতর মাধ্যমিকে পরিণত)

৩। মদন মোহন মাধবচরণ বালিকা বিদ্যালয় ১৯৩৫ (পরে উচ্চতর মাধ্যমিকে পরিণত)
৪। শ্রীগৌরী হাইস্কুল (১৯৩৪)
৫। স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যানিকেতন (নীলামবাজার) ১৯৩৭
৬। মডেল হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল (পাথারকান্দি) ১৯৩৭
৭। নারায়ণ নাথ হাইস্কুল (আনিপুর) ১৯৪৬
৮। লাতু হাইস্কুল ১৯৪৬
৯। পাব্লিক হাইস্কুল (বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক)

মধ্যবঙ্গ/মধ্য ইংরাজী স্কুল/মাদ্রাসা

১। ভাঙ্গা এম ই স্কুল ১৯০৩ (পরে হাইস্কুলে পর্যবসিত)
২। বটরসি এম ই মাদ্রাসা- ১৯২৪
৩। রাজচন্দ্র মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়- ১৯২৭
৪। প্রেমময়ী সিনিওর বেসিক স্কুল (পাথারকান্দি) ১৯৪২
৫। দেওরাইল এম ই মাদ্রাসা ১৯২৯
৬। জফরগড় মিডিল ইনস্টিট্যুশন ১৯৪৬ (হাইয়ার সেকেন্ডারিতে পর্যবসিত)
৭। প্রথমে মধ্যবঙ্গ মাদ্রাসা (১৯২৬) হাইমাদ্রাসা (১৯৩৭)

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান

১। হাইয়ার সেকেন্ডারি	২০
২। হাইস্কুল	৪৯ (প্রভিশন্যাল)
৩। মিড্র স্কুল	২৩৯
৪। প্রাইমারি	১১৮৭
৫। প্রি-প্রাইমারি	৪

বর্তমানে কলেজের সংখ্যা **৬**

১। করিমগঞ্জ কলেজ	১৯৪৬
২। রবীন্দ্রসদন	১৯৬১

৩। নবীনচন্দ্র কলেজ (বদরপুর)
৪। রামকৃষ্ণ নগর কলেজ
৫। পাথরকান্দি কলেজ
৬। বিবেকানন্দ কলেজ (চান্দখিরা)
(এখনও সরকারি স্বীকৃতি পায়নি)
(উপরোক্ত তথ্যাদি শ্রীনৃপতিরঞ্জন চৌধুরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

১। মোহনগঞ্জ এল পি স্কুল	১৮৮১
২। কর্ণমধু এল পি স্কুল	১৮৮৬
৩। জাড়াপাতা এল পি স্কুল	১৮৮৬

৪। লক্ষ্মীবাজার এল পি স্কুল ১৮৮৬
৫। সিংগারী এল পি স্কুল ১৮৮৬
৬। আব্দুল মজিদ পাঠশালা ১৮৮৬
৭। মদন মোহন এল পি ১৯৩৯
৮। কালীবাড়ি কালীপ্রসাদ পাঠশালা ১৯৩৬

স্বাধীনতা পরবর্তী করিমগঞ্জ জেলার স্কুল কলেজের পরিসংখ্যান

১। প্রাইমারি স্কুল — ৮৬৬ (১৯৮০)
২। মিড্‌ল স্কুল — ১৫৪ (১৯৮০)
৩। হাইস্কুল/হ ইয়ার সেকেন্ডারি — ৬৩ (১৯৮০)
৪। কলেজ — ৪(১৯৮০)
(এক নজরে করিমগঞ্জ জেলা। যুগশক্তি ৩রা জুলাই, ১৯৮৩ ইং)

বিগত একশত বছরে কাছাড়ে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস

গত একশো বছরে কাছাড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। (১) পূর্বতন সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা (২) আধুনিক ইংরেজি কেতার শিক্ষার প্রবর্তন (৩) ইসলামীয় জ্ঞান চর্চা ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন। বলা বাহুল্য, কালক্রমে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার শাখাটিই জীবন-জীবিকার কারণে ও উন্নততর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম রূপে ক্রম প্রসারিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, অতীতে কাছাড়ের রাজারা ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। নবদ্বীপে গিয়ে সংস্কৃত শিক্ষা ও কলকাতায় আধুনিক বিদ্যাচর্চার সুবিধাদানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নির্বিশেষে তাঁরা বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন। এই রাজারা কতিপয় পণ্ডিতকে ছাত্রদের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন- অবশ্য এই সুযোগ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, কাছাড়ের মুসলমান সমাজ তখনও ছিলেন শিক্ষালাভের এই সুযোগ-সুবিধার বাইরে। শ্রীহট্টের ক্ষেত্রেও মোটামুটি এই একই চিত্র ছিল। রাজারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান করতেন। এই সম্পর্কিত দলিলাদি এর সাক্ষ্য বহন করে। এইসব ব্রাহ্মাণ-পণ্ডিতদের নিজ নিজ বাসগৃহে সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র চর্চার শিক্ষার্থীদের জন্য টোলও থাকত।[*১১] বড়খলা-বিক্রমপুর অঞ্চল, উধারবন্দ, শিলচর এবং অন্যত্র বহু জায়গায় টোল ছিল। শিলচর শহরের বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সূর্যকুমার তর্ক সরস্বতীর আর্যপট্টিস্থ বাসগৃহে এরকম একটি টোল বহুকাল ধরে ছিল। এবং সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে এই টোল তাঁরই নাম ধারণ করে চতুষ্পাঠী রূপে ইটখলায় স্বগৃহে সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চার ধারাটিকে আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। আধুনিক শিক্ষার ধারাটি ক্রমে বিস্তার লাভ করায় পূর্বতন ধারা ক্ষীয়মাণ হয়ে এলেও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিদ্যাচর্চার এই ধারাটি আজও অক্ষুন্ন রয়েছে।

এবার আসা যাক শিক্ষা পদ্ধতির দ্বিতীয় ধারাটির আলোচনায়। এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে কাছাড়ের তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক গতি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরানো প্রয়োজন।

১৮৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল গভীর রাত্রিতে রক্ষী বাহিনীর কতিপয় মণিপুরী দুষ্কৃতী গোবিন্দ চন্দ্রকে হত্যা করার পর অনেক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৮৩২ সালের ১৪ই আগস্ট কাছাড় রাজ্য ব্রিটিশ কর্তৃত্বে চলে যায়। উত্তর কাছাড় ব্রিটিশ অধিকারে যায় ১৮৫৪ সালে। নবলব্ধ কাছাড় রাজ্যের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার ক্যাপ্টেন ফিসারের হাতে অর্পণ করেছিল। শ্রীহাট-কাছাড় অঞ্চল ভূভাগ সম্পর্কে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কারণে তিনি এই কাজে বিরাট দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূলত সরকারের এজেন্ট ক্যাপ্টেন ফিসারের দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই সুরমা উপত্যকাকে বৃহত্তর বঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে ঢাকা ডিভিশনের অধীনে রাখা হয়েছিল। অবশ্যই এর ফলে সুদুর প্রসারী অতীত ও বর্তমানের মেল

বন্ধনকারী ইতিবাচক রূপান্তর সূচিত হয়েছিল। শ্রীহট্ট সমন্বিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হবার ফলে কমপক্ষে দ্বিশতাব্দী কাল ব্যাপী রাজতন্ত্রের অধীনে ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনে পশ্চাদপদ কাছাড়ভূমি এক বিশাল ক্ষেত্রের সন্ধান এবং আধুনিক জীবন প্রণালী ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পেতে শুরু করেছিল। কাছাড় জেলার ভারপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাপ্টেন ফিসার অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পুরানো দিনের কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ এবং বয়োবৃদ্ধ লোকমুখে আগেকার বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে যতখানি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছিলেন। এ-সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে যাবার আগে অবশ্যই এটুকু বলতে হয় যে, সুচিন্তিত এইসব প্রয়াস কাছাড়ের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ডেকে আনছিল। আর এই সব গঠনমুখী প্রয়াস সংঘটিত হয়েছিল বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকারম্ভের কাছাকাছি সময় জুড়ে।

কাছাড়ের প্রথম ইংরেজ সুপার ফিসার ১৮৩৪ সালের জুনে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে অবিলম্বে কাছাড়ে শিক্ষার সুযোগ প্রসারের সুপারিশ ছিল।[*১২] এই জেলার শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মতও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবশ্যই আজ তা স্মরণযোগ্য। সুপারিশ কার্যকরী হতে বেশ সময় লেগে গিয়েছিল। ততদিনে পরবর্তী সুপার বার্নস কার্যভার নিয়েছেন। ১৮৩৭সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বার্নসের রিপোর্টে দেখা যায় তিনি বলেছেন যে, আধুনিক শিক্ষা চালু হলে তা হবে কাছাড়বাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ এবং সরকারের অভিপ্রায়ও তাই, কিন্তু এর জন্য যা ব্যয় হবে তা এই জেলার আয়ের উৎস থেকে কুলোবে না। এমন আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, জনপদবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবির চাপের মুখে পড়ে ১৮৩৮-র ২৫শে এপ্রিল একই ব্যক্তি নিম্নোক্ত সুপারিশ করলেন- '... কাছাড়ে স্কুলের জন্য উপযুক্ত জায়গা তিনটি থানায় যথাক্রমে শিলচর (সদর) হাইলাকান্দি এবং কাটিগড়া ও সোনাপুর পরগণা শিক্ষক নিয়োগের জন্য এই জেলায় উপযুক্ত লোক দেখি না তাই এখানে স্কুল হলে যোগ্য শিক্ষক সিলেট থেকেই আনতে হবে। একজন পণ্ডিত সেখানে আছেন যার কথা ক্যাপ্টেন ফিসার প্রস্তাব করেছিলেন। এখানে একজন শিক্ষকতার উপযুক্ত ব্যক্তি বাজস্ব বিভাগে আছেন।... আমি মনে করি মাসিক ২০ টাকা বেতন যথেষ্ট হবে।'

অতঃপর শিলচরে একটি স্কুল খোলা হল। স্থানীয় আমলা ও সুপারিন্টেন্ডেন্টের দেওয়া চাঁদায় কিছুদিন চলার পর আদায়পত্র যথারীতি না হওয়ার দরুন বন্ধ হয়ে যায়।[*১৩] ১৮৫১-তে অভিভাবকদের তরফে সুরমা ভ্যালির কমিশনারের কাছে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করে আবেদন করা হল। মজার কথাটি হল এই যে, তিনি যখন আবেদনকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে ডেকে এঁদের মধ্যে কতজন মাসিক এক আনা করে চাঁদা দিতে পারবেন বলে নিশ্চিত হতে চাইলেন তখন কেউই এই প্রস্তাবে এগিয়ে এলেন না। আবার কেউ কেউ উল্টে অনুরোধ জানালেন অবিলম্বে এমন একটি সরকারি স্কুল খোলা হোক যাতে ছাত্ররা পড়াশোনার জন্য বৃত্তিমূলক সাহায্য পায়। এই ঘটনা থেকে মনে হয় যে তৎকালীন আমলারা সচ্ছল ছিলেন না সন্তানদের শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী অথচ আর্থিক অসঙ্গতি বেশি ছিল তাঁদের। বার্নার এই অনুরোধ ফেলতে পারেননি- তিনি সরকারি স্কুল স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি স্কুল স্থাপনের প্রয়াস সফল না হলেও ১৮৫৭ সালে স্থানীয় মানুষদের অনুদানের উপর নির্ভর করে শিলচর, হাইলাকান্দি ও কাটিগড়ায় তিনটি স্কুল চালু হয়। শিলচর স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২৮, হাইলাকান্দি ও কাটিগড়ায় গড়ে ৩০ জন করে। ১৮৬১-তে শিলচরের স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ১৩-তে নেমে আসে এবং পর বৎসর বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচ বছরে স্কুলটিতে যে-সব ছাত্র বাংলা ও ইংরেজি মোটামুটি রপ্ত করেছিল তাঁরা সবাই সরকারি অফিসগুলিতে বা চা বাগানে চাকরি পেয়ে যায়।[*১৪]

যে ভাবেই হউক, হাইলাকান্দি ও কাটিগড়ার স্কুল দুটি ব্যক্তিগত চাঁদার উপর নির্ভর করেই টিঁকে ছিল। শিলচরে স্কুল স্থাপনে সরকারের অনিচ্ছায় স্থানীয় আমলা ও জনসাধারণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন — তাদের সমালোচনামূলক মনোভাব নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল বলে সরকারের পক্ষে আর উদাসীন থাকা সম্ভব হল না। ১৮৬২-র ১৭ জুলাই তৎকালীন সুপার স্টুয়ার্ট স্কুল ইন্সপেক্টর মার্টিনকে শিলচরে সরকারি স্কুল স্থাপনের ও

প্রাথমিক ও নির্বাহী ব্যয় হিসাবে মাসিক ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বরাদ্দ করার অনুরোধ জানালেন। অতঃপর সরকার কাছাড়ে সরকারি উদ্যোগে ইংরেজি স্কুল খোলার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেন।[*১৫]

রেভারেন্ড প্রাইজ ও কাছাড়ে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা : সিলেটে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী পুরুষ রেভারেন্ড প্রাইজের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি সেখানে যে মিশনারি স্কুল খুলেছিলেন সেখান থেকে ১৮৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার পরীক্ষার্থী হয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন নবকিশোর সেন। সিলেটে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সফল হবার পর প্রাইজ সাহেব কাছাড়ে স্কুল স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করলে পর স্টুয়ার্ট তাঁকে পূর্বতন স্কুল ভবনে স্কুল খোলার অনুমতি দান করেন। ১৮৬৩-র নভেম্বরে প্রাইজ সাহেব শিলচর আসেন এবং ১লা ডিসেম্বর ৮০ জন ছাত্র নিয়ে কাছাড় হাই গ্রামার স্কুল আরম্ভ করেন। তাঁরই ছাত্র বাবু নবকিশোর সেন সরকার তরফে মাসিক ৮০ টাকা বেতনে প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৬৮-র আগস্ট পর্যন্ত স্কুলটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল। তারপরে সরকারি জেলা স্কুলে পরিণত হয়। এই সময়ে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ছিলেন অভয়াচরণ ভট্টাচার্য। নবকিশোর সেন তখন সুরমা ভ্যালির স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৩-তে রেভারেন্ড প্রাইজ কর্তৃক কাছাড় হাই গ্রামার স্কুল প্রতিষ্ঠাকে আমরা কাছাড়ে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা পর্ব বলে ধরে নিতে পারি।[*১৬]

কাছাড় হাই গ্রামার স্কুলে প্রথম দিকে নিচের ক্লাসগুলিতে করিমগঞ্জের প্রখ্যাত কবি প্যারীচরণ দাসের 'পদ্যপুস্তক' পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হত। ১৮৭৬ সালে রচিত এই বইটি ছিল সুরমা উপত্যকার প্রচলিত মুখের ভাষায় লেখা। কিছুদিনের মধ্যেই এ-বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয় এবং আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে প্রচলিত মুখ্য রীতি প্রবর্তনের দাবি তদানীন্তন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ বাবু নবকিশোর সেনকে জানানো হয়। প্রগতিশীল উন্নত চিন্তার অধিকারী সেনমহাশয় এই দাবি সমর্থন করেন এবং এই অঞ্চলে মাতৃভাষা শিক্ষায় আঞ্চলিক রূপটির পরিবর্তে বঙ্গ ভাষার কেন্দ্রীয় রূপরীতি গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে তা চালু করার ব্যবস্থা করেন।[*১৭]

কাছাড়ে উচ্চ ইংরেজি স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকে আমরা একটি মাইলস্টোন হিসেবে ধরে নিতে পারি। ১৮৬৩ সালে এই স্কুল স্থাপিত হলেও এর অগ্রগতির ইতিহাস মসৃণ নয়। বস্তুত শিক্ষার ব্যাপারটা সামাজিক অবস্থার সঙ্গে জড়িত বলে অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে কাছাড়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে খানিকটা বিলম্ব অবশ্যই ঘটেছিল। শ্রদ্ধেয় দেবব্রত দত্তমহাশয় তাঁর 'History of the Silchar Government Higher Secondary School' পুস্তিকায় এর অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। বিস্তারিত এই বিবরণ থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করছি।

কাছাড়ে ইংরেজি স্কুল শিক্ষা প্রবর্তনের পরেও বহুদিন কাছাড়বাসী জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এই ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্যোগহীন ছিলেন। স্কুলের দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক অভয়াচরণ ভট্টাচার্য এই বিষয়ে সরকারকে অবহিত করে স্থানীয় ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহিত করতে বেতন মকুবের সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হয়। বেশ কয়েক বছর পরে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল — ঠিক কোন বছরে তা না জানতে পারলেও ১৮৮৮ সালের আগে যে তা হয়েছিল সেটা নিশ্চিত বলা যায়।[*১৮]

১৮৮০ সালে উচ্চ ইংরাজি স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের টানতে পৃথক একটি ফারসি ভাষা শিক্ষার ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮২-৮৫ পর্যন্ত এই ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা ১২, ১৮, ১৭ এবং ১১ ছিল, তার পরই ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকায় ১৮৮৮-তে ক্লাসটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৮-৭৯ সালে স্কুল পরিদর্শকের রিপোর্টে জানা যায় যে একজন মৌলবিকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি আশা প্রকাশ করছেন যে এতে মুসলমান ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় স্কুলে আসতে উৎসাহ বোধ করবে।

তৎকালীন শিক্ষা আধিকারিকের ১৮৭০-৭১-এর রিপোর্টে জানা যায় যে কাছাড়ে ৫টি সরকারি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে মোট ২৪৮ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করছে। পরের বছরকার রিপোর্টে দেখা যায় যে, সরকারি

উচ্চ ইংরাজি স্কুলের সংখ্যা ১, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১ ও ১টি বেসরকারি স্কুল কাছাড়ে রয়েছে। ১৮৭২-৭৩-এর রিপোর্টে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কারণ স্কুলগুলিতে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা তখন প্রসারিত হয়েছে। এই বছরের হিসেবে দেখা যায়, উচ্চ ইংরাজি স্কুল একটিই রয়েছে, ৩টি সরকারি মধ্যবঙ্গ স্কুল, পুরনো পাঠশালা ১টি, ১৯টি নতুন পাঠশালা ও ১০৪টি বেসরকারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট স্কুলের সংখ্যা তখন ১২৮ এবং ছাত্রসংখ্যা ২,২৫৯তে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে বছরের পর বছর স্কুলের সংখ্যাও একই সঙ্গে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭৫ সালে শিলচরে নর্মাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কাছাড়-সিলেট এই দুই জেলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের জোগান দিতে। প্রথমাবস্থায় ১৬ জন শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং নেবার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৭৬-এ শিলচরে ২টি মধ্য-ইংরাজি স্কুল, হাইলাকান্দিতে ১টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজি স্কুল এবং বড়খলা, কাটিগড়া ও নরসিংপুরে মধ্য ইংরাজি ও মধ্যবঙ্গ স্কুল খোলা হয়েছিল।[*১৯] ততদিনে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারেও এখানকার সমাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্রীরাও পড়াশোনা আরম্ভ করেছে, অবশ্যই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। উচ্চ ও মধ্যবর্গের মেয়েদের ক্ষেত্রে সামাজিক অবরোধ তখনও শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণে ছিল নিষেধের বেড়াজালে ঘেরা। ১৮৯১-র সেন্সাস রিপোর্টে এডোয়ার্ড গেইট্ লক্ষ করেছেন – 'সমতল কাছাড়ে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা সর্বাধিক এবং একই অংশে ছাত্রীদের সংখ্যাও সর্বাধিক'। ১৮৯৫-তে ওয়েল্স প্রেসবিটারিয়ান মিশন শিলচরে মেয়েদের উচ্চ ইংরাজি স্কুল চালু করেন পরে এটি সরকার অধিগ্রহণ করেন।[*২০] তাই দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক কাছাড়ে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে সূচনাকালেই অবদান রেখেছে। আমরা বিগত শতাব্দীকে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে ধরে নিতে পারি।

কাছাড়ে শিক্ষার মাধ্যম গোড়া থেকেই ছিল বাংলা। উচ্চ ইংরাজি স্কুলগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত শিলচরে এন্ট্রান্স পরীক্ষার কোনও কেন্দ্র ছিল না, কামিনী কুমার চন্দ ও রায়বাহাদুর হরিচরণ দাস শিলচরে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং ১৯০৬ সালে শিলচরে উক্ত পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়।[*২১]

১৯০০ সাল পর্যন্ত কাছাড়ে শিক্ষা বিস্তারের বাস্তব চিত্র নিম্নোধৃত সংখ্যাচিত্রে পাওয়া যায়।[*২২]

Year	No. of Secondary Schools	Pupils	No. of Primary Schools	Pupils	Total No. of Pupils
1874-75	7	373	108	2,119	2,492
1880-81	7	446	99	2,565	3,001
1890-91	3	413	190	4,708	5,121
1900-01	4	654	248	7,188	7,842

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে কাছাড়ে শিক্ষিতের সংখ্যা ৫১,৬৯২; এরমধ্যে ৪৬,২৭১ জন পুরুষ ও ৫,৪২১ জন মহিলা। শিক্ষিতের হার ছিল ১১%।[*২৩]

এই শতাব্দীতে পৌঁছানোর পর কাছাড়ের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লক্ষ করা যায়। শিলচর সরকারি হাইস্কুলে ছাত্র সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯১০-এ ৪৩০ জন ছাত্র ছিল এবং ওই বৎসরে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৬ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে ১৫ জন প্রথম বিভাগে এবং একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ৭ জন বৃত্তিলাভ করে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে অনেক ছাত্র সরকারি স্কুল ত্যাগ করায় স্বদেশী ভাবাপন্ন ছাত্রদের নিয়ে একটি স্কুল-কাছাড় হাইস্কুল নামে স্থাপিত হয়েছিল। মেয়েদের জন্যও দীননাথ নবকিশোর বালিকা বিদ্যালয় ওই সময়েই গড়ে ওঠে।[*২৪] শ্যামাচরণ দেব ও তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী দেব ছিলেন ওই সময়ে স্বদেশী শিক্ষাধারার পথিকৃৎ। সারা সুরমা উপত্যকায় এই দম্পতির নাম স্বদেশী শিক্ষাধারার সঙ্গে জড়িত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের মুক্তি আন্দোলন ও শিক্ষাকে একসূত্রে গ্রথিত করে জাতীয় ভাবধারায় সেইসময়কার তরুণ প্রজন্মকে

উদ্বুদ্ধ করার ব্রতে তাঁদের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনা বর্তমান ও ভাবীকালের ইতিহাসে স্থান পাবার দাবি রাখে। কাছাড়ের সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় অবশ্যই আমাদের এই সত্যটির প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন।

১৯৩৫-এ শিলচরে গুরুচরণ কলেজের প্রতিষ্ঠা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কাছাড়কে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিল। অরুণ কুমার চন্দ ছিলেন প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ। ৬০ জন ছাত্র নিয়ে কলেজের ক্লাস আরম্ভ হয়েছিল। প্রথমবর্ষের ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে খ্যাতনামা হয়েছিলেন "রামেন্দ্র দেশমুখ্য ও সুধীর সেন, কপিল ভট্টাচার্য ও আর্জান আলি। প্রথম থেকেই কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি বিশিষ্ট কলেজ রূপে গুরুচরণ কলেজ অনতিবিলম্বে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছিল।[*২৫]

কাছাড় তথা বরাক উপত্যকায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার : আগেই বলা হয়েছে যে, কাছাড়ে তথা বরাক উপত্যকায় শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। এখন তৃতীয় ধারাটির অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টি আলোচনায় আসছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে ১৮৯৭ সালে (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) কাছাড়ের বাঁশকান্দিতে হাজি হাফিজ মোঃ আকবর যে মাদ্রাসা স্থাপন করেন সেটাই কাছাড়ের প্রাচীনতম দ্বিনী মাদ্রাসা। ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মৌলানা আহমদ আলি ১৯৫৫ সালে বাঁশকান্দি মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও শিক্ষার পরিধির ব্যাপক প্রসার ঘটে। বর্তমানে বাঁশকান্দির দারুল উলুম মাদ্রাসা ভারতবর্ষের অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত।[*২৬]

বরাক উপত্যকায় সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসা শিক্ষা : স্বাধীনতা লাভের পর সকল প্রকার শিক্ষা প্রসারে যথোপযুক্ত মনোযোগ সরকারের তরফে পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার যথাযথ পরিচালনারও ব্যবস্থা করছেন। 'আসাম স্টেট মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড' দ্বারা সরকারি সাহায্য বা অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি পরিচালিত হচ্ছে। এ-সকল মাদ্রাসাতে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সিনিয়র মাদ্রাসাগুলিতে হাইস্কুল কোর্সের পাঠক্রম পড়ানো হয়ে থাকে। এইসকল মাদ্রাসায় প্রায় কুড়িটি বিষয় পড়ানো হয়।

বরাক উপত্যকায় একুশটি সিনিয়র মাদ্রাসা বিদ্যমান। তন্মধ্যে কাছাড় জেলার সোনাই, কালাইন, গণিরগ্রাম, বিক্রমপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, করিমগঞ্জ জেলার পুরাহুরিয়া, দেওরাইল (বদরপুর), হাইলাকান্দি জেলার হাইলাকান্দি সিনিয়র ও ভাটির কূপা সিনিয়র মাদ্রাসা প্রভৃতি। এ সকল মাদ্রাসায় কোরাণ শরিফ, হাদিস, ফেকা, তফসির আকাইদ, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, হিন্দি, অসমিয়া ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। ওই সকল সিনিয়র মাদ্রাসায় দশটি শ্রেণী রয়েছে। এফ এম পরীক্ষা সিনিয়র মাদ্রাসা সমূহের শেষ পরীক্ষা। যারা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ। তারা এফ এম সার্টিফিকেট লাভ করে। এই ডিগ্রি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত সিনিয়র মাদ্রাসা ও টাইটেল পাশ করা ছাত্রদের তিনটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সিনিয়র মাদ্রাসা পাশ করার পর ছাত্রদের দুই বৎসর টাইটেল মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করতে হয়। টাইটেল পাশ করা ছাত্রদের এম এম ডিগ্রি (মমত্তাজুল মুহাদ্দিদিন) প্রদান করা হয়। বরাক উপত্যকায় তিনটি টাইটেল মাদ্রাসা রয়েছে- যথা বদরপুর দেওরাইল টাইটেল মাদ্রাসা, আছিমগঞ্জ টাইটেল মাদ্রাসা ও হাইলাকান্দি টাইটেল মাদ্রাসা।[*২৭]

বেসরকারি পর্যায়ের মাদ্রাসা : দেশে বেসরকারি পর্যায়ে অর্থাৎ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অনুদানে, সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা চালু আছে। মুসলিম অধ্যুষিত প্রতি পাড়া বা গ্রামে যেমন ধর্মীয় উপাসনার জন্য মসজিদ রয়েছে ঠিক তেমনি পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা রয়েছে। এ-গুলোকে ছবায়ী মক্তব বলা হয়। প্রতিটি পরিবারের ছেলেমেয়েরা ওই সকল ছবায়ী মক্তবে প্রাথমিকভাবে শিক্ষালাভ করে এবং তৎসহ তাদের আদব-কায়দা এবং ভবিষ্যৎ গঠনের শিক্ষা প্রদান করা হয়। দিনের বেলা যাতে ওই সকল ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে অধ্যয়ন করতে পারে সেইজন্য ছবায়ী মক্তবগুলোতে

সকালবেলা শিক্ষাদান করা হয়। পাড়ার লোকেরা আদায়ীকৃত চাঁদা দ্বারা এইসকল মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন প্রদান করেন।

তৎপরে উচ্চ শিক্ষার জন্য বহু দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের বরাক উপত্যকায় আছে। ওই সকল মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এ ধরনের মাদ্রাসায় মাধ্যমিক শিক্ষা তুল্য শিক্ষা প্রদানের পরিবেশ ও সুব্যবস্থা বর্তমান। জনসাধারণ ওই সকল মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন। তা ছাড়া ধান, সুপারি ইত্যাদির চাঁদাও আদায় করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষায় ওই সকল মাদ্রাসার গুরুত্ব অপরিসীম, তাই জনগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে মাদ্রাসা স্থাপন, গৃহ নির্মাণ, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জায়গির বা বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করে থাকেন। বাঁশকান্দি, ভাঙ্গা, লালা, গোবিন্দপুর, বড়খলা, বুড়ীবাইল, জয়নগর, বেরেঙ্গা ও বচলা প্রভৃতি সহ বরাক উপত্যকায় এ ধরনের পঞ্চাশেরও অধিক সংখ্যক মাদ্রাসা আছে।[*২৮]

উপরোক্ত পর্যায়ের মাদ্রাসা সমূহের পাঠক্রম সমাপনান্তে ছাত্র বা তালেবাগণকে পূর্বে অধিকতর উচ্চশিক্ষা ও উচ্চ ডিগ্রি লাভের জন্য উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দ দারুল উলুম (ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়) রামপুর ও সাহারাণপুর মাদ্রাসায় ভর্তি হতে হত। বর্তমানে কাছাড়ের বাঁশকান্দিতে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা সমন্বিত দারুল উলুম মাদ্রাসা থাকার কারণে ছাত্রদের আর বাইরে যেতে হয় না। উল্লেখ্য যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসাগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রদিগকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার প্রথা ছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসার আন্তর্জাতিক খ্যাতিও ছিল। বাঁশকান্দি দারুল উলুম মাদ্রাসায় উচ্চতর পর্যায়ের ইসলামিক শিক্ষা দানের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা দানের ব্যবস্থাও রয়েছে। দেওবন্দের মত এখানেও ছাত্রদের জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হয়। দারুল উলুম মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের রীতিমত ডিগ্রিও প্রদান করা হয়।

পূর্ব গোবিন্দপুরে ১৯৭৫ সাল থেকে একটি বহুমুখী ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র নানা দিক দিয়ে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এই প্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসা বিভাগে মুসলমান মেয়েদের জন্যও ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এ-ছাড়া প্রচার বিভাগে বাংলা ও উর্দু ভাষায় ধর্মগ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থার সঙ্গে পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। চিকিৎসা বিভাগে দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও প্রতিবন্ধী জনসাধারণ ও গরিব ছাত্রদের জন্য মিছকিন কাণ্ড চালু করা হয়েছে।[*২৯]

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ, মুদ্রণ যন্ত্র অর্থাৎ প্রেসের পত্তন ও লাইব্রেরির সুযোগ-সুবিধা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেখা যায় যে প্রথম অবস্থায় সরকারি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই ক্যালকাটা বুক সোসাইটি থেকে নিজ উদ্যোগে আনতেন। শিলচরের প্রথম বুক ষ্টলটি ছিল দেওয়ানজিবাজারে, মহানন্দ দে এটি চালাতেন। এর পরে জানিগঞ্জে স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই সরস্বতী লাইব্রেরি ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজন মেটাতে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিল।[*৩০]

১৮৭৬ সালে তদানীন্তন আসামের চিফ কমিশনারের আগমন উপলক্ষে কিটিঞ্জ লাইব্রেরি নামে একটি পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। স্বাধীনতা কালে এর নাম হয় অরুণ চন্দ্র গ্রন্থাগার।[*৩১] বর্তমানে স্থানীয় গান্ধীভবনে গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হয়েছে। এ-ছাড়াও ৺হেমচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অকাল প্রয়াতা কন্যা যুথিকা দত্তের নামে শিবসুন্দরী নারী শিক্ষাশ্রম সংলগ্ন স্থানে যুথিকা পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল।

কাছাড়ে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার ঘটার সময় আর্যপট্টিতে ও শহরের আরও কোনও কোনও পাড়ায় তরুণদের বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য পাঠাগার গড়ে উঠেছিল। সরকারের কোপদৃষ্টি এড়াতে বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত তরুণগণ পাঠাগারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে এই আদর্শ ছড়িয়ে দিতে তৎপর ছিলেন। আর্যপট্টির 'আর্য সাহিত্য মন্দির'-এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় পঞ্চাশের দশকটি কাছাড়ের ক্ষেত্রে ছিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। দেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিতির কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাত এই অঞ্চলবাসী জনজীবনে এক অপরিমেয় দুর্যোগ ডেকে এনেছিল। জাপ-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০-৪২-এর মধ্যে কাছাড় যুদ্ধ-ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। সম্ভাব্য জাপ-আক্রমণ ঠেকাতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে এখানে

মোতায়েন করা হয়েছিল। শিলচর শহর সহ সংলগ্ন এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল না বলে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৪২ সালের ৮ মে তারিখে দার্বি চা বাগানে জাপানি বোমাবর্ষণের পর আতঙ্কগ্রস্ত শহরবাসী ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতে জনবহুল ব্যস্ত শহর এক পরিত্যক্ত জনপদে পরিণত হয়েছিল। জাপ আক্রান্ত বার্মাদেশ থেকে দলে দলে ঘরছাড়া ভারতীয় মানুষ সীমান্ত স্টেশন শিলচরে এসে ভিড় করেছিল। তাদের থাকার জন্য তারাপুরে স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে বিরাট জায়গা জুড়ে অস্থায়ী ক্যাম্প হয়েছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিরাট অংশ এই সব বিড়ম্বিত আশ্রয়প্রার্থীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। কাছাড়ের শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তখন জাতীয় ভাবোদ্দীপক প্রেরণা নতুনভাবে উজ্জীবিত হতে দেখা যায়। ১৯৪৪-এর ১৪ আগস্ট আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশের মাটিতে প্রবেশ করেছিল। আজাদ হিন্দ মুক্তি বাহিনী কোহিমা ও ইম্ফল পৌঁছানোর পরও কাছাড়বাসীর কাছে ব্রিটিশ রাজশক্তির অপকৌশলে তা অজ্ঞাত থেকে যায়। তা না হলে ইতিহাস হয়তো অন্য পথে প্রবাহিত হত। দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলি তখন দ্রুত স্বাধীনতা লাভের কাংক্ষিত দিনটির দিকে এগিয়ে চলেছে। দেশের পরিবর্তমান ঘটনাবলির সঙ্গে তাল রেখে ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে শিলচরে এক বিশাল ছাত্র-যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি রেখেছিল।[*৩২] একই মাসে আসাম জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনভেনশন একাংশ মুসলিম কর্তৃক উত্থাপিত দেশ বিভাগের দাবির সমালোচনা করে অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উপস্থিত করেছিল।

সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত আকাঙক্ষাকে পদদলিত করে অনেক ক্ষয়ক্ষতির ভেতর দিয়ে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা আমরা পেলাম ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। সারা দেশের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলেও বিভাগের খাঁড়ার ঘা সিলেট জেলার সিংহভাগ কেড়ে নিল। সুরমা উপত্যকার আর রইল না। কেবল করিমগঞ্জ মহকুমার খণ্ডিত অংশভাগ কাছাড়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। ভাগাভাগির এই ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত যে রাজনীতি তা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন যে নয় তা অচিরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই শিক্ষার আলোচনায় এইসব অবাঞ্ছিত ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয় বরঞ্চ অনিবার্য বলে মনে হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই আসামের উদীয়মান অসমিয়া ধনী শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মধ্যে তীব্র বাঙালি বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। স্বাধীনতার পরে এই বিদ্বেষ বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। সোনার আসাম বিদেশী বহিরাগতদের কবলে চলে যাচ্ছে এমন এক আশঙ্কায় নিজস্ব জাতিসত্ত্বা ও ভাষা-সংহতির প্রাধান্য স্থাপনে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। বৈষম্যমূলক এই মনোভাবের কুৎসিত প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৫১ ও ৫৫ সালে সংঘটিত হিংসাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। বহুভাষিক আসামকে এক ভাষী রাজ্য করার জবরদস্তিমূলক প্রয়াসে ১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর আসাম বিধানসভায় সরকারি ভাষা বিল গৃহীত হয়ে গেল। এই রাজ্যের অনসমিয়া ভাষীদের কাছে এই বিলটির অগণতান্ত্রিক, উগ্র জাতি বিদ্বেষী চরিত্র ধরা পড়ে গেল। প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের রাস্তা ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। সামনে এসে গেল উত্তাল ঝড়ো দিন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কত যে ঘরবাড়ি পুড়ল। অকথ্য নিপীড়ন আর খুনখারাপি চলল তার ইতিহাস কালের দলিলে লেখা আছে। গৃহহারা অগণিত মানুষ ভিড় করে নেমে এল বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষী এলাকায় আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। এদিকে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হল কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি মিলিয়ে। গঠিত হল 'কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ'। শিক্ষা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভাষা সংগ্রামের কথা অবশ্যই বলতে হবে, কেন না ভাষার সঙ্গে শিক্ষার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল 'আসামের অন্যতম রাজ্যভাষা হিসেবে বাংলাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে'। মাতৃভাষার স্বীকৃতি আদায়ের এই আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছিল সারা উপত্যকা জুড়ে। ১৯৬১-র ৯ এপ্রিল করিমগঞ্জে সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ১৯ মে কাছাড়ের সর্বত্র বন্ধ ডাকা হবে। সেদিনের সর্বাত্মক বন্ধ যে অভূতপূর্ব গণ জাগরণ সৃষ্টি করেছিল তা ঠেকাতে শাসকশ্রেণী নিষ্ঠুর বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে শিলচর রেল স্টেশনে এগারোটি তরুণ প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল সে ইতিহাস আমাদের গৌরবের ইতিহাস। বিগত বঙ্গীয় শতকের ইতিহাসে মাতৃভাষার সংগ্রামে বীর শহীদদের আত্মদানের এই দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

১৯ মে'র পরবর্তী দিনগুলিতে গণরোষের যে দৃপ্ত মুখচ্ছবি সেদিনকার কাছাড়বাসী প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার কোনও প্রতিতুলনা নেই। কেন্দ্র নড়েচড়ে বসলেন- ছুটে এলেন তৎকালীন গৃহমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। সরকারি ভাষা বিলে বাংলা ভাষাকে সহকারী রাজ্যভাষারূপে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব রেখে শাস্ত্রী ফর্মুলা তৈরি হল। কাছাড়ের জন্য সরকারি ভাষা বাংলা। রাজ্য রাজধানীর সঙ্গে সরকারি সমস্ত যোগাযোগের মাধ্যম রূপে 'ইংরেজি'কে বহাল রাখা হল।[*৩৪]

এইভাবে একটা স্থিতাবস্থা প্রায় এক দশক কাল বজায় থাকার পর ১৯৭২-এর ১২ জুন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল 'অসমিয়া'কে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে একমাত্র মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেন। বাংলা ও অন্যান্য অনসমিয়া ভাষাকে বিকল্প মাধ্যম করার দাবিকে নস্যাৎ করা হল। এর প্রতিক্রিয়ায় বরাক উপত্যকার বিক্ষুব্ধ জনমতের বিস্ফোরক চেহারাকে শান্ত করার প্রয়োজনে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সংশোধন করে ইংরেজিকে শিক্ষা মাধ্যমরূপে দশ বৎসরের জন্য বহাল রাখা হল। ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ও ওই একই নীতি গ্রহণ করল। রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়, দুটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। ১৯৭২ সাল আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে অবশ্যই একটি স্মরণীয় বর্ষরূপে গণ্য হবার যোগ্য। একই বর্ষের ৩০ ডিসেম্বর আসাম মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৭০ সালে গৃহীত সর্বজনস্বীকৃত ক্যারিকুলাম বাতিল করে বৈষম্যমূলক এক নতুন ক্যারিকুলাম জারি করা হল, রাজ্য সরকারের ভাষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।[*৩৫]

এরফলে বরাক উপত্যকার জনসমাজ বিশেষত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং ১৯৭৩-এর ৪ ফেব্রুয়ারি বরাক উপত্যকার শিক্ষাবিষয়ক প্রথম গণ অভিবর্তন করিমগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন বিধায়ক মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী ছিলেন এই অভিবর্তনের সভাপতি। ১৯৭২-এর ৩০ ডিসেম্বরের ক্যারিকুলাম বাতিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসমিয়া ভাষার সঙ্গে ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিকে বিকল্প স্থায়ী মাধ্যম করার প্রস্তাব এই উপত্যকার গণ-দাবি বলে গৃহীত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য শিলচর গুরুচরণ কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ মেহরাব আলি লস্করের সভাপতিত্বে গঠিত হয় সর্বস্তর শিক্ষক সমন্বয় সমিতি যা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব যুক্ত হয়ে ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে 'শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি' নামে গঠিত হয়।[*৩৬]

শিক্ষকদের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে এবং এই উপত্যকার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহ ওই ক্যারিকুলাম প্রত্যাখ্যান করে। সরকার এবং শিক্ষা পর্ষদ ক্যারিকুলামের অসমিয়া ভাষা সংক্রান্ত অংশের প্রয়োগ অবশেষে স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করলেন। ষাটের দশক থেকেই আমরা বরাক উপত্যকার জাগ্রত জনমতের সামনে আসাম সরকার ও মধ্য শিক্ষা পর্ষদকে বারবার হটে আসতে দেখি। এইসব বাস্তব ঘটনা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে অগণতান্ত্রিক, বৈষম্যমূলক বঞ্চনার নীতি ও কর্মপ্রণালীর ধারক ও বাহকদের অনিবার্যভাবে প্রতিহত হতে হয়।

ঘটনাবলির অনুধাবনে দেখা যায় যে এই স্থগিতাদেশ মোটামুটি ১৯৮২-র ডিসেম্বর পর্যন্ত বহাল থাকার পর শিক্ষা পর্ষদ আবার নির্দেশ দিলেন- পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে অসমিয়া বাধ্যতামূলক করা হবে এবং ১৯৮৬-তে শিক্ষান্ত পরীক্ষায় তৃতীয় ভাষারূপে এই ভাষার পরীক্ষা দিতে হবে। এই নির্দেশনামার প্রতিবাদে ১৯৮৩-র ১৪ মে শিলচরে শিক্ষাবিষয়ক ৫ম অভিবর্তন আহ্বান করে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি। সর্বস্তরের শিক্ষক, অভিভাবক, গণ সংগঠন ও ব্যাপক জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক সেই ঐতিহাসিক অভিবর্তনে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে পর্ষদের বৈষম্যমূলক নির্দেশনামা প্রত্যাহারের জোরালো দাবি উত্থাপন করেন। ফলস্বরূপ ওই অগণতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক নির্দেশনামা প্রত্যাহৃত হয়।[*৩৭]

১৯৮৬-র ২৮ ফেব্রুয়ারি আবার জারি করা হল কুখ্যাত সেবা সার্কুলার। আবার প্রতিবাদে উত্তাল হল বরাক উপত্যকা। ভাষা সংগ্রামের শহীদ হলেন আরও দুজন এবার করিমগঞ্জ শহরে। সারা উপত্যকাব্যাপী এই ঘটনার ফলে আবার বিস্ফোরক পরিস্থিতি দেখা দিল। উত্তাল গণ বিক্ষোভের সামনে এবারও প্রত্যাহৃত হল পর্ষদের কুখ্যাত সার্কুলার।

বস্তুত দক্ষিণ আসামস্থিত বরাক উপত্যকার প্রাচীনকাল থেকে বৃহত্তর বঙ্গের অংশ হিসেবে বঙ্গীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনবৃত্তের সঙ্গে জড়িত বলে গোড়া থেকেই অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আসাম প্রদেশ গঠনের কাল থেকেই এক অঘোষিত দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে স্থিত হয়েছিল স্বাধীনতার পরে আসাম রাজ্য গঠনের সময়ে এই সম্পর্ক ক্রমে আরও তিক্ত ও বিদ্বিষ্ট হয়েছে নানা কারণে। চার দশক অতিক্রান্ত হবার কালে এই দ্বন্দ্ব বাস্তবিক পক্ষে সংঘাতে পরিণত হয়েছে। আশার কথা- মুখোমুখি এই সংঘাতে প্রতিবারই উগ্র জাত্যভিমানী, ভাষাজাতীয়তাবাদী বিরুদ্ধশক্তির পরাজয় ঘটেছে বরাক উপত্যকার গণতান্ত্রিক স্বাধিকারসচেতন গণআন্দোলনের হাতে।

আসাম রাজ্যের সরকারনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপর্ষদ ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উল্লিখিত জবরদস্তিমূলক নির্দেশনামা একের পর এক চাপিয়ে দেওয়ার পেছনে যে-প্রভুত্বমূলক স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষ্য করা গেছে তার ফলে আসাম আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে (আশির দশকে) গুয়াহাটি ও ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার বরাক উপত্যকার উচ্চ শিক্ষা লাভযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ভাবলে অবাক লাগে কেবল উচ্চ শিক্ষা লাভের প্রেরণা ও সংকল্পে যেসব উজ্জ্বল ছাত্র-ছাত্রীরা অসীম সাহসে ভর করে ওই সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে গিয়েছিলেন তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিল চরম শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন, চূড়ান্ত অপমান ও অন্যায় বঞ্চনা। এই প্রেক্ষাপটে আশির দশকে (৭৮-৭৯) এই উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি সর্বপ্রথমে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ও পরে বরাক উপত্যকা শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি সহ অন্যান্য বহু জন প্রতিনিধিত্বমূলক অরাজনৈতিক সংগঠন ক্রমাগত তুলতে থাকেন এবং ক্রমে তা উপত্যকার অতি জনপ্রিয় গণদাবিতে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে পর আসাম সরকার এই ব্যাপারে সামান্য পিছু হটে রাজ্যস্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব রাখেন। বরাক উপত্যকার জনগণের সায় না থাকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিল (১৯৮৯-৯০) পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। একই সঙ্গে তেজপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার গৃহীত বিলটি এ যাবৎ কার্যকরী হতে দেননি।

ইতিমধ্যে বরাক-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। স্বাধীনতালাভের পর থেকে যথাযথ স্বীকৃতি ও অধিকার লাভে বঞ্চিত এই উপত্যকা বৈষম্যমূলক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আজও আসামের সঙ্গে এক প্রশ্নচিহ্নের মত ঝুলে রয়েছে।

কাছাড় তথা বরাক উপত্যকার স্বাধীনতা পরবর্তী শিক্ষাবিস্তার : স্বাধীনতার আগে শিলচর শহরে ছেলেদের ৪টি ও মেয়েদের ২টি হাইস্কুল ছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বরাক উপত্যকার একমাত্র কলেজ ছিল গুরুচরণ কলেজ।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে পার্শ্ববর্তী সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলা থেকে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ার ফলে সর্ব পর্যায়ে স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে গত চার দশকে শহর ও গ্রামাঞ্চল মিলিয়ে বহু সংখ্যক মধ্য ইংরেজি, মধ্যবঙ্গ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যাপক স্তরের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করেছে।

পঞ্চাশের দশকে শিলচরে মেয়েদের কলেজ খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অবৈতনিক অন্য পেশায় নিযুক্ত যোগ্য অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের পরিচালনায় কিছুদিন চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ৺ধীরেন্দ্র মোহন দেবের বিশেষ উদ্যোগে শিলচরে মহিলা কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালে। প্রথমে নর্মাল স্কুলে প্রাতঃকালীন ক্লাস ও পরে শিলচরের ব্রাহ্মা মন্দিরের স্থান উক্ত কলেজের জন্য দান করা হলে কলেজ নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। কাছাড় জেলায় এটাই মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে বরাক উপত্যকায় শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। শিলচরে রাধামাধব কলেজ (১৯৭১) ও কাছাড় কলেজ (১৯৬০) শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাহিদা অনুসারে স্থাপিত হয়েছে। শিলচরে অরুণ চন্দ কলেজ ও বি টি কলেজ উপত্যকার শিক্ষিত যুবকশ্রেণীর জীবিকা সংস্থানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে

প্রতিষ্ঠিত হয়। কাছাড় জেলায় আরও দুটি নতুন কলেজ সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা প্রসারার্থে জনসাধারণের উদ্যোগে খোলা হয়েছে প্রথমটি কালাইন কলেজ ও দ্বিতীয়টি বড়যাত্রাপুর কলেজ। এছাড়াও কাছাড় জেলার পয়লাপুল, সোনাই ও কাবুগঞ্জে (১৯৬৪) ও হাইলাকান্দির লালাতে একটি রুরাল কলেজ গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী। ইতিপূর্বে হাইলাকান্দিতে শ্রীকিষণ শারদা কলেজ (৫১) করিমগঞ্জে করিমগঞ্জ কলেজ (৪৬) ও রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজ স্থাপিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণ নগর ও বদরপুরে কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৩-র ১ জুলাই করিমগঞ্জ পৃথক জেলার মর্যাদা লাভ করে এবং হাইলাকান্দি ১৯৮৯-র ১ অক্টোবর জেলা পর্যায়ে উন্নীত হয়।

এতো গেল সাধারণ শিক্ষাগত চিত্র। ক্রমে এই অঞ্চলে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের ও উন্নত চিকিৎসা দানের সুযোগ সৃষ্টিতে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ (১৯৬৮) স্থাপিত হয়েছে। উন্নত কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার্থে রিজিওন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৭৮ সালে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মেহেরপুরে পলিটেকনিক, শ্রীকোণায় আই টি আই, মাছিমপুর অ্যাগ্রিকালচার ট্রেনিং সেন্টার, গ্রাম সেবক ট্রেনিং স্কুল ঘুংঘুরে পশুপালন ও পশুচিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ প্রতিষ্ঠান প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বৃত্তিমূলক অন্য ধরনের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করলেও এই উপত্যকা এখনও শিল্প প্রসারে অনগ্রসর থাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এই কারণে বরাক উপত্যকায় শিক্ষিত বেকার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি, গণ সাক্ষর অভিযান সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চালু থাকলেও আশানুরূপ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে গণ বিজ্ঞান সংস্থা নির্দিষ্ট কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রাইমার রচনার কাজে ইতিমধ্যে এই সংস্থা কিছুদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলার বর্তমান স্কুল সংখ্যা (১৯৯০-৯১) ও সর্বশেষ (১৯৯২-৯৩)-এর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ—

SI. No.	Category of Institution	No. of Schools & Institution	No. of Pupiles
1.	Primary	1475	143319 Govt.
2.	M.V./M.E. Schools	302	39385 Govt.
3.	High Schools	124	37071 Govt.
4.	Higher Secondary Schools	20	16711 Govt
5.	Technical Institute Polytechnic Institute	1	187 Govt

SR. Madrassa in C. D. C. (1990-91)

	Deficit Sr. Madrassa	Adhoc Sr. Madrassa
	12	13
1992-93	4	1
	4	1

(উপরোক্ত তথ্যাদি C.D.C. ইন্সপেক্টর অব স্কুল অফিস হইতে প্রাপ্ত)

Literacy rates 1961/1971 and 1991 in Assam (In percentage)

Years	Persons	Males	Females
1961	32.58	44.28	18.62
1971	33.32	42.96	22.31
1991	53.42	62.34	43.70

Note: Literacy for 1961 and 1971 relate to Population aged 5 and above. The rates for the year 1991 relate to Population aged 7 and above. (Source: A Hand Book of Adult Education) by A. K. Tapadar.

১৯৯২-৯৩ সালে কাছাড়ে বর্ধিত স্কুল সংখ্যা

Category of Schools	Nos	No. of Students Boys/Girls	No. of Teachers Male/Femaly
Govt. High/HS. Schools	2	864/1302	51/55
Provincialised H.S Schools	24	12601/7849	629/130
Prov. High Schools	73	11,656/10,489	647/321
Adhoc/Recognised	59	7717/8237	730/198

হাইলাকান্দি জেলার বর্ধিত স্কুল সংখ্যা

Govt. HS	1		
Provincialised H.S.	6	6153/1687	228/41
High. School	36	5341/6705	312/124

(উপরোক্ত তথ্যাদি ইন্সপেক্টর অব স্কুল, সি ডি সি অফিস হইতে প্রাপ্ত)

হাইলাকান্দি থেকে ক্লাব প্রভাতীর মুখপত্র 'আওয়াজ'-এর বিশেষ ঈদ সংখ্যাতে প্রকাশিত 'Hailakandi At A Glance'-এ পাওয়া তথ্য (১-৬-৯২ পর্যন্ত)

প্রাইমারি ও প্রি-প্রাইমারি স্কুল	—	৯০৭
মধ্য বঙ্গ ও মধ্য ইংরেজি স্কুল	—	২৪৭
উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	—	৪৩
কলেজ	—	২

উপরোক্ত পরিসংখ্যান আমাদের সামনে বরাক উপত্যকার শিক্ষা প্রসারের যে চিত্র তুলে ধরে তা নিরাশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষার আলো এখনও সীমাবদ্ধ হলেও গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু জীবিকা সংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি না হওয়ার ফলে বেকার সমস্যা সামাজিক ক্ষেত্রে নানা ধরণের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। উপত্যকার আর্থ-রাজনৈতিক পরিকাঠামো বিকাশের অনুকূল নয়। শিক্ষার প্রসার শিক্ষার মানোন্নয়নে সফল হয়নি। গুণগতভাবে শিক্ষার মান নিম্নগামী এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বিগত শতাব্দীর শিক্ষাগত দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একশো বছরের উপত্যকার জনজীবনের পথ-পরিক্রমায় আমরা সর্বক্ষেত্রে নিদারুণ বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম দুর্গতি ও অসহনীয় জীবন-যন্ত্রণার সাক্ষীরূপে চলমান ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছি।

বঙ্গীয় ১৪ শতাব্দী শেষ হয়ে আমাদের উত্তরণ ঘটবে ১৫ শতাব্দীতে এক বছর পরে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল চরিত্র-কাঠামো জন-জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এসেছে। এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারে সামাজিক ন্যায় ও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক স্তরে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যাপক গণজাগরণ ও আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিক্ষাই হবে এক মৌলিক অস্ত্র। আগন্তুক শতাব্দী বরাক উপত্যকার জনজীবনে ব্যাপক নব-জাগরণের বার্তাবহ হয়ে আসুক এই আশা শতাব্দীর অন্তিম প্রহরে প্রতিটি বরাক উপত্যকাবাসীর মনে জেগে উঠেছে। এই আশা বাস্তবায়িত হোক। তার জন্য সংকল্প গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

সূত্র

১। Transition: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 104
২। Transition: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 105
৩। Transition: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 106
৪। Consolidation: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 145
৫। Consolidation: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 145
৬। শিক্ষা বিস্তার: রণেন্দ্রনাথ দেব: শ্রীহট্ট পরিচয় পৃঃ ২১১-২১২
৭। মনোজিৎ দাস প্রদত্ত তথ্য
৮। শিক্ষাবিস্তার: রণেন্দ্র নাথ দেব: শ্রীহট্ট পরিচয় পৃঃ ২১৩-১৪
৯। শিক্ষাবিস্তার: রণেন্দ্র নাথ দেব: শ্রীহট্ট পরিচয় পৃঃ ২১৩-১৪
১০। স্মারকগ্রন্থ : আসাম মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থা ৩৮তম অধিবেশন ১৯৯২: মহান শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী শ্যামাচরণ দেব: অনিল কুমার চক্রবর্তী
১১। Impact of British Rule: J. B. Cacher Under British Rule P. 3
১২। History of the Silchar Govt. Higher Secondary School: Debabrata Dutta P. 3
১৩। Impact of British Rule: J. B. Cachar Under British Rule P. 231
১৪। Impact of British Rule: J. B. Cachar Under British Rule P. 231
১৫। Impact of British Rule: J. B. Cachar Under British Rule P. 231
১৬। History of the Silchar Govt H. S. School: Debabrata Dutta P. 10
১৭। History of the Silchar Govt H. S. School: Debabrata Dutta P. 11
১৮। History of the Silchar Govt H. S. School: Debabrata Dutta P. 15 P. 15
১৯। Impact of British Rule: J. B. Bhattacherjee (Cachar Under British Rule) P. 234
২০। Impact of British Rule: J. B. Bhattacherjee (Cachar Under British Rule) P. 234
২১। History of the Silchar Govt. Higher Secondary School: Debabrata Dutta P. 53
২২। Impact of British Rule: J. B. Bhattacherjee (Cachar Under British Rule) P. 236
২৩। Impact of British Rule: J. B. Bhattacherjee (Cachar Under British Rule) P. 237
২৪। Impact of British Rule: J. B. Bhattacherjee (Cachar Under British Rule) P. 236/37
২৫। Impact of British Rule: J. B. Bhattacherjee (Cachar Under British Rule) P. 237
২৬। মাদ্রাসা শিক্ষা: মোঃ এ কে মতিন আহমেদ বড়লস্কর (সাংবাদিক): ঐ সম্পর্কিত চিঠি
২৭। মাদ্রাসা শিক্ষা: মোঃ এ কে মতিন আহমেদ বড়লস্কর (সাংবাদিক): ঐ সম্পর্কিত চিঠি
২৮। মাদ্রাসা শিক্ষাঃ মোঃ এ কে মতিন আহমেদ বড়লস্কর (সাংবাদিক): ঐ সম্পর্কিত চিঠি
২৯। মাদ্রাসা শিক্ষাঃ মোঃ এ কে মতিন আহমেদ বড়লস্কর (সাংবাদিক): ঐ সম্পর্কিত চিঠি

৩০। History of the Silchar Govt H. S. School: Debabrata Dutta P. 54
৩১। History of the Silchar Govt H. S. School: Debabrata Dutta P. 57
৩২। Epilogue: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 290
৩৩। Epilogue: J. B. Bhattacherjee: Cachar Under British Rule P. 291
৩৪। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস: সনৎ কুমার কৈরী পৃঃ ২-৩
৩৫। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস: সনৎ কুমার কৈরী পৃঃ ১০
৩৬। ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস: সনৎ কুমার কৈরী পৃঃ ২১
৩৭। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষাসংকট বরাক উপত্যকা শিক্ষা-সংরক্ষণ সমিতির আবেদনঃ প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী সাধারণ সম্পাদক
৩৮। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষাসংকট বরাক উপত্যকা শিক্ষা-সংরক্ষণ সমিতির আবেদন। প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী সাধারণ সম্পাদক
৩৯। ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্ অফিস সি ডি সি হইতে প্রাপ্ত
৪০। A Hand Book of Adult Education: A. K. Tapedar
৪১। ক্লাব প্রভাতীর মুখপত্র 'আওয়াজ' — Hailakandi At a Glance.

বাংলা সাহিত্য-চর্চার একশ বছর

জন্মজিৎ রায়

প্রবেশিকা

বর্তমান দক্ষিণ আসামের তিনটি জেলাকে 'বরাক উপত্যকা' বলে চিহ্নিত করা হয়। এটি বর্তমানে ব্যবহারসিদ্ধ লোকপ্রয়োগ। কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি হচ্ছে উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত তিনটি জেলা। ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে একসঙ্গে 'সুরমা উপত্যকা' বলা হত। ১৮৭৪ সালে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা আর্থ-রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ-শাসিত আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের গণভোটের রায়ে শ্রীহট্ট জেলার গরিষ্ঠাংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার কিয়দংশ ব্যতীত কাছাড় জেলার অঙ্গীভূত হয়ে ভারত-ভুক্ত হয়। বর্তমান বরাক উপত্যকায় পূর্বতন কাছাড় জেলার সঙ্গে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত করিমগঞ্জ মহকুমার খণ্ডিতাংশ স্বতন্ত্র জেলারূপে সংযুক্ত হয়ে দ্বিবেণীসঙ্গম রচনা করেছে। দেশবিভাগের পূর্ববর্তী কালের ক্ষেত্রে অবিভক্ত শ্রীহট্টের পৌনঃপুনিক উল্লেখ অপরিহার্য। আবার অন্যদিকে বিভাগোত্তর কালের আলোচনায় শ্রীহট্টকে সঙ্গত কারণেই বাদ দেওয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এবং ঐতিহাসিক কালক্রম অনুসরণের জন্য বক্ষ্যমাণ আলোচনার নির্দিষ্ট কালপর্ব বঙ্গীয় চতুর্দশ শতককে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালকে একটি ঐতিহাসিক বিভাজনরেখা বলে গ্রহণ করলে উক্ত কালপর্বদ্বয় হবে এ-রকম: (ক) প্রথম পর্ব (১৩০১-১৩৫৪ বঙ্গাব্দ/১৮৯৪-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং (খ) দ্বিতীয় পর্ব (১৩৫৪-১৪০০ বঙ্গাব্দ/১৯৪৭-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)।

উক্ত দ্বি-পর্বিক মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আরও কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখিত হলে ঐতিহাসিক কালক্রমের অনুসরণ সহজতর হবে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমেই আমাদের দেশে আধুনিক যুগের আবির্ভাব ঘোষিত হয়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতকের জন্মলগ্ন থেকে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যকারদের হাতে বাংলা গদ্যসাহিত্যের শিলান্যাসের পর স্থাপত্যকর্মে অগ্রসর হন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। রামমোহনের সমসাময়িক সুরমা উপত্যকার দুজন গদ্যকারের নাম এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ দুজন গদ্যকার হচ্ছেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯) এবং কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি। শ্রীহট্ট জেলার ইটা পরগণার পঞ্চগ্রামের গৌরীশঙ্কর উচ্চশিক্ষার জন্য পনেরো বছর বয়সে নবদ্বীপে চলে যান। পরবর্তীকালে তাঁর কর্মক্ষেত্র হয় কলকাতা। 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সম্বাদ রসরাজ' ও 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামক তিনটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। তাছাড়া কয়েকখানা বাংলা গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সেকালের অবিভক্ত করিমগঞ্জের জলঢুপ গ্রামের সন্তান। ১৮২৭ সালে তিনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড অবলম্বনে 'পুরাণবোধোদ্দীপনী' রচনা করেন। উল্লিখিত গদ্যকারদ্বয় কর্মজীবনে জন্মস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেননি।

প্রবাসী সাহিত্যিকদের কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের সূচনালগ্নের পূর্ববর্তী দুটি দশক অপ্রবাসী সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মের আলোকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কালপর্বে আধুনিক গীতিকবিতার নূপুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় যাঁর রচনায়, তাঁর নাম প্যারীচরণ দাস (১৮৪৬-১৮৮৭)। বর্তমান করিমগঞ্জ শহরের অদূরবর্তী লাতু গ্রামটি ছিল সেকালে পূর্ব শ্রীহট্টের রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র। লাতুতে স্থাপিত মুন্সেফি আদালতের উকিল ফার্সিভাষাবিদ পণ্ডিত মুন্সি গৌরীচরণ দাস অষ্টপতির ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীচরণ ১৮৬৭ সালে শ্রীহট্ট মিশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা যাত্রা করেন। ১৮৭৫ সালে নাটকীয়ভাবে একটি মামলায় জড়িত হওয়ার পর তাঁর প্রবাস জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ১৮৭৫ সালে তিনি শ্রীহট্ট শহর থেকে 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি অবিভক্ত সুরমা উপত্যকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। প্যারীচরণ ছিলেন একাধারে সম্পাদক, গীতিকবি, নাট্যকার ও

গদ্যকর্মী। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থতালিকার মধ্যে রয়েছে 'মিত্রবিলাপ' (১৮৭০), 'পদ্যপুস্তক' (প্রথম ভাগ, ১৮৭৬; তৃতীয় ভাগ, ১৮৭৭), 'ভারতেশ্বরী কাব্য' (১৮৭৭) ও 'রণরঙ্গিণী'। তাঁর অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দ্বন্দ্বযুদ্ধ' নাটক এবং 'ভিক্টোরিয়ার জীবনচরিত' নামক গদ্যকর্ম।

শ্রীহট্টের বেজোড়া গ্রামের রামকুমার নন্দী মজুমদার (১৮৩১-১৯০২) কর্মজীবনে ছিলেন শিলচর শহরের উপাযুক্তের কার্যালয়ের কর্মচারী। প্রধানত যাত্রাপালার রচয়িতা ও মাতৃ-সঙ্গীতকার হলেও তিনিই প্রথম এ অঞ্চলে আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) প্রকাশিত হওয়ার পর বীরাঙ্গনাদের পত্রকবিতার প্রত্যুত্তরে তিনি রচনা করেন 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য (১৮৭২)। বিখ্যাত 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকার ১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় উক্ত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর 'উষোদ্বাহ কাব্য' (১৮৮৫)। উভয়ত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ নৈপুণ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'উষোদ্বাহ কাব্যে'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত হয়।

এ অঞ্চলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পথিকৃৎ বিপিনবিহারী দাস করিমগঞ্জের নিকটবর্তী মর্জাতকান্দি গ্রামের সন্তান। গুয়াহাটির নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা কালে তাঁর রচিত 'রসায়নের উপক্রমণিকা' (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পরিশিষ্টভাগে সন্নিবিষ্ট রসায়ন বিষয়ক বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা এর অতিরিক্ত আকর্ষণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। শ্রীহট্ট শহরে প্রতিষ্ঠাকামী ব্যবহারজীবী বিপিনবিহারীর সঙ্গে বিদূষী মারাঠী ব্রাহ্মণকন্যা পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতীর অসবর্ণ বিবাহ সেকালে সমাজ-জীবনে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করে। ১৮৮২ সালে শিলচর শহরে বিপিনবিহারী লোকান্তরিত হন।

সেকালের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে শম্ভুনাথ দেশমুখ্য, রাজীবলোচন দাস, শ্রীশচন্দ্র দাস ও কাজী মুহম্মদ আহমদের নাম উল্লেখ করতে হয়। শম্ভুনাথ দেশমুখ্যের জন্ম ১৮৩০ সালে কাছাড়ের দুর্গানগরে। তিনি 'আত্মবারমাসী' (১২৬, বঙ্গাব্দ) নামক পদ্যপুস্তক ছাড়াও 'নক্সা ও নোট' নামে নৌকাযোগে কাশীভ্রমণের কাহিনী রচনা করেন। মৈনা গ্রামের রাজীবলোচন দাস ছিলেন জকিগঞ্জ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পদ্যপ্রসূন' ১২৮৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে। 'শ্রীহট্ট দর্পণ' মাসিকপত্রে সংস্কৃত 'দৃষ্টান্তশতক' বাংলায় অনুবাদ করে তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। কবি প্যারীচরণ দাসের চতুর্থ সহোদর শ্রীশচন্দ্র দাস 'তত্ত্ববিলাস' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত ঢেউপাশা গ্রামের অধিবাসী কাজী মুহম্মদ আহমদ 'আইনা-এহিন্দ' অবলম্বনে শ্রীহট্টের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ 'শ্রীহট্ট-দর্পণ' ১৮৮৫ সালে প্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতক আরম্ভের কিছুকাল আগে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিপিনচন্দ্র পাল রচনা করেন তাঁর দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'শোভনা' (১৮৮৪)। এর প্রায় এক দশক পর কবি রামকুমার নন্দী রচনা করেন 'মালিনীর উপাখ্যান'। এমনি করেই চতুর্দশ শতকের পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দৃশ্যপট ক্রমশ বিস্তারিত হয় সেকালের শ্রীহট্ট-কাছাড়ে।

প্রথম পর্ব

(১৩০১-১৩৫৪ বঙ্গাব্দ/১৮৯৪-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের সূচনালগ্নে যে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েই আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার নাম 'দেবীযুদ্ধ'। ব্রিটিশ সরকার 'দেবীযুদ্ধ' কাব্যে বিপ্লবাত্মক তত্ত্বের প্রচার প্রচ্ছন্ন রয়েছে মনে করে উক্ত কাব্যগ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করেন। 'দেবীযুদ্ধ' কাব্যের রচয়িতা সাধক-কবি শরৎ চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫২-১৯২৬) শ্রীহট্ট জেলার বেগমপুর গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শরৎ চন্দ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ী শুক্লা ত্রয়োদশীতে - কাব্য রচনা শুরু করে

১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাসে রচনা সম্পূর্ণ করেন। 'দেবীযুদ্ধ' কাব্যের মূল প্রেরণার বাহ্যত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হলেও এরমধ্যে ইংরেজ অসুরদের দ্বারা বন্দী ভারতীয় দেবকুলের মুক্তি সংগ্রামের বাসনা রূপকাবরণ ভেদ করে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের তিনটি ক্ষুদ্রকায় কবিতাপুস্তক 'আর্যসঙ্গীত', 'চিতোরের বীরগান' ও 'সুরেন্দ্র কারাবাস' ১২৮৮ থেকে ১২৯০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রাবন্ধিকরূপেও ছিলেন খ্যাতিমান। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'পল্লীব্যবস্থা ১৯১১ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত মাসিকপত্র 'শিক্ষা পরিচয়' ১২৯৬ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে চতুর্দশ শতকের সূচনায় ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়।

চতুর্দশ শতকের সূচনাপর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে মহিলা সাহিত্যিকার আবির্ভাব। প্রথমেই সেকালের শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রথম লেখিকারূপে কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানীর নামোল্লেখ করতে হয়। কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী (১৮৫১-১৯২৩) শ্রীহট্টের জলঢুপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সালে তাঁর গদ্যে-পদ্যে রচিত পনেরোটি রচনার সংকলন 'নারীমঙ্গল' প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার মহারাজার পরলোকগমনে তিনি ১৩১৫ সালে 'শোকস্মৃতি' নামে একটি কাব্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৩৩৭ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর গদ্যে-পদ্যে রচিত 'সংহার পরিহার'। সেকালের শ্রীহট্ট শহরের প্রথম মুসলমান মহিলা কবিরূপে সহিফা বানু বা হাজিবিবির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'সহিফা সঙ্গীত'। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ লোককবি হাসন রেজা ছিলেন সহিফা বানুর বৈমাত্রেয় ভাই। সৈয়দ মুজতবা আলীর সহোদরা সৈয়দা হাবিবুন্নেছা বেগমের কাব্যগ্রন্থ 'জীবনের সাথী' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে।

কবি ও সাংবাদিক চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মুকুল' আত্মপ্রকাশ করে ১৩২১ সালে। তাঁর অপর গ্রন্থ শঙ্করাচার্যের সংস্কৃত রচনা 'মোহমুদ্গর'-এর পদ্যানুবাদ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা ভাষার অভিধান' গ্রন্থের রচনাকার্যে চন্দ্রকুমার জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। 'সুরমা' সাপ্তাহিকপত্রের সম্পাদনাকার্যে সম্পাদক ভুবনমোহন বিদ্যার্ণবের সহকারী ছিলেন চন্দ্রকুমার। ১৯২০ সালে তিনি ভুবনমোহনের স্থলাভিষিক্ত হন।

রমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী ছিলেন একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক। 'ঋগ্বেদ সংহিতা' তিনি পদ্যে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। বৈদিক সাহিত্য নিয়ে সেকালের শ্রীহট্ট-কাছাড়ে বাংলা ভাষায় যাঁরা আলোচনার সূত্রপাত করেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

চতুর্দশ শতকের তৃতীয় দশকের সূচনায় শ্রীহট্ট-কাছাড়ের উন্নতমানের সাহিত্যপত্রিকারূপে 'শ্রীভূমি'র আত্মপ্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'শ্রীভূমি' মাসিক পত্র ১৩২২ সালে সতীশচন্দ্র দেবের সম্পাদনায় করিমগঞ্জ শহর থেকে প্রকাশিত হয়। পঞ্চখণ্ডের লাউতা গ্রামের সন্তান সতীশচন্দ্র দেব (১৮৬৪-১৯৪১) ছিলেন কর্মসূত্রে আইনজীবী। কিন্তু সম্পাদক ও প্রাবন্ধিকরূপেই তাঁর পরিচয় ছিল সুবিদিত। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'নীতি সন্দর্ভ'। শ্রীহট্টের বিথঙ্গলের সাধকপুরুষ রামকৃষ্ণ গোঁসাইয়ের জীবনকথা অবলম্বনে রচিত তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'রামকৃষ্ণ' ১৩২২ সালে প্রকাশিত হয়।

জীবনীগ্রন্থের রচয়িতারূপে মহেন্দ্রনাথ দে (১৮৭০-১৯১২) একটি স্মরণীয় নাম। মৌলবী বাজার মহকুমার জগৎসী গ্রামের সন্তান মহেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঠাকুর দয়ানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর জগৎসীর দোলগোবিন্দ আশ্রমে ইংরেজ সরকারের গুলিবর্ষণে আহত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঋষি যুগানন্দ নাম গ্রহণ করে তিনি দয়ানন্দের জীবনী রচনা করে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ শিলচরের নিকটবর্তী অরুণাচল আশ্রম থেকে ১৩২০ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'মৈত্রী' ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। পরের বছর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রজাশক্তি'।

সেকালের শিক্ষাজগতের মনস্বী ব্যক্তিত্ব সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮৮-১৯৬০) ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও জীবনীকার। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথম জীবনে কলকাতার সিটি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। পরে গুয়াহাটির কটন কলেজ ও শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যক্ষ রূপে কাজ করেন। আসামের শিক্ষাবিভাগের প্রথম ভারতীয় অধিকর্তার পদে কাজ করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সংসার ত্যাগ করার পর তাঁর নাম হয় হরিদাস নামানন্দ। সাহিত্য-

চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ সতীশচন্দ্রের দীর্ঘ গ্রন্থতালিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'উপনিষদের মর্মবাণী', 'নবযুগের শিক্ষা ও সাধনা', 'অঞ্জলি', 'জীবনবীণার বিচিত্র সুর' ও 'উৎসবের প্রণতি'। এছাড়া 'স্মৃতি পূজা গ্রন্থমালা' নামে তিনি তিন খণ্ডে একটি নতুন ধরনের জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। সতীশচন্দ্র রায় ও যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীহট্টের বিশ্রুত প্রতিভা ও প্রথম বাঙালি জাপানযাত্রী রমাকান্ত রায় বিষয়ক স্মৃতিগ্রন্থ 'স্বদেশপ্রেমিক রমাকান্ত রায়।' রমাকান্ত রায় (১৮৭৩-১৯০৬) রচিত ভ্রমণকাহিনী বিকাশোন্মুখ সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন। কলকাতার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ভ্রমণকথা 'জাপানযাত্রীর পত্র' এবং 'জাপানপ্রবাসীর পত্র'। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর ভ্রমণকথা 'জাপানপ্রবাসীর পত্র'। তাঁর অকালমৃত্যু একটি সম্ভাবনাকে বৃন্তচ্যুত করে।

ভ্রমণকাহিনী প্রসঙ্গে এরপরই শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ গ্রামের রামনাথ বিশ্বাসের নাম উল্লেখ করতে হয়। রামনাথ বিশ্বাস (১৮৯৪-১৯৫৬) সাইকেলে চড়ে বিশ্বপর্যটন করেন। ১৯৪৪ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। রামনাথ বিশ্বাস ভ্রমণ বিষয়ে আঠাশখানা পুস্তকের রচয়িতা। এছাড়া তিনি দুখানা গল্পগ্রন্থ ও চারখানা উপন্যাসও রচনা করেন।

সুরমা-বরাকতীরের মানুষ হয়েও এই সময়কার একাধিক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং প্রবাসজীবন যাপন করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় হচ্ছেন সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬-১৯৪৫), সুন্দরীমোহন দাশ (১৮৫৭-১৯৫০), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), তারাকিশোর চৌধুরী (১৮৫৯-১৯৩৫), পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৮-১৯৩৮) এবং গুরুসদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১)। হবিগঞ্জ মহকুমার সাংঘর গ্রামের সীতানাথ দত্ত ১৮৭১ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় পদার্পণ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও তারাকিশোর চৌধুরীর মত তিনিও যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁকে 'তত্ত্বভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি কলকাতার কেশব সেন একাডেমির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সিটি কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপেও তিনি কাজ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হচ্ছে 'উপনিষদ' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩৭), 'দশোপনিষদ ও শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ'। মহেশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে একযোগে তিনি প্রকাশ করেন 'ছান্দোগ্যোপনিষদ (১৯২৬) এবং 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' (১৯২৮)। ১৯৪২ সালে তিনি 'আত্মচরিত' রচনা সম্পন্ন করেন।

শ্রীহট্টের দীঘলি গ্রামের সন্তান সুন্দরীমোহন দাশ পেশায় চিকিৎসক হলেও কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ও গ্রন্থকাররূপেও সুবিদিত। তাঁর স্বরচিত পালা 'নৌকাবিলাস' তিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঠাকুরবাড়িতে পরিবেশন করেন। শ্রীহট্টের কথ্যভাষায় রচিত তাঁর 'সিলেটি রামায়ণ' সেকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সুন্দরীমোহনের রচিত গ্রন্থতালিকায় রয়েছে 'স্বাস্থ্যবিজ্ঞান', 'কুমারতন্ত্র', শুশ্রূষাবিদ্যা' ও 'বৃদ্ধাধাত্রীর রোজনামচা'।

শ্রীহট্টের পৈল গ্রামের সন্তান বিপিনচন্দ্র পাল সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বজনপরিচিত বিশিষ্ট বাগ্মী ও সাংবাদিক। সাহিত্যচর্চায় তিনি ছিলেন সমান উৎসাহী। ১৮৮০ সালে শ্রীহট্ট শহর থেকে তিনি 'পরিদর্শক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'ভক্তিসাধন' (১৮৯৪), 'জেলের খাতা' (১৯১০), 'চরিতকথা' (১৩২৩), 'সত্য ও মিথ্যা' (১৩২৩), 'প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ' (১৩৪১), 'নবযুগের বাংলা' (১৩৬২), 'মার্কিনে চারিমাস' (১৩৬২), 'সাহিত্য ও সাধনা', 'সত্তর বৎসর' ও 'রাষ্ট্রনীতি' (১৩৬৩)। বিপিনচন্দ্রের 'শোভনা' (১৮৮৪) সেকালের শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। ১৯০৩ সালে 'শোভনা' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হবিগঞ্জের বামে গ্রামের সন্তান তারাকিশোর চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সিদ্ধতপা সাধক রামদাস কাঠিয়াবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ১৯১৫ সালে তিনি সস্ত্রীক বৃন্দাবনবাসী হন। তাঁর সন্ন্যাসোত্তর নাম হয় সন্তদাস কাঠিয়াবাবা। তাঁর রচিত গ্রন্থতালিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'রামদাস কাঠিয়াবাবার জীবনচরিত', 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মক্ষবিদ্যা' এবং 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা'।

সেকালের সুরমা-বরাক অঞ্চলের পণ্ডিত সমাজের অগ্রগণ্য পুরুষ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ১৮৮৬ সালে আসামের ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে সংস্কৃত, দর্শনশাস্ত্র ও ইংরাজিতে অনার্স লাভ করেন। ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ

কলেজে এবং উত্তরজীবনে গুয়াহাটির কটন কলেজে অধ্যাপনা করে ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চা ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'প্রবন্ধাষ্টক' (১৩১৭), 'হিন্দু বিবাহসংস্কার' (১৩২১), 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাস' (১৩২১), 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ' (১৩২১), 'রামকুমার চরিত' (১৩২৬), 'আলোচনা চতুষ্টয়' (১৩৩১), 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' (১৩৩১), 'স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ' (১৩৩৫) এবং 'কামরূপ শাসনাবলী' (১৩৩৮)। এছাড়া তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গোবিন্দচন্দ্র রচিত 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি' (১৩১৭)। সিলেটি নাগরী লিপি বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন ১৩১৫ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় একটি সচিত্র তথ্যভূয়িষ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

সেকালের অবিভক্ত করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জকিগঞ্জের বীরশ্রী গ্রামের সন্তান গুরুসদয় দত্ত ১৯০৫ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রায়বেঁশে লোকনৃত্যের প্রচলনে এবং লোকসঙ্গীত ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংরক্ষণে ব্রতচারী আন্দোলনের জনক গুরুসদয় দত্ত ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য ছড়ার বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভজার বাঁশী', 'চাঁদের বুড়ি' ও 'পাগলামির পুথি'। 'পটুয়াসঙ্গীত' (১৯৩৯) এবং 'শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' (১৯৬৬ সালে মরণোত্তরকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত) তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সেকালের সুরমা-বরাক তীরের শিক্ষক সমাজ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় ছিলেন সমান উৎসাহী। করিমগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভারতচন্দ্র চৌধুরী উপনিষদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'বিদ্যাবারিধি' উপাধি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থটিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যপ্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত। সূর্যকুমার তর্কসরস্বতীর 'জাতিপুরাতত্ত্ব' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে। তাঁর অপর গ্রন্থ 'সম্বন্ধচিন্তামণি'-তে বিবাহবিষয়ক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদ আলোচিত হয়েছে। মাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব রচিত 'বৈদিক সমস্যা' গ্রন্থটি ১৩২০ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্টে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমনকাল এতে আলোচিত। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। মহেন্দ্রনাথ সাংখ্যতীর্থের 'বিশ্বরূপের উপাসনা' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে এই সময়কার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে অবিনাশ চক্রবর্তীর 'পূজা ও সমাজ' (১৯১৪) এবং বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের 'হিন্দু সমাজে নারীর স্থান', 'শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা' ও 'প্রাচীন ভারতে নারী' (১৯২৯)। আরও দুজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময় বাংলা সাহিত্য-চর্চায় স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা হলেন ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব ও চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ। শিলচর থেকে ১৯১১ সালে সাপ্তাহিক 'সুরমা' প্রকাশিত হলে চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভুবনমোহন প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের রম্যরচনা 'বৃদ্ধের বচন' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী গদ্যভাষায় বর্ণনা করে রচিত তাঁর 'শ্রীধর্মমঙ্গল' গ্রন্থটি ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। 'কৈলাসহর ভ্রমণ' তাঁর রচিত একটি চিত্তাকর্ষক ভ্রমণকাহিনী। ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব 'শ্রীহট্টবাসি শর্মণঃ' ছদ্মনামে 'রাধানাথ চরিত' গ্রন্থটি ১৩২৬ সালে প্রকাশ করেন। মৌলবীবাজারে ১৩২৩ সালে অনুষ্ঠিত 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মিলনী'-র তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভুবনমোহন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণটি 'শ্রীভূমি' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে 'জনশক্তি' পত্রিকা প্রকাশিত হলে ভুবনমোহন সম্পাদনার কার্যভার গ্রহণ করেন। চন্দ্রোদয় এবং ভুবনমোহনের সাহিত্যরুচি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এই সময়কার সমালোচনা সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য 'উপাসনা' পত্রিকায় ১৩২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসযুগলের সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৩২২ সালে করিমগঞ্জের 'শ্রীভূমি' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নারীচরিত্র নিয়ে আলোচনা করেন শিলচর নরসিংহ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'দুটি প্রেমধারা' প্রবন্ধে। 'সুরমা' পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকুমার করের প্রবন্ধ 'গীতাঞ্জলির সমালোচনার প্রতিবাদ।' কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন সাব-জজ। তাঁর এ-জাতীয় প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রত্যুত্তর।' পরবর্তীকালে রসগ্রাহী সাহিত্য সমালোচনার এই ধারার অনুবর্তন লক্ষিত হয়

অশোকবিজয় রাহা ও নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের রচনায়। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ত্রৈমাসিক 'শিক্ষক' পত্রিকার সম্পাদক জগন্নাথ দেব। তাঁর তিনটি প্রবন্ধ, 'শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন পুথির বিবরণ', 'মহাকবি সঞ্জয়' এবং 'আসামের পত্রপত্রিকা' সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩১৯ থেকে ১৩৩৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মণিচরণ বর্মণ ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ 'হৈড়িম্ব ভাষা প্রবেশ' ১৩২০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। এই কালপর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দুলালচন্দ্র চৌধুরীর 'উপনয়ন সংস্কার' (১৯২৩), সুরেশ নাথ মজুমদারের 'রাজগুরু যোগীবংশ' (১৯২৩), প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শরীর গঠন' (১৯৩৪) ও মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থের 'সাহিত্য-চর্চা' (১৯৩৪)।

জীবনী সাহিত্য ও শিশুসাহিত্য রচনায় মৌলবীবাজারের নর্তন গ্রামের ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শ্রীহট্টে ছাত্রাবস্থায় তাঁর 'মশার যুদ্ধ' পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে মৌলবীবাজারে ১৯২৯ সালে তিনি 'কুলজা লাইব্রেরি' স্থাপন করেন। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রকাশ করেন 'শ্রীহট্ট গৌরব চরিতাবলী'। কলকাতায় 'মাস পয়লা প্রেস' প্রতিষ্ঠা করে তিনি 'মাস পয়লা' নামে একটি শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে অন্যান্য কয়েকজন জীবনী সাহিত্য-রচয়িতার নাম ও রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। লংলা-নিবাসী মৌলবী আব্দুল আলী রচিত জীবনীগ্রন্থের নাম 'হালতুন্নবী'। দয়ালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন 'ঠাকুর দয়ানন্দ'। ঢেউপাশা গ্রামের আব্দুল জব্বার রচনা করেন 'হজরত মোহাম্মদ'। বরমচালের উমেশ চৌধুরী রচিত জীবনীগ্রন্থ হচ্ছে 'রামকুমার নন্দীর জীবনচরিত'। শ্রীহট্ট শহরের হেমেন্দ্রনাথ দাস 'প্রবাসী' পত্রিকায় কয়েকজন মনীষীর জীবনকথা আলোচনা করেন। সন্ন্যাসোত্তর জীবনেও শ্রীহট্টের যে সকল সাহিত্যসেবী জীবনী সাহিত্য রচনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্ততপক্ষে তিনটি নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। দুলারির দাসপাড়া গ্রামে ১২৯২ সালে ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। শ্রীহট্ট শহরের রাজা গিরিশচন্দ্র স্কুলে তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। শ্রীহট্ট শহরের রামকৃষ্ণ মিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৮ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় স্বামী প্রেমেশানন্দ। তাঁর রচিত তিনটি জীবনীগ্রন্থ হচ্ছে 'শঙ্করাচার্যচরিত', 'রামানুজচরিত' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। তাঁর অনুপ্রেরণায় সেকালে এ অঞ্চলের যে-সকল যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্বামী গম্ভীরানন্দ পরবর্তীকালে বিশিষ্ট জীবনীকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। গম্ভীরানন্দের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থতালিকায় রয়েছে 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' (দুই খণ্ড) ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন'। স্বামী শঙ্করানন্দ রচনা করেন 'অভেদানন্দের জীবনী'। বেজোড়ার জয়নাথ নন্দী মজুমদারের 'শ্রীহট্ট গৌরব' সেকালের সুরমা উপত্যকার কৃতী সন্তানদের নামোল্লেখ-পূর্বক পদ্যাকারে রচিত একটি অভিনব পুস্তিকা। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে 'শ্রীহট্ট গ্রীবাপীঠ', 'সনাতন ধর্মতত্ত্ব', 'চন্দ্রনাথ নন্দী' ও 'হজরত মোহাম্মদ'।

জীবনী সাহিত্য রচনায় এবং আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণায় করিমগঞ্জের নিকটবর্তী মৈনা গ্রামনিবাসী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি (১৮৬৫-১৯৫৩) একটি স্মরণীয় নাম। অচ্যুতচরণের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভক্তি নির্যাস' (১২৯৯), 'জগদীশ পণ্ডিত চরিত' (১৩০২), 'হরিদাস চরিত' (১৩০৩), 'মাধবেন্দ্রকথা' (১৩০৪), 'অভিরামচরিত' (১৩০৬), 'শ্যামানন্দ চরিত' (১৩০৮), 'ঈশ্বরপুরীচরিত' (১৩০৯), 'শ্রীচৈতন্যচরিত' (১৩১১), 'রূপসনাতন' (১৩১২), 'শ্রীশ্রীনিতাইলীলা-লহরী' (১৩১৯), 'শান্তিলতা কাব্য' (১৩২০), 'বাল্যলীলা-সূত্র' (১৩২২), 'রাজভক্তি ও মহাযুদ্ধ' (১৩২৪) এবং 'শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল পরিভ্রমণ বা আসাম ও ঢাকাদক্ষিণ লীলাপ্রসঙ্গ' (১৩২৮)। উল্লিখিত গ্রন্থতালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝতে পারা যাবে, প্রধানত প্রাচীন বৈষ্ণব মহাপুরুষদের জীবনেতিহাসকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে পাঠকসমাজে প্রচার করাই ছিল অচ্যুতচরণের সাহিত্য-সাধনার মুখ্য অন্তঃপ্রেরণা। মূলত গদ্যকার হলেও তাঁর কবি-প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যায় চৈতন্যদেবের জীবনসঙ্গিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনকথা অবলম্বনে রচিত 'শান্তিলতা' চরিতকাব্যে। দিব্যসিংহ রচিত অদ্বৈতাচার্যের বাল্যজীবনাশ্রিত সংস্কৃত কাব্য 'বাল্যলীলা-সূত্র' তিনি সাবলীল পদ্যে অনুবাদ করেন। কলকাতা ও শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অচ্যুতচরণের প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ছয় শত। অচ্যুতচরণের অবিস্মরণীয় কীর্তি দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' তাঁর দীর্ঘ পনেরো বছরের অক্লান্ত চেষ্টা ও সারস্বত সাধনার ফল। এই মহাগ্রন্থের পূর্বাংশ ও উত্তরাংশ যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বিভিন্ন সময়ে 'গৌরভূষণ', 'ভক্তিসাগর', 'পুরাতত্ত্ববিশারদ', 'তত্ত্বনিধি' প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। তাঁর বহু অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি তিনি শ্রীহট্ট

সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় দান করে যান। রায়বাহাদুর রমণীমোহন দাস (১৮৭৩-১৯৩০) ও অচ্যুতচরণের যুগ্ম সম্পাদনায় করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্যপত্রিকা 'কমলা'।

১৩৪২ সালের ১৬ কার্তিক (২রা নভেম্বর, ১৯৩৫) শ্রীহট্ট শহরে 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বছর দুয়েক পর পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি সতীশচন্দ্র রায়ের অর্থানুকূল্যে পরিষদের পুথিশালার সূত্রপাত হয়। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ স্থাপন এইকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর মাধ্যমে প্রাচীন পুথি সংরক্ষণ ও গবেষণার সূচনা হয়। ১৯৪১ সালে অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য পুথি সংগ্রহের কাজে উদ্যোগী হন এবং শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শশীমোহন চক্রবর্তী। তিনি 'শ্রীহট্টীয় প্রবাদপ্রবচন' গ্রন্থটি রচনা করেন। শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থমালা সিরিজের যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের কয়েকখানা পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে 'শ্রীহট্টবাসী-সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র' (১৩৫০), 'শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা' (প্রথম খণ্ড, ১৩৫২), 'গোপাল ঠাকুরের পদাবলী' (১৩৫২), 'কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি রচিত পুরাণবোধোদ্দীপনী' (১৩৫৪)। তাঁর সম্পাদিত 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল' কলকাতা থেকে ১৩৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

এই সময়কার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক কমলাকান্ত গুপ্ত শ্রীহট্টের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও লিপি বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক তাঁর পুস্তিকা 'শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস' ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে 'গ্রীবাপীঠের পুনঃপ্রকাশ এবং শ্রীহট্টের প্রাচীন রাজবংশ'। কাছাড়ের ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ। তাঁর 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি ঢাকা থেকে ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও নতুন প্রাণতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল (১৮৮৬) ও মুরারিচাঁদ কলেজ (১৮৯২) নামক শ্রীহট্ট শহরের দুটি প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের পুত্র কুমার গোপিকারমণ 'গ্র্যান্ড রয়্যাল নাট্যসমাজ' সৃষ্টি করে শ্রীহট্টে নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। গোপিকারমণ ছিলেন অভিনেতা ও নাট্যকার। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'পুনরাগমন', 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মোগল প্রতিভা'। ১৯৪৭ সালে গোপিকারমণের মৃত্যু হয়। এই সময়কার আরেকজন নাট্যকার বিনোদবিহারী চক্রবর্তী ছিলেন 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর রচিত তিনটি নাটক হচ্ছে 'রাজমাতা', 'পরিচয়' ও 'বিক্ষোভ'। 'শ্রীভূমি' পত্রিকায় ক্ষীরোদচন্দ্র দেব মেটারলিঙ্কের নাটকের বাংলা ভাষান্তর 'টিন্টাগিলসের মৃত্যু' প্রকাশ করেন ১৩২২ সালে। এরপর 'শ্রীভূমি' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্র কুমার করের 'ম্যাকবেথ' নাটকের বঙ্গানুবাদ। ক্ষীরোদচন্দ্র দেব কৃত পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'-র নাট্যরূপ ১৯৩৫ সালে শিলচরে অভিনীত হয়। এই সময়কার আরেকজন নাট্যকার ভূপেন্দ্র কুমার শ্যাম। তাঁর রচিত চারখানা নাটক 'মেঘমল্লার', 'হিমপর্ণা', 'বনস্পতির অভিশাপ' ও 'রক্তকমল' অভিনীত হলেও প্রকাশিত হয়নি। মন্মথকুমার চৌধুরী (১৯১৮-) রচিত তিনটি প্রকাশিত নাটক হচ্ছে 'হে বীর পূর্ণ কর' (১৯৪৪), 'শব ও স্বপ্ন' (১৯৪৫) ও 'বাঁধ ভেঙে দাও' (১৯৪৬)। শিশুকিশোরদের জন্য স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন মৌলবীবাজার শহরের শ্রীনাথ মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত সারদাচরণ কর।

কালীপ্রসন্ন দাস সম্পাদিত 'বলাকা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে শ্রীহট্ট শহরে গড়ে ওঠে নতুন লেখকগোষ্ঠী। 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' গঠিত হয় ১৯৩৮ সালে। 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ও নাট্যকার বিনোদবিহারী চক্রবর্তী নির্বাচিত হন সংঘের সভাপতি। ১৯৩৮ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় শ্রীহট্ট শহরে। পৌরোহিত্য করেন সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৯ সালে সংঘের করিমগঞ্জ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বুদ্ধদেব বসু। 'বলাকা' পত্রিকার কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মৃণালকান্তি দাস ও অশোকবিজয় রাহা। মৃণালকান্তির আন্তরিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র 'বাণীচক্র'। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বাণীচক্রের পক্ষ থেকে নলিনীকুমার ভদ্র ও সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় স্মারকগ্রন্থ 'কবি প্রণাম'। নলিনীকুমার ভদ্র ছিলেন ভ্রমণকাহিনীর লেখক। তাঁর রচিত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে 'বিচিত্র মণিপুর' ও 'বিশাল অন্ধ্র'। এই সময়কার কাব্য আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মৃণালকান্তি দাস (১৯১৫-১৯৮০), অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০),

রামেন্দ্র দেশমুখ্য (১৯১৭-১৯৮৬) ও প্রজেশ কুমার রায় (১৯০৯-১৯৬৫)। মৃণালকান্তি দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আকাশ' ১৩৪৮ সালে শ্রীহট্টের বাণীচক্রভবন থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দিগন্ত' প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালে। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'ইশারা' (১৩৫৩) টুর্গেনিভের গদ্যকবিতার অনুবাদ। স্বামী সূর্যানন্দের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর মৃণালকান্তি পরিচিত হন স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী নামে। অশোকবিজয় রাহার প্রথম দুখানা কাব্যগ্রন্থ 'ডিহাং নদীর বাঁকে' (১৯৪১) ও 'রুদ্রবসন্ত' (১৯৪১) শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় 'জলডম্বরু পাহাড়', 'রক্তসন্ধ্যা' ও 'শেষচূড়া'। 'ভানুমতীর মাঠ' (১৯৪২) প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবন থেকে। ১৯৪৬ সালে আত্মপ্রকাশ করে 'উড়ো চিঠির ঝাঁক'। রামেন্দ্র দেশমুখ্যের প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'ধানক্ষেত' ও 'বহ্নিবাংলা'। প্রজেশকুমার রায়ের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তালিকায় রয়েছে 'যাত্রারম্ভ', 'চাঁদ ও রাহ' (১৯৪১), 'সীমান্তের চিঠি' (১৯৪২), 'জনসমুদ্র' (১৯৪৩), 'এক যে ছিল' ও 'নতুন কবিতা'। দেশবিভাগোত্তর কালে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতায় ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন কবি। 'বলাকা' পত্রিকায় সুধীর সেনের কবিতাও প্রকাশিত হয়। এই সময়কার উদীয়মান কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯২৯-) স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এগুলি হচ্ছে 'ছেঁড়া কাঁথার ফুল' (১৯৪৬), 'প্রাণবিহঙ্গম' (১৯৪৬) ও 'শিবের শিঙা' (১৯৪৭)। সেকালে 'বলাকা' পত্রিকায় কিছু উল্লেখযোগ্য গদ্যকর্মও প্রকাশিত হয়। ভারতীয় যুব প্রগতির ইতিহাস বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ত্রিগুণা সেন (১৯০৫-)। তিনি পরবর্তীকালে দেশের এক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও মন্ত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

শিলচর শহরে সাহিত্য-চর্চার প্রবাহ বেগবান হয়ে ওঠে নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের 'ভবিষ্যৎ' (১৯২৬) সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে। এর আগে মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় শিলচর থেকে 'নবযুগ' (১৯২০) নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিলচর শিক্ষা পরিষদের মুখপত্র 'শিক্ষাসেবক' (১৯২৬) দেড় দশকেরও অধিককাল সাহিত্য, প্রাচীনপুথি ও ইতিহাস বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমরূপে আপন ভূমিকা পালন করে। নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যাম (১৮৯২-১৯৬৪) প্রায় তিন বৎসর 'ভবিষ্যৎ' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৩৭সাল থেকে তিনি দুবছর 'সুরমা' সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। তাঁর 'রূপ ও রস' (১৯৩১) রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার প্রবন্ধগ্রন্থ। 'রবীন্দ্রনাথ: সমাজ ও ধর্ম' তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। এই কালপর্বের একজন স্মরণীয় প্রবন্ধকার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯০৩) প্রথম জীবনে শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজে এবং শেষ জীবনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪০ সালে জ্যোৎস্না চন্দ (১৯০৪-১৯৭৩) সম্পাদিত 'বিজয়িনী' মাসিক পত্রিকায় মহিলাদের সাহিত্য-প্রয়াস প্রতিফলিত হয়। সুরমা উপত্যকার প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা 'অন্তঃপুর' হেমন্তকুমারী চৌধুরানীর সম্পাদনায় ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও পত্রিকার সম্পাদকীয় কার্যালয় ছিল শ্রীহট্ট শহরে। সুরমা উপত্যকার সম্পাদিকা লীলা রায় (নাগ) ১৯৩১ সালে ঢাকা শহর থেকে তাঁর 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৪২ সালে জ্যোৎস্না চন্দের 'বিজয়িনী' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

বিপিনচন্দ্র পাল ও রামকুমার নন্দী মজুমদারের উপন্যাস রচনার মাধ্যমে সেকালের শ্রীহট্ট-কাছাড়ে কথাসাহিত্যের ভিত্তি রচিত হয়। ভাদেশ্বর গ্রামের আর্জুমন্দ আলী চৌধুরীর 'প্রেমদর্পণ' সম্ভবত এই অঞ্চলের মুসলমান লেখক রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। বর্তমান শতকের প্রথম পাদে 'হেমনলিনী' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেন লাবণ্যচন্দ্র গোস্বামী। কথাসাহিত্যে এই সময় যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত ও ক্ষীরোদচন্দ্র দেব। কাছাড়ের রাজপরিবার ও মহারানী ইন্দুপ্রভার জীবনকথাকে উপজীব্য করে রচিত লাবণ্য-কুমার চক্রবর্তীর উপন্যাস 'মহারানী ইন্দুপ্রভা' করিমগঞ্জে 'শ্রীভূমি' পত্রিকায় ১৩২২ সালের প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ছিলেন শিলচর নরসিং হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯৩৯) রচিত প্রথম উপন্যাস 'স্নেহের বাঁধন' ১৯১৮ সালের কিছু আগে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি জর্জ এলিয়টের একটি উপন্যাসের ছায়াবলম্বনে রচিত। ১৩৩১ সালে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ধর্মসভা তাঁকে ১৯২৭ সালে 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'সরস্বতী' উপাধি প্রদান করে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী' ১৩৩২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'শ্মশান সন্ধ্যা তপস্বী' প্রকাশিত হয়নি। সুরেন্দ্রলাল সেন বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ন ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও শিশু-সাহিত্যিক। তিনি করিমগঞ্জ শহরে

ডাকবিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাস চতুষ্টয় হচ্ছে 'তিথির ফল', 'মতিয়া', 'বেকার' ও 'পুরাণ বাড়ি'। 'ঊর্মিকা' নামে একটি গল্পগ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন। 'অনিমা' ও 'অণুকা' তাঁর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধসংকলন 'কর্ম ও সাধনা' করিমগঞ্জ থেকে ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদচন্দ্র দেব ছিলেন ব্যবহারজীবী এবং আসাম বিধানসভার সদস্য। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'নবমিকা' নয়টি বিদেশি গল্পের অনুবাদ। ১৩৪২ সালে কলকাতার কুলজা সাহিত্য মন্দির থেকে ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই কালপর্বের আরেকজন ঔপন্যাসিক লাবণ্যকুমার চৌধুরী রচিত 'অন্ধের বাঁশী' ও 'বাগিচার কুলি' উপন্যাস দুটিতে শ্রীহট্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনধারার চিত্র প্রতিফলিত। বীরেন দাশ ও মন্মথকুমার চৌধুরীর গল্প কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়কার আরেকজন গল্পকার কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের দুটি প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ হচ্ছে 'এদিক ওদিক' ও 'প্রবাহ'। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের নাম 'বরুণা'। সত্যভূষণ চৌধুরীর গল্প 'লালসিং' 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'সগরল'। বীরেন দাশের কিশোরপাঠ্য উপন্যাস 'নতুন পাঠশালা' তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম পর্বের লেখকদের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় পর্বে তাঁদের সাহিত্য-চর্চা ও সারস্বত সাধনার ধারা অব্যাহত রাখেন। প্রথম পূর্বে যাঁদের প্রতিভায় ছিল প্রভাতসূর্যের অরুণিমা, দ্বিতীয় পর্বে তাঁদের প্রতিভায় প্রকট হয়েছে মাধ্যন্দিন প্রার্থর্য। তাঁদের অনেকেই বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে অর্জন করেছেন স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা। সে ইতিহাস দ্বিতীয় পর্বে আলোচ্য।

দ্বিতীয় পর্ব

(১৩৫৪-১৪০০ বঙ্গাব্দ/১৯৪৭-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ বা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট থেকে এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। খণ্ডিত স্বাধীনতার সূর্যকরোজ্জ্বল আবির্ভাব তখন দেশবিভাগ আর দেশত্যাগের বেদনায় মেঘম্লান। নবরচিত রাষ্ট্রীয় মানচিত্রে তৎকালীন সুরমা উপত্যকার বৃহদংশ হয় বিদেশি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গচ্ছেদের কলঙ্ক সর্বাঙ্গে জড়িয়ে করিমগঞ্জ হয় কাছাড় জেলার অন্তর্গত। দেশবিভাগোত্তর কালে একাধিক লেখক নতুন বাসভূমি, জীবন ও জীবিকার সন্ধানে হন দেশান্তরী। এই বিষাদমলিন, অস্থিরলক্ষ্য, অনিশ্চিত পরিবেশেও বাংলা সাহিত্যচর্চায় প্রাণপ্রাচুর্য ও প্রতিভার অভাব হয়নি। এইপর্বে কর্মসূত্রে যাঁরা প্রবাসী হয়েছেন এবং সারস্বত ও সাহিত্য সাধনায় আঞ্চলিকতার বৃত্ত ভেঙে বাংলা সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য (১৯০৩-১৯৮৩), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯০৫-১৯৯০), জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯১২-), অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), পরমানন্দ সরস্বতী (১৯১৫-১৯৮০), রামেন্দ্র দেশমুখ্য (১৯১৭-১৯৮৬), সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ (১৯০৮-) প্রমুখ। আরও কিছু নাম এই তালিকায় অবশ্যই যুক্ত হতে পারে। যেমন, ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী (১৯০০-১৯৮৩) রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল (১৯০২-) রণেন্দ্রনাথ দেব (১৯২৩-), ভূদেব চৌধুরী (১৯২৪-), কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, রাসবিহারী দাস, অমিতাভ চৌধুরী (১৯২৩-), বিজিতকুমার দত্ত (১৯৩৩) শোভন সোম (১৯৩৪-) ও মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

করিমগঞ্জের অদূরবর্তী দৌলতপুর গ্রামের কামদেব শর্মাচার্যের পুত্র দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয় দৌলতপুর, কালীগঞ্জ, পঞ্চখণ্ড, শ্রীহট্ট ও কলকাতার পাঠশালা, স্কুল-কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে বাংলায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিয়ে বছর দুয়েক গবেষণা করেন। ১৯৩৫ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ অধ্যাপকরূপে কাজে যোগ দেন। এরপর বঙ্গবাসী কলেজেও কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৫ সালেই তিনি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। উত্তরজীবনে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ে সাপ্তাহিক ফিচারের লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও উপন্যাসধর্মী রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভৃভৃগুজাতক', 'পিছু ডাকে', 'ছক ও ছবি', 'ছায়ামিছিল' এবং 'কালপুরুষের ডায়েরী'।

মৌলবীবাজারের চৌয়াল্লিশ পরগণার খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলী কর্মজীবনে করিমগঞ্জ শহরে অবস্থানকালে তাঁর তৃতীয় পুত্র মুজতবা আলীর জন্ম হয়। মুজতবার অগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী (১৯০৩-১৯৮১) ছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এবং 'হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস', 'জৈন্তার ইতিহাস', 'আমার কালের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহট্ট শহরে পদার্পণ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষণ শুনে আকৃষ্ট হন কিশোর মুজতবা আলী এবং অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যান। শান্তিনিকেতনেই তাঁর মধ্যে সাহিত্য চেতনা ও জ্ঞানস্পৃহার বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে তিনি জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন এবং মিশরের আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশোনা করেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় '৫১ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্র' তাঁকে রম্যরচনার জগতে দান করে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা। ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'দেশে বিদেশে'। এই গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৪৯ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কার লাভ করেন। ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ভবঘুরে ও অন্যান্য'। 'পঞ্চতন্ত্র' দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'ময়ূরকণ্ঠী', 'দ্বন্দ্বমধুর', 'ধূপছায়া', 'টুনিমেম', 'রাজা উজীর', 'কত না অশ্রুজল', 'হিটলার', 'অবিশ্বাস্য', 'শবনম', 'প্রেম', 'দু-হারা', 'তুলনাহীনা', 'শহর-ইয়ার', 'জলে ডাঙ্গায়', 'মুসাফির' ও 'চাচা কাহিনী'। গল্পকাররূপে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৩৬৮) সংকলনগ্রন্থে। 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' (১৯৭৬) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ভাষাগত জাতীয়তাবাদের সমর্থনে তাঁর যুক্তি উচ্চারিত হয়েছে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' গ্রন্থে।

শ্রীহট্টের সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সন্তান যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর কর্মজীবনে শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ (১৯৪১-'৪৩), গুয়াহাটির কটন কলেজ (১৯৪৩-'৬৪) এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৪-১৯৭০) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে অবসরগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রধানত প্রাচীন পুথির গবেষক ও বিশেষজ্ঞ। ১৯৪৯ সালে তাঁর 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকাটি এখানে উদ্ধৃত হতে পারে। এই গ্রন্থতালিকায় রয়েছে 'দ্বিজসুন্দরের বৈদ্যনাথমঙ্গল' (১৯৫১), 'রায়শেখরের পদাবলী' (দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত, ১৯৫৫), 'বাংলা অভিধানগ্রন্থের পরিচয়' (১৯৭০), 'বাংলাপুথির তালিকাসমন্বয়' (১৯৭৮), 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা' (১৯৮৪), 'বাউল কবি রাধারমণ গীতিসংগ্রহ' (বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত, ১৯৮৮), 'শ্রীহট্টের ভট্টসঙ্গীত' (১৯৮৯), 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা' (১৯৯০), 'মুদ্রিত বাংলাগ্রন্থের পঞ্জি' (১৯৯৩, মরণোত্তরকালে প্রকাশিত)। যতীন্দ্রমোহন তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে তোলা দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পুথির মূল্যবান সংগ্রহটি ১৯৮৪ সালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে দান করেন। বর্তমানে তাঁর প্রদত্ত সংগ্রহটি 'যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা' নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।

জগদীশ ভট্টাচার্যের জন্ম শ্রীহট্ট জেলার সাধুহাটি গ্রামে। বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই সমালোচক ও প্রাবন্ধিক প্রথম জীবনে 'অষ্টাদশী' (১৯৩৩), 'ব্ল্যাক বোর্ড' (১৯৪১) ও 'ক্ষণশাশ্বতী' (১৯৪১) কাব্যত্রয়ের কবিরূপেই পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ওই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর পরবর্তী তিনটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'প্রেমকে মৃত্যুকে' (১৯৬৮), 'একটি আলোর পাখি' (১৯৭২) ও 'লোকায়ত' (১৯৭৪)। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কবিমানসী', 'রবীন্দ্র কবিতাশতক', 'বন্দেমাতরম'। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা যখন অস্তমিত, তখন কলকাতা থেকে ১৯৬৬ সালে জগদীশ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত ত্রৈমাসিক কবিতাপত্রিকা 'কবি ও কবিতা' বাংলা কাব্যের ধমনীতে নতুন রক্ত সঞ্চালন করে। তাঁর ভূমিকা-সম্বলিত আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের গল্পসংকলন তাঁকে সমালোচকরূপে করেছে প্রতিষ্ঠিত। 'আমার কালের কয়েকজন কবি' গ্রন্থে তিনি উপহার দিয়েছেন স্বকালের কবিবন্ধুবর্গ বিষয়ে তাঁর স্মৃতিবাসিত রসোজ্জ্বল মূল্যায়ন।

মৃণালকান্তি দাসের সন্ন্যাসোত্তর নাম পরমানন্দ সরস্বতী। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তীকালে প্রকাশিত

হলেও 'উত্তরবসন্ত' (১৩৫৮) কাব্যে তাঁর সন্ন্যাস-পূর্ব নামই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এরপর সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে তাঁর কোনও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৩৭২ সালে এক মাসের মধ্যে তাঁর পর পর চারখানা কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। এই চারখানা কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'নির্জন প্রহর', 'অক্ষর' (প্রথম খণ্ড), 'অক্ষর' (দ্বিতীয় খণ্ড) এবং 'নির্জন স্বাক্ষর'। ১৩৭৩ থেকে ১৩৮৭ সালের মধ্যে তাঁর বারোখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে 'আহিতাগ্নি' (১৩৭৩), 'পুনর্বসু' (১৩৭৪), 'পঞ্চমুখ' (১৩৭৫), 'বসন্তবহ্নি' (১৩৭৫), 'কালমৃগয়া' (১৩৭৬), 'আনন্দজাতক' (১৩৭৭), 'কালপুরুষের কড়চা' (১৩৮০), 'নিগম' (১৩৮২), 'অভিজ্ঞান' (১৩৮৬), 'অন্তরঙ্গ' (১৩৮৬), 'বহুরূপী' (১৩৮৭) ও 'নিঃসঙ্গ মাথুর' (১৩৮৭)। তাঁর কাব্যরসাঢ্য গদ্যভাষাশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যাবে ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত 'আশ্রমকথা' গ্রন্থে। পরমানন্দ সরস্বতীর কাব্য যেন দিভ্রষ্ট আধুনিকতার বহ্নিতপ্ত আকাশে অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের সুরভিত মলয়সমীর।

অশোকবিজয় রাহা ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথম জীবনে শ্রীহট্ট শহরের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত করিমগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। ওই বছরই তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে রবীন্দ্র অধ্যাপক ও রবীন্দ্র-ভবনের অধ্যক্ষ পদে কাজ করে ১৯৭৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'যেথা এই চৈত্রের শালবন' (১৯৬১), 'ঘন্টা বাজে: পর্দা সরে যায়' (১৯৮১) ও 'পৌষ ফসল' (১৯৮৩)। এরপর 'অশোকবিজয় রাহার শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে তাঁর নির্বাচিত কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। তাঁর উজ্জ্বল গদ্যকর্মের মধ্যে রয়েছে 'রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালা, ১৯৫৮) এবং 'বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ'। ১৯৬৬ সালে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের পক্ষে তিনি 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করে সেখানে 'রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা' বিষয়ে ভাষণ দান করেন। তাঁর 'পত্রাষ্টক' নামক পত্র সংকলনে সংকলিত কবিবন্ধু জগদীশ ভট্টাচার্যকে লেখা আটখানা পত্রের মধ্যে রয়েছে কবিজীবন আর কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা' বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত।

রামেন্দ্র দেশমুখ্যের জন্ম শিলচর শহরে। ১৯৪৬ সালে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি চাকরি নিয়ে চলে যান মুম্বাই। ১৯৫৩ সালে ফিরে আসেন গুয়াহাটিতে। একটি বিদেশি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি হয়ে তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করেন। 'ইভাক্যুয়ি' আর 'মরসুমী ফুল' তাঁর রচিত দুটি উপন্যাস। তাঁর ভ্রাম্যমাণ জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রম্যরচনার বই 'জনপদের ছন্দ' ১৯৫৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'শতপুষ্প'। ভ্রমণকথাশ্রয়ী রম্যরচনা 'শঙ্খদ্বীপের নর্তকী' প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ভ্রমণকাহিনী 'রূপময় ভারত', কিশোরপাঠ্য গল্পগ্রন্থ 'পাহাড়দুর্গে' ও 'বাঘের আত্মহত্যা' এবং সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'অমৃতের স্বাদ' (১৯৮৬)। ১৯৭৬ সালে দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য ও রামেন্দ্র দেশমুখ্যের যুগ্ম সম্পাদনায় জ্যোতিষ বিষয়ক সংকলনগ্রন্থ 'জ্যোতিষ মহাচয়ন' প্রকাশিত হয়।

শ্রীহট্ট জেলার কালীজুড়ি গ্রামের সারদাচরণ ভট্টাচার্যের পুত্র সুখময় ভট্টাচার্যের কর্মজীবন আরম্ভ হয় রংপুর জেলার মহারাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়ের রাজবাড়িতে সভাপণ্ডিত ও অধ্যাপকরূপে। এরপর তিনি রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনে সংস্কৃত বিভাগে গবেষক-অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। তিনি মহাভারত-চর্চা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায়। ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর মূল্যবান আকরগ্রন্থ 'মহাভারতের সমাজ'। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় রয়েছে 'মিতাক্ষরা দায়বিভাগ' (১৩৫৪), 'মহাভারতের চরিতাবলী' (১৯৬৬), 'রামায়ণের চরিতাবলী' (১৯৬৯), 'তন্ত্রপরিচয়', 'মীমাংসা দর্শন', 'ন্যায়দর্শন', 'মহাভারতের চতুর্বর্গ', 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তর', 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' ও 'মাণ্ডুক্য উপনিষদ'। 'সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৪) গ্রন্থটির জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন।

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের আগনা গ্রামে ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম। তাঁর পিতা কৈলাশচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন করিমগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ক্ষিতীশচন্দ্র ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বিদ্ধি' (১৯৪৬) সাধারণজ্ঞানের পুস্তক।

১৯৫৩ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' কলকাতার উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের জন্ম শ্রীহট্ট শহরের নয়া সড়কে। চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ রূপে পরিচিত হলেও চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে বেশ কয়েকখানা গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। তাঁর রচিত 'শরীরবিদ্যা' গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৫১ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বাঙালির খাদ্য', 'হর্মোন বা উত্তেজক রস', 'গার্হস্থ্যবিদ্যা' (তিন খণ্ড), 'শরীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিদ্যা' এবং 'জীববিদ্যা'।

কুমুদ রঞ্জন ভট্টাচার্য শিলঙে প্রবাস জীবনযাপন করেন। তাঁর প্রধানতম সাহিত্যকর্ম কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের গদ্যানুবাদ চারখণ্ডে শিলং থেকে ১৩৭০-৭১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর কন্যা সুরমা ঘটক চলচ্চিত্রকার স্বামী ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে স্মৃতিকথাশ্রয়ী গ্রন্থ রচনা করেন 'ঋত্বিক' (১৯৭৭)। রাসবিহারী দাস কর্মসূত্রে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তাঁর রচিত 'কাণ্টের দর্শন' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

রণেন্দ্রনাথ দেব ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুকাল করিমগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫২ সালে তিনি আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে যোগদান করেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'বৈষ্ণব কাব্যের তিন দিক' প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর তাঁর অপর গ্রন্থ 'শ্রীহট্ট পরিচয়' ১৯৮৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

ভূদেব চৌধুরী তাঁর জন্মকাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সময় করিমগঞ্জ শহরে অতিবাহিত করেন। করিমগঞ্জের সরকারি বিদ্যালয়ে তাঁর পিতা ভারত চৌধুরী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পদে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। এখানেই ভূদেব চৌধুরীর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়। ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং বিশ্বভারতীতে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থতালিকায় রয়েছে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৪) এবং 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার।'

অমিতাভ চৌধুরী একাধারে সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও ছড়াকার। কাছাড়ের বড়খলা চা-বাগানে জন্ম হলেও তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় করিমগঞ্জের উপকণ্ঠে শ্রীগৌরী গ্রামে। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্তা বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি যুক্ত হন 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে। চার্ণক্য ও দৌবারিক তাঁর ব্যবহৃত ছদ্মনাম। 'আমাদের আসাম' নামে একটি পত্রিকায় ১৯৪৩ সালে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দ্বিমাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'ঋতুপত্র'। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিতে তিনি এ পর্যন্ত লাভ করেছেন মতিলাল পুরস্কার (১৯৭৯), মৌচাক পুরস্কার (১৯৮৫) এবং 'পদ্মশ্রী' খেতাব (১৯৮৩)। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। তাঁর সম্পাদিত 'পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীত' বিশ্বভারতী থেকে ১৩৭১ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর ছড়ার বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ইকড়ি মিকড়ি', 'কাঠের তরোয়াল', 'ছন্নছড়া' ও 'নামমাত্র'। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা', 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ', 'রবি অনুরাগিণী', 'সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি।

বিজিতকুমার দত্ত মূলত সুরমা-বরাকতীরের মানুষ না হলেও তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয় করিমগঞ্জ শহরে। অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহার প্রেরণায় বিজিতকুমার দত্ত করিমগঞ্জ কলেজে বাংলা সাহিত্যের পাঠ নিতে শুরু করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৬০ সালে প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্তের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য-সম্পুট'। এর দুবছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর একক গ্রন্থ 'বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৩৬৯) তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকায় রয়েছে 'প্রাচীন বাংলা-মৈথিলী নাটক' এবং 'চৈতন্য জীবনকথা'।

করিমগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয় কবি-শিক্ষক সুধীর সেনের অনুপ্রেরণায়। ১৯৫১ সালে কলেজে প্রবেশ করে তিনি অধ্যাপক অশোকবিজয় রাহার সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপনাসূত্রে জড়িত হন। প্রধানত বিদেশি

কথাসাহিত্যের বাংলা ভাষান্তর ও সম্পাদনাকার্যে তাঁর উৎসাহ ও কৃতিত্ব সর্বাধিক। তাছাড়া তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার গল্পের অনুবাদ 'আধুনিক ভারতীয় গল্প' (চারখণ্ড)। বিদেশি কবিতার অনুবাদকর্মের নিদর্শনরূপে তাঁর এডোয়ার্ড লিয়রের ছড়ার অনুবাদ 'আষাঢ়ে বই' (১৩৭৯) এবং 'চিসোয়াভমিউশ-এর কবিতা' (১৩৮৮) বইদুটি উল্লিখিত হতে পারে।

শোভন সোম মূলত কবি ও প্রবন্ধকার হলেও কিছু ভাল গল্পেরও রচয়িতা। শিলচর শহরে তাঁর জন্ম। শান্তিনিকেতনে তিনি আচার্য নন্দলাল বসুর নিকট চিত্রশিল্পে শিক্ষালাভ করেন। কর্মজীবনের শেষপর্বে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিস্যুয়াল আর্টস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কলকাতার 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত 'ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচিত কবিতা সংকলন' (১৯৫৪), 'পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি ও জীবনানন্দ দাশ স্মরণে' (১৯৬০), 'জীবনায়ন' (১৯৬১) প্রভৃতি কাব্যসংকলনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'স্বরবিদ্ধ' (১৯৬১)। তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'ওপেন টি বায়োস্কোপ' এবং 'বিচিত্রের দূত'।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের আরও কয়েকজন কলকাতা প্রবাসী লেখক ও কবির নাম এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। সুনীলচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীহট্টের কবি। তাঁর 'রুবাইত-ই-ওমর খৈয়াম' ১৩৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। 'সত্যকাম' ছদ্মনামধারী লেখক প্রসূনকুমার পালের জন্ম বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে। তাঁর রচিত নাটক 'রাজনীতি' কলকাতা থেকে ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'নীরঞ্জনের বুদ্ধচরিত'। 'শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত' (১৩৯৮) গ্রন্থের রচয়িতা নরেশচন্দ্র দত্ত ১৯৩০ সাল থেকে দেশ বিভাগকাল পর্যন্ত ছিলেন শ্রীহট্টবাসী তাঁর পৈতৃক নিবাস কুমিল্লায়। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতাবাসী হন।

বরাক উপত্যকার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সংস্কৃত ও সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাজমোহন নাথ (১৯০০-১৯৬৫) হাইলাকান্দি শহরের এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্নাতক রাজমোহন নাথ ১৯৫৭ সালে অবসর গ্রহণ করার পর আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দুবছর অধ্যক্ষতা করার পর তিনি এক বছর চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কাজ করেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ইংরেজি ভাষায় রচিত। অসমিয়া ভাষাতেও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা দীর্ঘ না হলেও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ইতিহাসমূলক গ্রন্থ 'আসামের কথা ও কাহিনী' (১৯৪৫) প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর বাংলা সাহিত্য-চর্চায় সাময়িক ছেদ পড়ে। তারপর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নাথগুরুবাণী'। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে আছে গোরক্ষবাণী। 'নাথগুরুবাণী' মূল হিন্দি গ্রন্থের সাবলীল পদ্যানুবাদ। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'উপনিষদের সাধনরহস্য' কলকাতা থেকে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। রাজমোহন নাথ তাঁর শিলঙের বাড়িতেই জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

দেশবিভাগোত্তর কালে বরাক উপত্যকায় বাংলা সাহিত্য-চর্চায় নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সাহিত্য-অনুশীলনকে যাঁরা সংহত করে তোলেন তাঁদের মধ্যে অশোকবিজয় রাহা ও নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সময় শিলচর শহরে সাহিত্য আন্দোলনের প্রধান প্রেরণাদাতা ছিলেন নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ও দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী। করিমগঞ্জে ছিলেন অশোকবিজয় রাহা ও সুধীর সেন। হাইলাকান্দিতে ছিলেন শক্তিধর চৌধুরী। দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী (১৯০৭-), সুধীর সেন (১৯১৬-১৯৯৩) ও শক্তিধর চৌধুরী (১৯২০-) এই কালপর্বের তিন উল্লেখযোগ্য কবি। 'সাহারা মরুর কন্যা' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরীর আবির্ভাব। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খেজুর বনের দেশে' (১৯৪৮) প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হয় তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অরণ্যপুষ্প' (১৯৮৯)। 'শিলচর সাহিত্য চক্র'-কে কেন্দ্র করে যখন শিলচরের সাহিত্য-চর্চা ঊর্মিমুখর, তখন এই সাহিত্যচক্রের সভাপতিরূপে দীর্ঘ এক দশক (১৯৫০-'৬০) দেবেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী ছিলেন কর্মতৎপর। রচনারীতিতে তিনি রক্ষণশীল ও অনাধুনিক।

শক্তিধর চৌধুরীর কাব্যগ্রন্থ 'আরুণি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। 'পূর্বায়ণ' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল বরাক উপত্যকার সাংবাদিক মহলে পরিচিত। প্রাবন্ধিকরূপেও তাঁর পরিচয় অবিদিত নয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাব্যসংকলনে তাঁর কবিতা স্থান পেলেও তাঁর একক কাব্যগ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়নি।

হাইলাকান্দির তিনজন কবির সংযুক্ত কাব্যসংকলন 'এখানে ত্রিবেণী' গ্রন্থের অন্যতম কবি হচ্ছেন শক্তিধর চৌধুরী।

সুধীর সেনের জন্ম করিমগঞ্জ শহরের অদূরবর্তী কায়স্থগ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৯ সালের স্নাতক সুধীর সেন ১৯৬৮ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম পর্ব (১৯৪১-'৪৬) অতিবাহিত হয় ডিগবয় ওয়েল কোম্পানিতে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত করিমগঞ্জের সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চৌদ্দ বছর তাঁর জীবনে সাহিত্য-সাধনার উন্মেষ ও বিকাশের পর্ব। ১৯৫৫ সালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ক্ষুদ্রকায় কবিতার বই 'এক ফালি ঘাস'। এই সময় করিমগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় সাহিত্য আলোচনার আসর 'বাণীচক্র'। কর্মজীবনের শেষ পর্বে সুধীর সেন ১৯৭১ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ছিলেন শিলচরের গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক। ১৯৭১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গুয়াহাটি শাখা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালিদের অবদান'। তাঁর দ্বিতীয় ও শেষ কাব্যগ্রন্থ 'দর্পণে তিনটি মুখ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে।

১৯৫৫ সালে সুখময় বসু (১৯২৬-১৯২৫) ও রাজেন্দ্রনাথ রায় (১৯২৫-) করিমগঞ্জ থেকে তাঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ করেন ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পদক্ষেপ'। লেখকসূচিতে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, অশোকবিজয় রাহা, রামেন্দ্র দেশমুখ্য ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে আছেন প্রজেশ কুমার রায়, রসময় দাস ও নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রজেশকুমার রায় (১৯০৯-১৯৬৫) স্বাধীনতার পর দেশছাড়া হতে চাননি। তিনি থেকে যান তাঁর জন্মভূমি শ্রীহট্ট শহরে। পরে ঢাকার ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসে তিনি যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি পূর্ব পাকিস্তানে নিহত হন। বিভাগ-পূর্ব যুগে মুখ্যত কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বর্গারোহণ' তাঁর কিশোরপাঠ্য গল্পসংকলন। 'রেল গাড়ির ইতিকথা', 'মোটর গাড়ির ইতিকথা', 'পৃথিবীর প্রথম জীবন' প্রভৃতি কিছু গ্রন্থ তাঁর অনুবাদকর্মের অন্তর্ভুক্ত। বিভাগোত্তরকালীন বরাক উপত্যকার একাধিক পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

রসময় দাস (১৯০৪-১৯৭২) করিমগঞ্জের উপকণ্ঠে লাতু গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে দীর্ঘকাল কাজ করে অবসরগ্রহণ করেন। ভাবকোমল, আবেগময় রোমান্টিক কবিতা রচনায় তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত দুখানা কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'অন্তঃশীলা' ও 'সোনার হরিণ'।

করিমগঞ্জ কলেজে অশোকবিজয় রাহার বয়োকনিষ্ঠ সহকর্মী নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য দর্শনের অধ্যাপক হলেও সাহিত্য-চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁর একটি গল্প ১৯৫১ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে তিনি প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং পরে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন।

নীরদবরণ গোস্বামী (১৯০৭-১৯৭৩) কর্মজীবনে ছিলেন করিমগঞ্জ পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং বরাক উপত্যকার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষাব্রতী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজীতে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে ডাফ স্কলারশিপ লাভ করেন। বি এ পরীক্ষায় তিনি লাভ করেন আসাম সরকারের 'সর্বানন্দ স্বর্ণপদক'। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যের রসগ্রাহী পণ্ডিত ও কীর্তনিয়া। শিলং, কলকাতা ও বরাক উপত্যকার অসংখ্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। পার্সি লেখিকা রইহানা 'তায়েবজির ইংরাজি বই 'হার্ট অব অ্যা গোপী' বাংলায় অনুবাদ করে ১৯৫৬ সালে তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

করিমগঞ্জ পাবলিক স্কুলের শিক্ষক সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ধর ছিলেন এই সময়কার একজন নাট্যামোদী ও নাট্যকার। তাঁর 'কাশ্মীর' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে।

'পদক্ষেপ' পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে শুরু করে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তির বছর পর্যন্ত করিমগঞ্জের সাহিত্য চর্চার বাতাবরণকে প্রাণবন্ত করে রাখেন সুখময় বসু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র সুখময় বসু তাঁর ছাত্রজীবনে কবি ও প্রবন্ধকার মোহিতলাল মজুমদারের সান্নিধ্যে এসে বাংলা সাহিত্য-চর্চায় উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৬১ সালে সুখময় বসু ও সুধীর সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক

স্মারকগ্রন্থ 'রবিপ্রকাশ'। এতে প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, রণেন্দ্রনাথ দেব, ভূদেব চৌধুরী, অশোকবিজয় রাহা, ত্রিগুণা সেন, নীরদবরণ গোস্বামী ছাড়া রয়েছেন অমরেশ দত্ত (১৯১৯-) এবং কুমুদরঞ্জন লুহ (১৮৯৭-৭)। অমরেশ দত্তের জন্ম করিমগঞ্জের উপকণ্ঠে একটি গ্রামে। প্রথমে সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন তিনি। তারপর সাহিত্য অ্যাকাদেমির সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইন্ডিয়ান লিটারেচার' নামক কোষগ্রন্থের দুটি খণ্ড সম্পাদনা করেন। সংখ্যায় বেশি না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় কিছু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কুমুদরঞ্জন লুহ শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর কিছু স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৬১ সালে বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার দাবিতে বরাক উপত্যকায় জন্ম নেয় যে অগ্নিগর্ভ ভাষা আন্দোলন, তাতে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে পুলিশ ১৯ মে তারিখে গুলিচালনা করলে এগারোজন বাঙালি মৃত্যুবরণ করেন। এঁরা হলেন কমলা ভট্টাচার্য, শচীন পাল, কুমুদ দাস, কানাইলাল নিয়োগী, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুনীল সরকার, সত্যেন্দ্র দেব, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, তরণী দেবনাথ, হিতেশ বিশ্বাস ও সুকোমল পুরকায়স্থ। ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রকাশিত হয় অমিতাভ চৌধুরীর 'মুখের ভাষা বুকের রুধির' (১৯৬১)। এই সময় থেকে বরাক উপত্যকার সাহিত্য-চর্চায় সঞ্চারিত হয় উদ্দীপ্ত আবেগ আর প্রভাত-সূর্যের নবরাগ। নতুন সৃষ্টির স্বপ্নমেদুর প্রাণকল্লোলে কল্লোলিনী হয়ে ওঠে কবিতা, গল্প আর উপন্যাসের ত্রিধারা।

এই সময়কার কথা সাহিত্যে রহস্য-রোমাঞ্চের পসরা নিয়ে দ্রুত সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠেন যে গল্পকার, অল্পকালের মধ্যেই তাঁর লেখনী চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর নাম এ ডি বাদশা (১৯২০-১৯৬২)। শ্রীহট্টের মৌলবীবাজারে তাঁর জন্ম। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করে তিনি পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। এম এ পরীক্ষা তিনি দিতে পারেননি। ১৯৪২ সালে পুলিশ বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার ফলে গৃহবন্দী অবসরের দিনরজনী অতিবাহিত হয় সাহিত্য-চর্চায়। ১৯৬২ সালের ১৯ নভেম্বর করিমগঞ্জে নিজ বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বল্পদৈর্ঘ্যের সাহিত্য সাধনার জীবনে তিনি রচনা করেন একটি নাটক, কয়েকটি গল্প ও দশটি উপন্যাস। তিনজন নবীন লেখকের তিনটি উপন্যাস একটি গ্রন্থে সংকলিত হয়ে 'উপন্যাসবিচিত্রা' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৬৮ সালে। এ ডি বাদশার 'প্রিয়তমা' উক্ত উপন্যাসত্রয়ের মধ্যে অন্যতম। কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হচ্ছে 'নকল বিয়ে' (১৯৬২), 'অন্তর্ধান রহস্য' (১৩৬৯), 'মেঘভাঙা রোদ' (১৩৬৯), 'শেষকৃত্য' (১৩৬৯), 'উইল, ইলেকশন আর সায়ানাইড' (১৩৬৯), 'শঙ্খিনীর স্বপ্ন' (১৩৬৯) ও 'কোটালের প্রেম' (১৩৬৯)। এছাড়া তাঁর আরও দুটি রহস্য-উপন্যাস হচ্ছে 'মারা গেছি' এবং 'চোখের আড়ালে'। তাঁর নাটক 'চৌধুরী কোম্পানির চাকরি' কলকাতার 'উল্টোরথ' পত্রিকার আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।

এই সময়কার আরেকজন ঔপন্যাসিক বিপ্ররাজ দাস (১৯৩৭-) কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। করিমগঞ্জ শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মেঘভাঙা রোদ' প্রকাশিত হয় ১৩৭০ সালে। এরপর 'ঝর্ণা পাহাড় প্রান্তর' নামে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি ১৯৬৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অলক রায় ছদ্মনামে ১৯৭৩ সালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'ভাষা সংগ্রামে কাছাড়' ১৯৭২ সালের বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনকে আশ্রয় করে রচিত।

সত্যরঞ্জন দত্ত কলকাতা থেকে এসে করিমগঞ্জ কলেজে কিছুকাল বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। মিলন দত্ত নামে অধ্যাপক জীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত তাঁর উপন্যাস 'মীরগঞ্জ গার্লস কলেজ' ১৯৬৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে চিত্রিত ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব ঘটনা ও চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হলে উপন্যাসটি আক্রমণ ও বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। এতে লেখক অপমানিত বোধ করেন এবং কলেজের চাকরিতে পদত্যাগ করে চলে যান।

অতুলরঞ্জন দেব (১৯৩৪-) কবি ও গল্পকার। ১৯৬০ সালে তাঁর উপন্যাস 'অন্য রাত অন্য তারা' পুস্তকাকারে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ওই বছরই তিনি রাসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে করিমগঞ্জ কলেজে যোগদান করেন। শিলচর থেকে প্রকাশিত মাসিক 'উপহার' পত্রিকায় ১৯৭৮ সালে তাঁর উপন্যাস 'তবুও

আশা ভালোবাসা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

প্রফুল্ল কুমার দেব (১৯৪৫-) রচিত দুটি উপন্যাসই করিমগঞ্জ থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত। উপন্যাস দুটির নাম 'নীরব বিধাতা' (১৯৮৫) ও 'ভালোবাসার বিবর্ণ দলিল' (১৯৮৬)। কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস হচ্ছে শ্যামল নন্দীর 'নেপথ্য সঙ্গীত' (১৯৮১), ভি এম নূরুল ইসলামের 'বিদায় প্রিয়া' (১৯৮২) এবং মিহিরকান্তি রায়ের 'দিনান্তের রঙ ধূসর' (১৯৮২)।

বরাক উপত্যকার সাময়িক পত্রিকা ও শারদ সংকলনে প্রকাশিত অনেকগুলি উপন্যাসই গ্রন্থাকারে পৃথকভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। এ-জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে প্রথমেই গণেশ দে'র তিনটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করতে হয়। এই তিনটি উপন্যাস হচ্ছে 'কলংমার কূলে' (শারদীয়া সোনার কাছাড়, ১৩৮৭), 'প্রার্থিত পৃথিবী' (তদেব, ১৩৮৮) ও 'কুসুম-ছেঁড়া কাহিনী' (শারদীয়া শঙ্খধ্বনি, ১৩৯০)। শিলচর শহরের উপকণ্ঠে পয়লাপুর কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক গণেশ দে গল্পকার ও রম্যরচনাকার রূপেও পরিচিত।

বদরুজ্জামান চৌধুরী (১৯৪৬-) বদরপুরের নিকটবর্তী একটি গ্রামের সন্তান। কর্মসূত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা একশ' তিরিশেরও বেশি। পত্রপত্রিকায় এ পর্যন্ত চারটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে- 'এই অন্ধকারে' (শারদীয়া শঙ্খধ্বনি, ১৩৮৯), 'ধর্ষণ' (প্রয়াস, কার্তিক, ১৩৯৩), 'রশীদপুরের পাঁচালী' (প্রতিস্রোত, ১৯৮৫) ও 'মায়ার বাঁধন' (গতি, ১৯৭৭)। কলকাতার পত্রিকায় এ পর্যন্ত তাঁর সাতটি গোয়েন্দা উপন্যাস এবং বাইশটি রহস্য গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া কিছু রম্যরচনা ও প্রবন্ধেরও তিনি লেখক।

কবি ও প্রবন্ধকার উদয়ন ঘোষ এ পর্যন্ত একখানা উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' নামের উপন্যাসটি হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩৯৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কামালুদ্দীন আহমদের উপন্যাস 'অতলান্ত' কলকাতার 'কাফেলা' পত্রিকায় ১৩৯৬-৯৭ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের পর শিলচরে আধুনিক বাংলা কবিতার চর্চা নতুন উদ্যমে শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিমল চৌধুরী ও উদয়ন ঘোষের সম্পাদনায় শিলচর থেকে প্রকাশিত কবিতাপত্র 'অতন্দ্র' তার প্রায় দ্বাদশবার্ষিক আয়ুষ্কালের মধ্যে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং একটি কবিগোষ্ঠী গড়ে তোলে। ১৯৬৬ সালে অতীন দাশ ও দীনেশলাল রায় (দীলারা) তাঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় শিলচর থেকে প্রকাশ করেন 'শতাব্দী'। প্রায় দুবছর নিয়মিত প্রকাশের পর পত্রিকাটির প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এরপর প্রকাশিত হয় শীতাংশু পালের 'কবি সংবাদ'। দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার পর ১৯৬৭সালের ডিসেম্বর মাসে 'শিলচর সাহিত্যচক্র' পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কালপর্বে উল্লিখিত তিনটি কবিতাপত্রে যাঁরা কবিতা লিখতেন এবং শিলচর সাহিত্যচক্রের আসরে কবিতা পাঠ করতেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সুধীর সেন, করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, কালীকুসুম চৌধুরী, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, দীনেশলাল রায়, জিতেন নাগ, বিমল চৌধুরী, সরোজ বিশ্বাস, অতীন দাশ, উমা ভট্টাচার্য, গণেশ দে, রুচিরা শ্যাম, অনুরূপা বিশ্বাস, মনোতোষ চক্রবর্তী, মজম্মিল আলী লস্কর, হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিতকুমার নাগ, শান্তনু ঘোষ, সৈয়দ হোসেন মজুমদার, পদ্মা দেবী, অতুলরঞ্জন দেব ও মনোজিৎ দাস।

১৯৫০ সালে করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯২৯-) তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ক্ষুধিত ঈশ্বর' প্রকাশ করেন করিমগঞ্জ থেকে। তারপর দুই দশকের দীর্ঘ বিরতির পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'রক্ত আঁখি ক্ষোভ ক্যাকটাস' (১৯৭১)। এপর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য কবিতার বইগুলি হচ্ছে 'যুগ জীবন যুগান্তর' (১৯৭৪), 'ঘাসে নক্ষত্রে সংসার' (১৯৭৪), 'পা রাখবার ভূমি' (১৯৮১), 'অনন্ত ট্যুরিস্ট' (১৯৯৩) এবং 'তেমন রাবার নেই মোছে উনিশে মে' (১৯৯৪)। তিনি প্রাবন্ধিক এবং গল্পকারও। 'বরাকপারের গল্প' নামক গল্প-সংকলনে তাঁর গল্প সংকলিত।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সংগ্রাম ও ছাত্র আন্দোলন ১৯৭১ সালে ক্রমশ দেশের মুক্তি সংগ্রামের রূপ ধারণ করে এবং অবশেষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মের মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করে। বরাক উপত্যকায় এর প্রভাব অনুভূত হয়। ভাষিক পরিচয়ের সংহতি ও প্রত্যয় দীপ্যমান হয়ে ওঠে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনিঃশেষ আত্মনিবেদনে। ১৯৭২ সালে তিনজন

কবির কবিতার বই প্রকাশিত হয়। অতুলরঞ্জন দেবের 'নগরে অরণ্যমন', অতীন দাশের 'এই তো স্বদেশ' এবং বর্তমান লেখকের 'অন্দর থেকে বারান্দা।' একই বছরে আত্মপ্রকাশ করে করুণারঞ্জন ভট্টাচার্যের রম্যরচনার বই 'ঝরা পালক'।

অতীন দাশ (১৯৪৭-) সাংবাদিকতাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করলেও এ-পর্যন্ত পাঁচখানা কাব্যগ্রন্থের জনক। তাঁর অন্যান্য কবিতার বইগুলি হচ্ছে 'অমাবস্যার গান' (১৯৭৭), 'নষ্ট নক্ষত্র ধুলো মেঘ' (১৯৮০), 'ঝরে চন্দ্রকলা' (১৯৮৮) ও 'নিদাঘে বিষণ্ণ ঘুঘু' (১৯৯২)। 'শতাব্দী' কবিতাপত্রের অন্যতম সম্পাদক পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে 'বরাক' (১৯৭২) এবং 'বরাক গার্ডিয়ান' (১৯৯০) সংবাদপত্র দুটির সঙ্গে যুক্ত হন।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী (১৯৩৭-) 'অতন্দ্র' কবিগোষ্ঠীর প্রধান কবিরূপে এককালে পরিচিতি লাভ করেন। শ্রীহট্টের সোনাইতা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'সময় শরীর হৃদয়' (১৯৭০), 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৮) এবং 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪)। তাঁর প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থ দুটি হচ্ছে 'নির্বাচিত কবিতা' এবং 'দ্বন্দ্ব অহির্নিশ'। যে সকল কাব্য-সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কাব্যসমুচ্চয়' (সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত), 'কালের কবিতা' (শান্তনু দাস সম্পাদিত), 'এই শতাব্দীর প্রেমের কবিতা' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত), 'দুই বাংলার ভালোবাসার কবিতা' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শামসুর রহমান সম্পাদিত) এবং 'ষাট-সত্তর' (উত্তম দাস সম্পাদিত)। এ-পর্যন্ত তিনি যুগ্মভাবে যে তিনটি কাব্যসংকলন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, সেগুলি হচ্ছে 'অরণ্যপুষ্প' (১৯৬২), 'কবিতা সংকলন' (১৯৮৭) এবং 'ঈশানের পুঞ্জমেঘ' (১৯৯২)।

দীনেশলাল রায় (১৯৩৬-) 'শতাব্দী' কবিতাপত্রের সম্পাদকরূপে এবং কবিরূপে ১৯৬৬ সালে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনের শরীর' ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। মাঝে-মধ্যে কিছু গল্প এবং প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন।

অনুরূপা বিশ্বাস (১৯৩২-) কবি ও প্রবন্ধকার। শিলচর মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এই অধ্যাপিকার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে' (১৯৭৮)। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অদ্ভুত আঁধার এক' (১৯৮০)। বরাক উপত্যকার কবিতার জগতে মহিলা কবিদের স্থান ও ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। পদ্মাদেবী (১৯২২-১৯৮৯) ও উমা ভট্টাচার্য (১৯৪২-১৯৮৫) ছাড়া প্রায় সকলেরই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ছবি গুপ্তা (১৯৩৮) সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তাঁর জন্মশহর শিলঙে। তাঁর প্রকাশিত দুখানা কাব্যগ্রন্থের নাম 'কৃষ্ণচূড়ায় বসন্ত' এবং 'শব্দবিভাবতী'। 'মা নিষাদ' নামে একটি সাহিত্যপত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের কন্যা রুচিরা শ্যাম (১৯৪৫-) করিমগঞ্জের রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজে কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করার পর কলকাতায় গিয়ে সাংবাদিকতাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেন। 'সখী সংবাদ' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত মহিলাদের একটি সাহিত্যপত্রের সঙ্গে এককালে তিনি অন্যতমা সম্পাদিকারূপে জড়িত ছিলেন। 'স্বরলিপি মেঘ' (১৯৮৩) কাব্যের কবি দীপালি দত্ত শিশুপাঠ্য ছড়ার ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মুকুল' প্রকাশ করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফুলঝুরি'। মহুয়া চৌধুরী (১৯৫০) কবি ও গল্পকার। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'নূপুর'। পরবর্তী প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য মহিলা কবিদের মধ্যে আছেন শেলী দাস চৌধুরী (১৯৬২-), স্মৃতি পাল (১৯৬৭-) ও স্বর্ণালি বিশ্বাস (১৯৭১-)। 'নীলপদ্ম' (১৯৮৮) এবং 'তবু জন্মান্তরে জননীকে' (১৯৮৯) স্মৃতি পালের দুটি ক্ষুদ্রকায় কবিতার বই। শাশ্বতী সাহা (১৯৭৩-১৯৯০) রচিত কবিতাগুলি কিশোরী কবির অকালমৃত্যুর পর 'শাশ্বতী সাহার কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণা চৌধুরী (১৯৬২-) রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'ঝিলের জলে নোলক ছবি'। নিবেদিতা চৌধুরী (১৯৬৮) রচিত কাব্যগ্রন্থ 'শালুকলতায় শায়ক গাঁথা' ১৯৯১ সালে শিলচর থেকে প্রকাশিত হয়। করিমগঞ্জ রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা অরুণা দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'বিহঙ্গ মন' তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়।

করিমগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মনোজিৎ দাস (১৯৩২) এককালে 'ফলক' (১৩৬১) এবং 'মরশুমী' (১৩৬৫) নামে দুটি ক্ষুদ্রকায় কবিতাপত্র প্রকাশ করেন। 'ফলক' তিনটি সংখ্যা এবং 'মরশুমী' দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি 'নধুপর্ক' (১৩৬৯) ও 'আকস্মিক' (১৩৯৪) নামে দুটি ক্ষণস্থায়ী কবিতাপত্র যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন। তাঁর সম্পাদিত 'মাত্কথা' (১৩৭৭)

ছিল বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক কথ্যভাষার একমাত্র পত্রিকা। পত্রিকাটির দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

সরোজ বিশ্বাস (১৯৩৫-১৯৮৭) প্রথম যৌবনে 'আরেক আকাশ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। আয়কর বিভাগের আধিকারিক থাকাকালে করিমগঞ্জ শহরে যান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কালীকুসুম চৌধুরী (১৯৩৬-) কবি ও গল্পকার। 'পুবের হাওয়া' কাব্যসংকলনে তাঁর কবিতা এবং 'নীল গোলাপ' গল্প সংকলনে তাঁর গল্প সংকলিত। ১৯৬৭ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'লুব্ধক' নামে একটি গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বিমল চৌধুরী (১৯৩৭-) ও উদয়ন ঘোষ (১৯৪০-) 'অতন্দ্র' কবিতাপত্রের সঙ্গে সম্পাদকরূপে যুক্ত ছিলেন। একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক বিমল চৌধুরীর প্রকাশিত গ্রন্থতালিকায় রয়েছে কাব্যগ্রন্থ 'কেবল খেলা' ও ছড়ার বই 'নীর্ভুল'। গল্পকাররূপেও তিনি পরিচিত। শিলঙের একটি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক উদয়ন ঘোষ মূলত কবি। তাঁর কবিতা এখনো গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' উপন্যাসটির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে।

অরুণোদয় ভট্টাচার্য (১৯৩৮-) তাঁর ছাত্রাবস্থায় করিমগঞ্জ থেকে ১৯৫৫ সালে ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'আলো' প্রকাশ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অর্থনীতির অধ্যাপনা করার পর তিনি আই এ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একটি ভিটে একটি মানুষ' নয়া দিল্লি থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। তাঁর অন্য তিনটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'আবার বন্দরে' (১৯৮২), 'স্বগত সংলাপ' ও 'প্রতিশব্দ' (১৯৮৭)।

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য (১৯৩৯-) ও ব্রজেন্দ্রকুমার সিংহ (১৯৩৮-) উভয়েই কর্মসূত্রে অধ্যাপক এবং কবি ও গদ্যকার। ১৯৬৯ সালে তাঁদের যুগ্ম সম্পাদনায় হাইলাকান্দি শহর থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'সাহিত্য'। কিছুকাল বন্ধ থাকার পর পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে তার যাত্রা অব্যাহত রাখে। বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্যের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে 'কেউ পরবাসী নয়' (১৩৭৮), 'জেগে আছে স্তব্ধতায়' (১৩৮৮) এবং 'সুন্দর যেখানে খেলা করে' (১৩৯৮)। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৩৭৬) মুখ্যত শিলচর ও হাইলাকান্দির কয়েকজন কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলনগ্রন্থ। দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৯৪) প্রকাশিত হলে আরও কয়েকজন কবি অন্তর্ভুক্ত হন।

জিতেন নাগ (১৯৪০-) কর্মজীবনে শিলচরের একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'না আলোয় না অন্ধকারে' কলকাতা থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার (১৯৪০-) প্রথম জীবনে বরাক উপত্যকার কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও পরবর্তীকালে আকাশবাণীর সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর কাব্য-চর্চায় ছেদ পড়ে।

বদরপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কিরণশঙ্কর রায় (১৯৪১-) কবি ও প্রবন্ধকার। এ-পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ দুটি হচ্ছে 'স্রোতোধারা' এবং 'দূরত্ব জ্বলতে থাকে।'

অশোক বার্মা (১৯৪৫-) কবি, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। মাতৃভাষা হিন্দি হলেও তিনি বাংলা সাহিত্য-চর্চায় গভীর উৎসাহী। তাঁর প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'শুধু শব্দ আশে পাশে' এবং 'নিঃশব্দ অঙ্গনে তৃতীয় পুরুষ।'

শান্তনু ঘোষ (১৯৪৬-) এককালে কলকাতার 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় কবিতা লিখে 'কৃত্তিবাস পুরস্কার' অর্জন করলেও শিলচর শহরের একটি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের এই অধ্যাপক পরবর্তীকালে সাংবাদিকরূপেই অধিকতর পরিচিতি লাভ করেন।

তপোধীর ভট্টাচার্য (১৯৪৯-) শিলচর শহরের স্কুলে ও কলেজে দীর্ঘদিন কাজ করার পর গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। মিথিলেশ ভট্টাচার্য ও শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর সহযোগিতায় প্রকাশিত 'শতক্রতু' (১৯৭৩) পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক তপোধীর ভট্টাচার্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তুমি সেই পীড়িত কুসুম' (১৯৮৭)। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে 'কবচকুণ্ডল' (১৯৯২), 'আসন্ন, শুশ্রূষার বার্তা' (১৯৯২) ও 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৯৩)। তাঁর দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ

হচ্ছে 'আধুনিকতা, জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব' (স্ত্রী স্বপ্না ভট্টাচার্যের সঙ্গে একযোগে রচিত) এবং 'ধর্ম-কারায় বজ্র হানো।'

বর্তমান লেখকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্দর থেকে বারান্দা' (১৯৭২) প্রকাশিত হওয়ার দুই দশককাল পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মগ্ন কণ্ঠ ভগ্ন স্বর' (১৯৯৩) প্রকাশিত হয়। তারপর প্রকাশিত হয় প্রবন্ধগ্রন্থ 'সার্ধশতকের বরাক উপত্যকা: সাহিত্য ও সমাজ' (১৯৯৪)

রণজিৎ দাশ (১৯৪৯-) ও মনোতোষ চক্রবর্তী (১৯৫১-) শিলচরের কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে যুক্ত ছিলেন। পরে দুজনই কলকাতা প্রবাসী হন। রণজিৎ দাশের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আমাদের লাজুক কবিতা', 'জিপসীদের তাঁবু' ও 'সময় সবুজ ডাইনি'। মনোতোষ চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ 'মেঘ কারো বাড়ি গাড়ি নয়' হাইলাকান্দির সাহিত্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।

বাহারউদ্দিন (১৯৫২-) সাংবাদিকতাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করে কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি মাঝে-মধ্যে কবিতা লিখলেও তাঁর কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। দেবাশিস তরফদার (১৯৫৮-) ও দেবাশিস চন্দ (১৯৬০-) শিলচরের পত্রপত্রিকায় কবিতা লেখা শুরু করেন। দেবাশিস তরফদার পরে জীবনবীমার কর্মসূত্রে কলকাতা প্রবাসী হন। দেবাশিস চন্দও কলকাতার একটি বাংলা দৈনিকের সঙ্গে যুক্ত হন। দেবাশিস তরফদারের দুটি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে 'আপেলের বিকল্প' এবং 'কথাসর্বস্ব'। দেবাশিস চন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'কার্নিসে বিষণ্ণ মেঘ' (১৯৯৩)।

দীপক হোম চৌধুরী (১৯৫২-) ও দীপঙ্কর নাথ (১৯৫২-) উভয়ই সমসাময়িক কবি। দীপক হোম চৌধুরীর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বাবা একদিন' (১৯৮১)। দীপঙ্কর নাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তোমাকে সুন্দর হতে হবে' কলকাতা থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'বেড়াতে এসেছি'। দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য (১৯৫২-) কর্মসূত্রে শিক্ষক। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'সৌর শরীর থেকে।' দিলীপকান্তি লস্কর (১৯৫১-) দীর্ঘদিন থেকে বরাক উপত্যকার এবং কলকাতার পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখলেও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাওয়ার দেয়াল মেঘের জগদ্দল' ১৯৯২ সালে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। আশুতোষ দাস (১৯৫৫-) শিক্ষকতা করেন হাইলাকান্দি শহরে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাহিত্যপত্রিকা 'বেলাভূমি'। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'জলে স্থলে ভালোবাসা'। হাইলাকান্দি জেলার কবি মাশুক আহমেদ (১৯৫০) ও জলালউদ্দিন লস্কর (১৯৫৭-) কর্মসূত্রে শিক্ষক। মাশুক আহমেদের দুটি কাব্য 'রেশমী লোকালয়' ও 'প্যালেস্টাইনের কবিতা' (১৯৮০) এ পর্যন্ত প্রকাশিত। জলালউদ্দিন লস্করের কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা আমার শহীদমিনার' হাইলাকান্দি থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। জলালউদ্দিন ও জসিমউদ্দিন লস্কর (১৯৬১-) সম্পাদিত 'খুলে যায় শব্দের দরজা' (১৯৯১) বরাক উপত্যকার কয়েকজন কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন। তাঁদের সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা 'চম্পাকলি' হাইলাকান্দির আলগাপুর থেকে প্রকাশিত হয়।

সাম্প্রতিকালে প্রকাশিত বরাক উপত্যকার কয়েকজন কবির কাব্যগ্রন্থের নাম এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হচ্ছে: রণবীর চক্রবর্তীর 'আলোর সন্ধানে' (১৯৮৪), বিজয়কুমার ভট্টাচার্য (১৯৫৯-) রচিত 'পুড়ে পুড়ে স্বর্ণ হোক সম্মিলিত পাপ' (১৯৮৪), 'আমার কণ্ঠস্বর (১৯৮৬) ও 'সন্দীপ দ্বীপের গল্প' (১৯৮৬), শঙ্করজ্যোতি দেব (১৯৫৯-) রচিত 'ঘুমের জানালা', জগদীশ চক্রবর্তী (১৯৫১-) রচিত 'দাঁড়াতে, চাই তোমার শরীরে' (১৯৮৫), জ্যোতিরিন্দ্রলাল গোস্বামী (১৯৪৭-) রচিত 'অঙ্কুর' (১৯৯০) ও 'এবং আর্তিময় প্রতিবাদ' (১৯৯২), সিতাংশু চক্রবর্তী (১৯৪৯-) ও কমলকুমার ঘোষের যুগলবন্দী কাব্য 'এখানে দুজন' (১৯৯৩), সুব্রতকুমার রায় (১৯৬৬-) রচিত 'মৌন যোগাযোগ' (১৯৯৩), অমিতাভ দেব চৌধুরীর 'সীজারিয়ান এবং অন্যান্য কবিতা' (১৯৯৪) এবং মঞ্জীর আহমদ চৌধুরী (১৯৬৯-) রচিত 'আগুনে ঝলসে গেছে শরীর'।

এখনো যাঁদের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি অথচ কাব্যচর্চায় যাঁরা গভীর মনোযোগী, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সঞ্জীবকুমার দাশ (১৯৪৬-), দীপক চক্রবর্তী (১৯৫৩-), মলয়কান্তি দে (১৯৫৬-), তীর্থঙ্কর দাস পুরকায়স্থ (১৯৫৬-), মৃন্ময় রায় (১৯৫৬-), ভক্ত সিং (১৯৫৬-), মঞ্জুগোপাল দেব (১৯৫৯-), পার্থপ্রতিম মৈত্র (১৯৫৯-), বনানী ভট্টাচার্য (১৯৬০-), জয়দেব ভট্টাচার্য (১৯৬০-), দেবাশিস

ভট্টাচার্য (১৯৬১-), সৌমিত্র বৈশ্য (১৯৬২-), সুজিত দাস (১৯৬৪-), ভাস্করজ্যোতি দেব (১৯৬৬) এবং সৌগত পুরকায়স্থ (১৯৬৬-)।

বরাক উপত্যকায় কাব্য-কবিতার পুষ্পিত উদ্যানের পাশাপাশি রয়েছে গদ্যকর্মের বনস্পতি। দেশবিভাগোত্তর কালে প্রবন্ধ সাহিত্যেও নতুন প্রাণবত্তা ও উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাময়িকপত্র ব্যতীত সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্রগুলি প্রবন্ধ প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এ-জাতীয় কয়েকটি পত্রপত্রিকা হচ্ছে বিধুভূষণ চৌধুরী (১৯০৭-১৯৭৫) সম্পাদিত, করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি', সুনীলকুমার দত্ত রায়ের সম্পাদনায় শিলচর থেকে ১৯৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অরুণোদয়', অমিতকুমার নাগ ও অতীন গুপ্তের সম্পাদনায় শিলচর থেকে ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত 'সম্ভার', হুরমত আলি বড়লস্কর সম্পাদিত 'সুরমা' এবং গোলাম ওসমানী সম্পাদিত শিলচর থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বরাক'। প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করে আসাম সরকারের মন্ত্রিত্বের পদ অলঙ্কৃত করলেও মহীতোষ পুরকায়স্থ (১৯১৯-১৯৯৩) ও গোলাম ওসমানী এককালে সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত হয়ে বাংলা গদ্যচর্চা করেছেন।

বরাক উপত্যকার ইতিহাস-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ উপেন্দ্রচন্দ্র গুহের 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' ঢাকা থেকে ১৯২১ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থটি নতুন আকারে ১৯৭১ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

শিলচর গুরুচরণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক দেবব্রত দত্ত কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। আঞ্চলিক ইতিহাসই তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। তাঁর প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে 'কাছাড়ের প্রস্তরলিপি' (১৯৫৭) এবং 'শিলচর পৌরসভার ইতিহাস' (১৯৮২)।

সাংবাদিক পরিতোষ পাল চৌধুরীর 'কাছাড়ের কান্না' প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে।

ক্ষিতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী ছিলেন শিলচরের কাছাড় কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর 'প্রবন্ধগুচ্ছ' (১৯৭৪) বিভিন্ন বিষয়ক ছটি প্রবন্ধের সংকলন।

ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-) প্রথমে কাছাড় কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা এবং পরে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষতা করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে কলকাতা থেকে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ 'রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ' প্রকাশিত হয়। তাঁর আরেকখানা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ হচ্ছে 'বাংলা গদ্যের আদিপর্ব' (১৯৮৮)। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যকর্মের মধ্যে রয়েছে 'কাছাড়ের জনবিন্যাস' (১৯৮৮)।

সবিতা (দাস) চট্টোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যকারদের নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যকারগণ' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

করিমগঞ্জের রবিজিৎ চৌধুরী (১৯৪০-১৯৯৫) তাঁর শিলঙের প্রবাস জীবনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অরুণাচল প্রদেশের উপজাতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। জ্যোতিরিন্দ্র চৌধুরী ও রবিজিৎ চৌধুরী রচিত 'সুবনসিরির উপজাতি' গ্রন্থটি কলকাতা থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়।

মুক্তি চৌধুরী গুয়াহাটির কটন কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা। তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থের নাম 'ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর।'

জয়ন্তনাথ চৌধুরী (১৯২৭-) অধ্যাপনাসূত্রে প্রায় দুই দশক সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে অতিবাহিত করে অবসরগ্রহণের পর কলকাতায় ফিরে যান। ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ধর্মনগর শহরের অনতিদূরে ঊনকোটি নামক পাহাড়ী গুহার শৈব চিত্রমালাকে অনুসরণ করে বিস্মৃত আঞ্চলিক ইতিহাসকে তিনি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন তাঁর 'আবৃত-ইতিহাস ঊনকোটি' (১৩৭৬) গ্রন্থে।

করিমগঞ্জের রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সুজিৎ চৌধুরী (১৯৩৭-) সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য: কিংবদন্তীর পুনর্বিচার' কলকাতা থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর আরেকখানা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ 'শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস' ১৯৯২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অমলেন্দু ভট্টাচার্যের 'বরাক উপত্যকার বারমাসী গান' (১৯৮৪), কামালুদ্দীন আহমদের 'সংস্কৃতির রং রূপ' (১৯৯০) ও 'বাংলাদেশে সাতদিন'

(১৯৯২), সুবীর করের 'বিদ্রোহকাল ১৮৫৭ ও সুরমা-বরাক উপত্যকা' (১৯৯০), 'অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি: জীবনী ও সাহিত্য' (১৯৯১)।

মিহিরকুমার দেব পুরকায়স্থ রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের লেখক। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ 'অন্যচোখে বিজ্ঞান' (১৯৮৩) বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। তাঁর সম্পাদনায় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান বিজ্ঞান তরঙ্গ' (১৯৮০-১৯৮৫) এই অঞ্চলের অন্যতম বিজ্ঞান-পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮০) মূলত কবি ও গীতিকার হলেও একাঙ্ক নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ফাউন্ডেশন ডে' (একাঙ্কিকা, ১৯৫০), 'ঠাকুরদাদার আসর' (প্রহসন, ১৯৬১) এবং 'বিচার' (নাট্যকাব্য, ১৯৬৩)। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রথম জীবনে শিলচরের গুরুচরণ কলেজ ও কাছাড় কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। শেষ জীবনে তিনি হাইলাকান্দির লালা রুর‍্যাল কলেজে অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন।

সত্যজ্যোতি ভট্টাচার্য (১৯৩২-) নাট্যকার ও শিশুসাহিত্যিক। প্রথম জীবনে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি আসাম রাজ্যের ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঞ্চালকরূপে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কিচ্ছা ফুরোলেই মিচ্ছা' (১৯৮৯) শিশুপাঠ্য রূপকথার সংকলন। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'নাট্যত্রয়ী' (১৯৯০) তিনটি একাঙ্কিকার সংকলন। তার তৃতীয় গ্রন্থ 'বাংলা ভাষায় শ্রীশ্রীচণ্ডী' (১৯৯৩) মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ। তাঁর রচিত কিছু ছোটগল্প 'মন মাঝি' ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করেনি।

জীবনীগ্রন্থ ও আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দেন আলোচ্য কালপর্বে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবাসী সাহিত্যিক। শ্রীহট্ট জেলার কৌড়িয়া পরগণার বদরমালা গ্রামের শরচ্চন্দ্র দাসের পুত্র রমেশ দাস (১৯০০-) ১৯২৩ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ করে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য নামে পরিচিতি লাভকরেন। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন পরিক্রমা' ১৯৭৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনী ছাড়া তিনি কয়েকখানা জীবনীগ্রন্থেরও রচয়িতা। তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থের তালিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীসারদানন্দ প্রসঙ্গ' (১৩৪২), 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' (১৯৩৭/১৩৪৪), 'ছোটদের শ্রীসারদাদেবী' (১৩৫৪), 'বাংলার দুই ঠাকুর' (১৩৫৬), 'শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল' (১৩৫৮), 'স্বামী সারদানন্দের জীবনী' (১৩৬২), 'ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা' (১৯৬২/১৩৬৯), 'প্রেমানন্দ প্রেমকথা' (১৩৭৩) ও 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৩৭৮)। তাঁর রচিত আরেকখানা গ্রন্থ হচ্ছে 'বাঙ্গলার তীর্থ' (১৩৬২)।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (১৮৮২-১৯৭২) ছিলেন শ্রীহট্ট শহরের মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। দেশবিভাগের পর তিনি পূর্বপাকিস্তানেই থেকে যান। ১৯৬২ সালে তিনি কলকাতায় পদার্পণ করেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। তাঁর জীবনের শেষ দশক এখানেই অতিবাহিত হয়। তাঁর স্বহস্তলিখিত জীবনকথার পাণ্ডুলিপি 'বাংলার পূর্বসীমান্তে অর্ধশতাব্দী' তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে পরিমার্জিত কলেবরে 'স্মৃতি ও প্রতীতি' নামে কলকাতা থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়।

অচ্যুতচরণ চৌধুরীর অমুদ্রিত আত্মজীবনী এবং বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর' (১৩৬২) ছেড়ে দিলে আরও কয়েকখানা আত্মজীবনী পুস্তকাকারে কিংবা সাময়িকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে। এ-জাতীয় কয়েকটি রচনা হচ্ছে শশীন্দ্রকুমার সিংহের 'স্মৃতিকথা' (১৯২১), নগেন্দ্রনাথ দত্তের 'শ্রীভূমির স্মৃতিকথা' ও সতীন্দ্রনাথ নন্দীর 'অখণ্ড শ্রীভূমির স্মৃতিকথা' (১৩৫৭)। কৃষক আন্দোলনের নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী যজ্ঞেশ্বর দাস এবং করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য 'যুগশক্তি' পত্রিকায় তাঁদের স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন।

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত লোকসঙ্গীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯২২-১৯৮৭) শ্রীহট্ট জেলার মিরাশী গ্রামের সন্তান। ১৯৯০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী 'উজান গাঙ বাইয়া'।

শ্রীহট্টের দোহালিয়া গ্রামের সন্তান তারিণী চৌধুরী (১৯০৯-১৯৯৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মসূত্রে কলকাতাবাসী হন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে নিয়ে রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য তথ্যভূয়িষ্ঠ বিপুলায়তন জীবনীগ্রন্থের নাম 'সদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ'।

সুনির্মল দত্ত চৌধুরী অরুণাচল প্রদেশের সরকারি কর্মচারী এবং বর্তমানে শিলং প্রবাসী। তিনি আঞ্চলিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু গবেষক। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'গঙ্গা থেকে সুরমা' কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

জন্মস্থান হবিগঞ্জ হলেও শিবসাধন ভট্টাচার্য (১৯২৭-) বিভাগোত্তরকালে কর্মসূত্রে কিছুদিন করিমগঞ্জে অবস্থান করেন। দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের পর তিনি ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ক কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। কলকাতা থেকে 'আধুনিক জ্যোতিষ' নামে তিনি একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় চতুর্দশ শতকের অন্তিম দশক দুটিতে বরাক উপত্যকার বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকা প্রবন্ধসাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এইসকল পত্রপত্রিকার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'লোকায়ত' (১৯৭৩-'৭৪), 'শতক্রতু' (১৯৭৩-'৭৮), 'দিগ্বলয়' (১৯৭৩-), 'ঈশান' (১৯৮৮-), 'সাহিত্য' (১৯৬৮-) ও 'অক্ষরবৃত্ত' (১৯৯০-)। শেষোক্ত পত্রিকাদুটিকে বরাক উপত্যকার আধুনিক সাহিত্য-চর্চা ও সারস্বত সাধনার যথার্থ প্রতিনিধি বলা যায়।

বরাক উপত্যকার সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য নবদিগন্তের সন্ধানী। কলকাতার নাগরিক জীবনের জটিলতা ও যান্ত্রিকতা থেকে অনেকখানি মুক্ত বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য আঞ্চলিক হয়েও বিশ্বজনীন। স্বাধীনতা-পূর্ব সুরমা উপত্যকার অচ্ছেদ্য অঙ্গ আজকের বরাক উপত্যকা রাজনৈতিক চক্রান্ত আর অঙ্গচ্ছেদের দুরপনেয় কলঙ্ক বুকে নিয়ে তার অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি কামনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কাছে আত্মসমর্পিত। সাহিত্য তার সংগ্রামের সখা, তার সূর্যতপা প্রাণবীজ, তার আত্মার দর্পণ।

বরাক উপত্যকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

এ কে মতীন আহমেদ বরলস্কর
অতীন দাশ

ভূমিকা

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের নির্বাহী পর্ষদের এক সভা সম্মেলনের সভাপতি নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৯৯২ ইংরেজির নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে শতাব্দী বরণ উৎসব পালনের কর্মসূচি মতে বিগত বঙ্গীয় শতাব্দীর একটি প্রামাণ্য ঘটনাপঞ্জী প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বরাক উপত্যকার ২৩ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ নিয়ে নির্বাহী পর্ষদের বর্ধিত সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী ২৪ নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে শিলচর পাবলিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্বাহী পর্ষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে পয়লা বৈশাখ ১৪০০ সালে পঞ্চদশ বঙ্গীয় শতকের বরণোৎসব উপলক্ষে চতুর্দশ শতকের বরাক উপত্যকার একটি প্রামাণ্য ঘটনাপঞ্জী প্রকাশার্থে প্রয়োজনীয় ও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর একটি অঙ্গ হিসেবে 'সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা' সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন দাশের উপর। এরই প্রেক্ষাপটে একখানা প্রেস বিজ্ঞপ্তিও বরাকের পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে বিভিন্ন বিষয়ে ঘটনাপঞ্জী সম্পর্কে জ্ঞাত ও সংগৃহীত তথ্যাদি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করার জন্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

যাইহোক এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য আমাদের কাছে প্রেরণ করে সহায়তা করার জন্য আমরাও বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সুধী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বার বার অনুরোধ জ্ঞাপন করি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে উৎসাহব্যঞ্জক কোনও সাড়া মেলেনি। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিজিৎ চৌধুরী আমার বুড়ীবাইল গ্রামের বাড়িতে বিগত ১৯৯৩ ইংরেজির ৫ এপ্রিল এক সভা আহ্বান করেন। সভায় তথ্য বিনিময় ও তথ্য সংগ্রহের কাজ বেশ অগ্রসর হয়।

আমি বরাকের সাময়িকীসমূহের তথ্যও লিপিবদ্ধ করেছিলাম কিন্তু ঐ কোষগ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে ওইগুলো সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হবে তাই আমি এ ব্যাপারে অগ্রসর হইনি।

বিগত একটি শতাব্দীর বরাক উপত্যকার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা যে কত সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ ব্যাপার তা অবশ্যই বিদগ্ধ পাঠকমহল ও সুধী সমাজ স্বীকার করবেন। আমি অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও নানাভাবে অনুসন্ধান, চেষ্টা ও বহু প্রাচীন তথ্যাদি ঘেঁটে যতটুকু সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি তা লিপিবদ্ধ করে আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। যদি আমার অজ্ঞাতসারে ও সংশ্লিষ্ট মহলের নির্বিকার থাকার দরুন প্রয়োজনীয় কোনও ধরনের তথ্যাদির সংযোজন না হয়ে থাকে তারজন্য আমার বিশ্বাস যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ অভাজনকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

বরাক উপত্যকার পত্রপত্রিকা

শিলচর : প্রথম প্রকাশ ১৮৯২ সালে। সম্পাদনা করতেন শিলচর নরসিং স্কুলের শিক্ষক বিধুভূষণ সেন। বিধুবাবু একজন নির্ভীক ব্যক্তি হিসেবে বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত ছিলেন। শিলচর পত্রিকা ছিল কাছাড়ের প্রথম সংবাদপত্র। তা কতদিন স্থায়ী ছিল বা প্রকাশিত হয়েছিল তার নির্দিষ্ট কোনও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি।

সুরমা : সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকা ছিল কাছাড়ের অন্যতম প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র। ১৯১৩ ইংরেজিতে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব দীর্ঘকাল সুরমার সম্পাদনা করে তার প্রসার ও প্রচারে অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তারপর চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, সুসাহিত্যিক নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের সম্পাদনায় 'সুরমা' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে প্রাক-স্বাধীনতাকালে দেশে জনমত গঠনে বিশেষ অবদান রাখে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের এক সঙ্কটময় সময়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক হুরমত আলি বড়লস্কর সাহিত্যরত্ন সাহেবের সুদক্ষ সম্পাদনায় পত্রিকাটি সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংবাদিক জগতে বলিষ্ঠতার ছাপ রেখে গেছে। তারপর সুলেখক ও আইনবিদ পরেশচন্দ্র চৌধুরী, বিজয়কুমার দে ও বাদল সোম সুরমা-র সম্পাদনা করেন। বর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ। শিলচরের এরিয়েন প্রেস ছিল পত্রিকার মুদ্রণালয়।

কাছাড় : ১৯৩২ ইংরেজিতে 'কাছাড়' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। মুদ্রিত হত শিলচর প্রেস থেকে। স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা সতীন্দ্রমোহন দেব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দুবছর পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন। পত্রিকাটি এখন বিলুপ্ত।

সপ্তক : প্রয়াত জননেতা অরুণকুমার চন্দ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শিলচর জয়ন্তী প্রেস থেকে অধ্যাপক কুশীমোহন দাসের সম্পাদনায় 'সপ্তক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৩৮ ইংরেজি থেকে প্রকাশনা শুরু হয়। সপ্তক পত্রিকা একটি ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্রের ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছিল। সপ্তক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদবাণীপুষ্ট ছিল। কয়েক বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, কেননা পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠী নানাভাবে ব্যস্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত পত্রিকার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদর্শনে অসমর্থ হন।

আজাদ হিন্দ : ১৯৪৮ ইংরেজিতে শিলচর সাধ্য প্রেস থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদনা করতেন জাতীয়তাবাদী যুব নেতা মুদাচ্ছির আহমদ লস্কর। কয়েক মাস চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিক : কাছাড় চা শ্রমিক ইউনিয়নের মুখপত্র ১৯৫০ ইংরেজিতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে 'শ্রমিক' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদনা করতেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তেজস্বী দেশসেবক মহীতোষ পুরকায়স্থ। ১৯৫৪ ইংরেজিতে শ্রীভূমির কৃতবিদ্য সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত দুর্গাপদ দাস পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ইংরেজিতে তরুণ লেখক এ কে মতীন আহমদ বড়লস্কর-এর সহকারী সম্পাদনায় নিয়োজিত হন। কিছুকাল তারক দাস রায় সম্পাদক ছিলেন। বর্তমান সম্পাদক শিবপ্রসাদ বৈদ্য।

আজাদ : কৃতবিদ্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রয়াত হুরমত আলি বড়লস্করের সম্পাদনায় ১৯৫১ ইংরেজির ২৬ জানুয়ারি 'আজাদ' আত্মপ্রকাশ করে। শিলচর কাছাড় প্রেসে পত্রিকাটি

ছাপা হত। কয়েক মাস চলার পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬১ ইংরেজির ২৬ জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটি বড়লস্কর সাহেবের সম্পাদনায় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৮৫ ইংরেজিতে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালে তিনি নিজস্ব মালিকানায় 'আজাদ' প্রেস স্থাপন করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। ওই সময় থেকে তাঁর একমাত্র পুত্র এ কে মতীন আহমদ বড়লস্কর পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'আজাদ' সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল। ১৯৮৩ ইংরেজিতে সম্পাদক বড়লস্কর সাহেব অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন এবং এ কে মতীন আহমদ বড়লস্কর প্রয়াত পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে পত্রিকাটির সম্পাদনা করতে থাকেন। ১৯৮৫ সালে মতীন সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত থাকার দরুন ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

অরুণোদয় : শিলচরের তরুণ ছাত্রনেতা ও সংগঠক সুনীল কুমার দত্তরায়ের সম্পাদনায় ১৯৫০ ইংরেজিতে 'অরুণোদয়' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুনীলবাবু অরুণোদয়ের সম্পাদনা করেন। সুনীল দত্তরায় খুব আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সম্পাদক ছিলেন তাই পত্রিকাটি কখনো আদর্শচ্যুত হয়নি। তিনি নিজে অরুণোদয় প্রেস প্রতিষ্ঠা করে নির্ভীকভাবে পত্রিকার সম্পাদনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাহেতু ১৯৯১ ইংরেজিতে সুনীল দত্তরায় পত্রিকা সম্পাদনা থেকে অব্যাহতি নেন। বর্তমানে চন্দন সেনগুপ্ত অরুণোদয়ের সম্পাদনা করছেন।

মুক্তিপ্রদীপ : ১৯৪৮ সালে 'মুক্তিপ্রদীপ' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে বৈদ্যনাথ নাথের সম্পাদনায় শিলচরের মডার্ন প্রেস থেকে আত্মপ্রকাশ করে। কিছুকাল চলার পর পত্রিকাটির বিলুপ্তি ঘটে।

যুগশঙ্খ : ১৯৫৯ ইংরেজিতে মুক্তিপ্রদীপের সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বৈদ্যনাথ নাথের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক যুগশঙ্খ পত্রিকা বের হয়। এর প্রকাশনার দায়িত্বে ছিল মডার্ন প্রেস। বৈদ্যনাথবাবু কৃতিত্বের সঙ্গে বহু সংকট ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটি চালিয়ে যান। ১৯৭০ ইংরেজিতে বৈদ্যনাথবাবু অকালে পরলোকগামী হওয়ায় তাঁর পুত্র বিজয়কৃষ্ণ নাথ যুগশঙ্খ-এর সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ফরিয়াদ : ১৯৪৮ ইংরেজিতে মরহুম জলালউদ্দীন আহমদ বড়লস্করের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'ফরিয়াদ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বড়লস্কর সাহেব শিলচর নরসিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি পত্রিকাটি কয়েক বছর সম্পাদনা করেন। পরে তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক সম্পাদক হিসেবে জলালউদ্দীন সাহেব সুপরিচিত ছিলেন।

পূর্বাচল : ১৯৫০ ইংরেজিতে প্রবীণ সাংবাদিক সুবোধচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। সুবোধবাবু কঠোর আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী বিশেষভাবে বলিষ্ঠ ভাষার সম্পাদকীয় পাঠক মহলের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বলিষ্ঠ ভাষায় সম্পাদনার দরুন পূর্বাচল অনেকের বিশেষভাবে সরকারের বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। পরে বয়োবৃদ্ধ সম্পাদকের পক্ষে পত্রিকা পরিচালনা দুষ্কর হয়ে পড়ে এবং প্রকাশনার বিলুপ্তি ঘটে।

যুগশক্তি : এই পত্রিকা পূর্বে সিলেট থেকে বের হত। দেশ বিভাগের পর সুযোগ্য সম্পাদক বিধুভূষণ চৌধুরী এর মালিকানা নিয়ে করিমগঞ্জ এসে পত্রিকাটি বের করেন। বিধুবাবুর সম্পাদনায় যুগশক্তি করিমগঞ্জ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি ছিলেন আদর্শবাদী ও দৃঢ়চেতা সাংবাদিক। নিয়মিত প্রকাশিত ও নির্ভীক সংবাদপত্র হিসেবে যুগশক্তি সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল

ও পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৮১ ইংরেজিতে শিলচর শহর থেকে বৃহদাকারের যুগশক্তি দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশনা আরম্ভ করেছিল কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে সমরজিৎ চৌধুরীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক যুগশক্তি করিমগঞ্জ থেকে নিয়মিত বের হচ্ছে। বজায় রাখছে তার অতীত ঐতিহ্য ও আদর্শ।

জনশক্তি : দেশ বিভাগের পর সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক জনশক্তি ১৯২৩ সালে শিলচর শহর থেকে পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। উল্লেখ্য যে প্রয়াত বিনোদবিহারী চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১৯৫৫ সালে নব পর্যায়ে সিলেট থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয় এবং সংবাদপত্র জগতে গৌরবের আসন অলংকৃত করে দায়িত্ব পালন করে গেছে। জনশক্তির মুদ্রণালয় শক্তি প্রেসও শিলচরে স্থানান্তরিত হয় এবং নিস্তারণ গুপ্তের সম্পাদনায় 'জনশক্তি' পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। দীর্ঘ কয়েক বছর চলার পর জনশক্তি-র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং নিস্তারণবাবুও পরলোকগমন করেন। গত দুবছর থেকে নিস্তারণবাবুর পুত্র মঞ্জু গুপ্তের সম্পাদনায় 'জনশক্তি' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু প্রকাশনা অনিয়মিত বলা চলে।

কাছাড় : হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত হয়। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সন্তোষকুমার রায় দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সঙ্গে কাছাড় পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন। তখন ওই পত্রিকার ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ ও ঐতিহ্য ছিল গৌরবময়। এরপর কামাখ্যা দেব ওই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নবযুগ : পত্রিকাটি পূর্বে সিলেট থেকে বের হত। সম্পাদনা করতেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ রমেশচন্দ্র দাস। তার আগে তিনি সিলেট থেকে 'সুরমা উপত্যকা' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। দেশ বিভাগের পর রমেশবাবু করিমগঞ্জ থেকে নবযুগের প্রকাশনা শুরু করে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পত্রিকা চালিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র রাহুল দাস নবযুগ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কাছাড় সমাচার : সত্তরের দশকে প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বিনয়েন্দ্রকুমার চৌধুরী 'কাছাড় সমাচার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শিলচর থেকে বের করেন। পত্রিকার পদচারণা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

অধিকার : বিশিষ্ট দেশসেবক অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় অধিকার পত্রিকা শিলচর থেকে ১৯৫০ ইংরেজিতে প্রকাশনা আরম্ভ করে। নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতা ওই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল। কিছুকাল চলার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

আলোক : জনসেবক যতীন্দ্রমোহন বড়ভূইয়ার সম্পাদনায় আলোক পত্রিকা ষাটের দশকে শিলচরে প্রকাশিত হতে থাকে। যতীন্দ্রবাবুর সুসম্পাদনায় অল্পকালের মধ্যে পত্রিকাটি সংবাদপত্র জগতে স্বীয় আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। শেষদিকে যতীন্দ্রবাবু রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং পরে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই কারণে তিনি পত্রিকার প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ দিতে পারেননি। পরে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। যতীন্দ্রবাবু অকালে পরলোকগমন করেন।

প্রান্তীয় সমাচার : ১৯৬৪ ইংরেজিতে শিলচর মডার্ন প্রেস থেকে হরেন্দ্রচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক প্রান্তীয় সমাচার আত্মপ্রকাশ করে। প্রবীণ সাংবাদিক আতাউর রহমান খান-এর মালিকানায় ছিলেন। কয়েক বছর পর হরেন্দ্রচন্দ্র সেন পদত্যাগ করেন এবং আতাউর রহমান খান নিজেই সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুলেমান খান ছিলেন সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বে। ১৯৯০ সাল থেকে প্রান্তীয় সমাচার অর্ধ সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। বিধান পুরকায়স্থ এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে বিধান

পুরকায়স্থ পদত্যাগ করলে আতাউর রহমান খান ও তাঁর পুত্র সুলেমান খান প্রান্তীয় সমাচারের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের ভার গ্রহণ করে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

বরাক : বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী ও আইনবিদ এ এফ গোলাম ওসমানির সম্পাদনায় ১৯৬৬ ইংরেজিতে 'বরাক' পত্রিকা শিলচর থেকে বের হয়। ওসমানির প্রগতিশীল লেখনী পত্রিকাটিকে অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয় করে তুলতে সহায়তা করে। ওসমানি সাহেব রাজনীতির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকে পড়ার কারণে পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করেন এবং তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৪ ইংরেজিতে বিশিষ্ট লেখক অতীন দাশ পত্রিকার মালিকানা ক্রয় করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বরাকের সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। অর্ধ-সাপ্তাহিক বরাক অতীনবাবুর সম্পাদনায় অধুনা উচ্চমানের পত্রিকা হিসেবে আসন লাভে সমর্থ হয়েছে।

দৃষ্টিপাত : সমাজসেবী দক্ষিণারঞ্জন দেবের সম্পাদনায় করিমগঞ্জ থেকে ১৯৬৩ ইংরেজিতে সাপ্তাহিক দৃষ্টিপাত পত্রিকা বের হয়। পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'মদু ও হুল' কলামের মন্তব্য ও বিশ্ব বিচিত্রা কলামে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তুর প্রকাশ। ভূপেন্দ্রকুমার সিংহ বর্তমানে দৃষ্টিপাত পত্রিকার সম্পাদনায় রয়েছেন। তার একটি সংস্করণ যুগপৎ হাফলং থেকে বনানী কেন্দ্রাইয়ের সম্পাদনায় ডিমাসা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।

রূপান্তর : পরিতোষ পালচৌধুরী ১৯৬৪ ইংরেজিতে এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবে শিলচর থেকে প্রকাশ করেন। পরিতোষবাবু যদিও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন লেখক ছিলেন কিন্তু তাঁর সম্পাদিত রূপান্তর পত্রিকা দীর্ঘজীবী হতে পারেনি। অর্থনৈতিক কারণই বোধহয় পত্রিকা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

মাতৃভূমি : একটি উন্নতমানের ছাপাখানা স্থাপন করে শিলচরের জননেতা নন্দকিশোর সিংহ ১৯৭০ ইংরেজিতে নিজস্ব সম্পাদনায় সাপ্তাহিক মাতৃভূমি পত্রিকা প্রকাশ করেন। নানা কারণে তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকা পরিচালনায় সমর্থ হননি। ১৯৭৯ ইংরেজিতে পরিতোষ পালচৌধুরী মাতৃভূমির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও বর্তমানে এর প্রকাশনা অনিয়মিত।

শপথ : সুলেখক কমলেন্দু ভট্টাচার্য শিলচর থেকে সাপ্তাহিক 'শপথ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শপথ পত্রিকা সাম্প্রদায়িকতার কট্টর সমালোচক ছিল। পরে কমলেন্দু ভট্টাচার্য ও অতীন দাশ যুগ্মভাবে পত্রিকাটিকে দৈনিকে রূপায়িত করেন। অবশেষে সম্পাদক চিরদিনের মত শিলচর পরিত্যাগ করে কলকাতা চলে যাওয়ায় পত্রিকার মালিকানা বিক্রি করে দেন।

ফ্রন্টিয়ার সান : প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাংবাদিক জ্যোতির্ময় সেন স্বীয় সম্পাদনায় শিলচর থেকে 'The Frontier Sun' নামক একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি পত্রিকা চালিয়ে যেতে থাকেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে সমর্থ হননি। পরিশেষে বাধ্য হয়ে মালিকানা হস্তান্তর করেন। বর্তমানে 'ফ্রন্টিয়ার সান' দৈনিক হিসেবে শিলচর থেকে বেরোচ্ছে। সম্পাদনা করছেন রণবীর রায়।

সেনাপতি : করিমগঞ্জ শহর থেকে মইনুল হক চৌধুরীর সম্পাদনায় সেনাপতি নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। মইনুল সাহেব ঐকান্তিকতার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করে চলেন। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং অন্যান্য কারণে বর্তমানে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ।

পূর্বশ্রী : সাহিত্যপ্রেমী দ্বীপেন্দ্রকুমার দাসের সম্পাদনায় নিজস্ব ছাপাখানায় ষাটের দশকে শিলচর

থেকে সাপ্তাহিক পূর্বর্তী পত্রিকা বের হয়। প্রকাশনা অনিয়মিত ছিল। বর্তমানে এর প্রকাশনা বন্ধ।

সাময়িক প্রসঙ্গ : প্রগতিপন্থী সুলেখক তৈমুর রাজা চৌধুরী ১৯৭৭ ইংরেজিতে পাক্ষিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকা শিলচর থেকে প্রকাশ করেন। নতুনত্ব ও নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনে পত্রিকাটি কাছাড়ের সংবাদপত্র জগতে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়। তারপর তৈমুর রাজা চৌধুরী পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত করেন এবং প্রকাশ করতে থাকেন নিজস্ব ছাপাখানায়। সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকাটির বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিয়মিত প্রকাশনা এবং সংবাদ ও সময়োপযোগী সাময়িকী পরিবেশনে কৃতিত্বের দাবিদার এবং জনপ্রিয় হতে থাকে। বর্তমানে সাময়িক প্রসঙ্গ অভিজাত পত্রিকা হিসেবে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার আসনে অধিষ্ঠিত। অসাম্প্রদায়িক ও গঠনমূলক সমালোচক হিসেবে সাময়িক প্রসঙ্গ বিদগ্ধমহলে রীতিমত জনপ্রিয়তার আসন লাভে সমর্থ হয়েছে।

পূর্বায়ন : বিশিষ্ট সাহিত্যিক শক্তিধর চৌধুরী ১৯৬৯ ইংরেজিতে হাইলাকান্দি থেকে সাপ্তাহিক পূর্বায়ন পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সাংবাদিকতার মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সুদক্ষ সম্পাদনার সঙ্গে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

অগ্নিবান : সম্পাদক ছিলেন হরিপদ দে। করিমগঞ্জ শহর থেকে সত্তর দশকের শেষ দিকে বের হয়। বিশেষ একটি দলের মুখপত্র হিসেবে প্রচারকার্য চালিয়ে গেছে। বর্তমানে প্রকাশনা বন্ধ।

ধলেশ্বরী : সাপ্তাহিক ধলেশ্বরী ষাটের দশকে হাইলাকান্দি থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সমাজসেবী ননীগোপাল দে এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকার প্রকাশনা নিয়মিত ছিল না। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পত্রিকাকে যথারীতি চালিয়ে যেতে সম্পাদকের আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

নয়া কাছাড় : কমিউনিস্ট কর্মী শৈলেশ কর পুরকায়স্থের সম্পাদনায় শিলচর থেকে সাপ্তাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অধিকার পত্রিকার পর নয়া কাছাড় এক দলীয় মুখপত্র হিসেবে কাজ করার ভূমিকা গ্রহণ করলেও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। সম্পাদক পরলোকগামী হয়েছেন। তাঁর জীবিতাবস্থায় পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

কাছাড় ট্রিবিউন : সত্তরের দশকে তরুণ লেখক উজ্জ্বলকুমার দাসের সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে সাপ্তাহিক 'Cachar Tribune' আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক উজ্জ্বল দাস নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করে যেতে কার্পণ্য করেননি।

হুঁশিয়ার : শিলচর কনকপুরবাসী মুসলিম উদ্দিন বড়লস্করের সম্পাদনায় সত্তরের দশকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে হুঁশিয়ার শিলচর থেকে বের হয়। পত্রিকাটির স্থায়িত্বের জন্য সম্পাদক সাহেব আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রাখলেও বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেননি।

মহানায়ক : জননেতা নৃপতিরঞ্জন চৌধুরীর সম্পাদনায় মহানায়ক ১৯৭১ ইংরেজিতে করিমগঞ্জ থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রান্তজ্যোতি : প্রথম পর্যায়ে তা সাপ্তাহিক জ্যোতি রূপে শিলচর থেকে বেরিয়েছিল পরে তা প্রান্তজ্যোতি নামধারণ করে। সম্পাদিকা ছিলেন নিভাননী দত্ত। তারপর পত্রিকাটি 'দৈনিক প্রান্তজ্যোতি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বরাক উপত্যকার পাঠক মহলের দৈনিক পত্রিকার চাহিদার কিয়দংশ পূরণ করে চলে। অবশ্য সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রচন্দ্র দত্ত সাপ্তাহিক প্রান্তজ্যোতির প্রকাশও অব্যাহত রেখেছিলেন। সংবাদাদি ছাড়াও দৈনিক প্রান্তজ্যোতি প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সেবার কাজেও ব্রতী রয়েছে।

নবারুণ : দেশকর্মী সুরঞ্জন নন্দীর সম্পাদনায় ১৯৭৪ সালে সাপ্তাহিক নবারুণ পত্রিকা করিমগঞ্জ থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক সুরঞ্জন নন্দী রাজনৈতিক কাজ-কর্ম ও সমাজসেবায় বেশি মনোনিবেশ করায় পত্রিকার প্রতি সর্বক্ষণ নজরদারি করতে অপারগ হয়ে পড়ায় তাঁর পত্নী ইলা নন্দী নবারুণের সম্পাদনা করে যান।

গতি : ১৯৬৬ ইংরেজিতে শিলচর থেকে সাপ্তাহিক 'গতি' পত্রিকা নিজস্ব হেমলতা প্রেসে যতীন দেবরায়ের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা পরিচালনায় ও সাংবাদিকতায় নিষ্ঠা ও একাগ্রতার জন্য গতির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংবাদ পরিবেশনে নৈপুণ্য গতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৮৪ ইংরেজিতে 'গতি' দৈনিক পত্রিকায় রূপায়িত হয়। দৈনিক গতি জোর কদমে পূর্বাঞ্চলবাসী মানুষের দৈনিক পত্রিকার চাহিদা পূরণে কিছুটা সাফল্য লাভকরে। সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত গতি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ ব্যতিরেকেও উচ্চমানের প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিক জগতের যাত্রাপথে গতির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

ডালিম : ১৯৭৮ ইংরেজিতে হাইলাকান্দি শহর থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রূপে বের হয়। জন্মাবধি জওয়াদুর রহমান মজুমদার নিষ্ঠার সঙ্গে ডালিমের সম্পাদনা করছেন। পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদের আদর্শে অটুট থেকে বরাক উপত্যকার পাঠকমহল ও জনগণের সেবায় ব্রতী রয়েছে।

ডংকা : করিমগঞ্জ শহর থেকে ষাটের দশকে পত্রিকাটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কুপেশরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন ডংকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

তীর্থভূমি : বিশিষ্ট সমাজসেবী সতু রায়ের সম্পাদনায় তীর্থভূমি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে করিমগঞ্জ শহর থেকে আত্মপ্রকাশ করে।

এই তো স্বদেশ : শিলচর থেকে তরুণ লেখক তাজউদ্দিন বড়ভূইয়ার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সম্পাদক পত্রিকা চালিয়ে যেতে থাকেন কিন্তু পরে বন্ধ হয়ে যায়। সোনাবাড়িঘাটে নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপন করে বড়ভূইয়া সাহেব এই তো স্বদেশের পুনঃপ্রকাশ করেছেন। বর্তমানে তা অর্ধ সাপ্তাহিক হিসেবে নিয়মিত বেরোচ্ছে।

সোনার কাছাড় : ১৯৭৮ ইংরেজিতে শিলচরে ভানু রায়ের সম্পাদনায় সোনার কাছাড় সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সংবাদপত্র ও পরিচালনা সাংবাদিকতার প্রবল উৎসাহ নিয়ে সম্পাদক ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ সোনার কাছাড়ের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। পরে সোনার কাছাড় দৈনিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে এতদঞ্চলের মানুষের দৈনিক সংবাদপত্রের চাহিদা পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। সোনার কাছাড়ে সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও চিন্তাশীল প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে থাকে। দৈনিক সোনার কাছাড় পত্রিকার অগ্রগতি চলছে।

দিবাকর : ১৯৮০ ইংরেজিতে হাইলাকান্দির লালা উপশহর থেকে তরুণ সাংবাদিক আবুল কালাম মজুমদার সাপ্তাহিক দিবাকর পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংবাদ পরিবেশনে নিপুণতা ও তরুণদের সাংবাদিকতায় উৎসাহ প্রদানের ব্যাপারে সাপ্তাহিক দিবাকরের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করা চলে। মজুমদার সরকারি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করায় তাঁর পত্নী আলেয়া মজুমদার পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন। দিবাকর হাইলাকান্দি জেলা থেকে প্রকাশিত নিয়মিত পত্রিকা।

উমাচল : সাহিত্যপ্রেমী ইমাদ উদ্দিন বুলবুল উমাচল নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যসেবার প্রতি সম্পাদকের অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতার দরুন উমাচল কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়।

ঘর্ঘর : করিমগঞ্জ শহর থেকে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন অশোককুমার ভট্টাচার্য। তিনি অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতার পূত দায়িত্ব পালন করেছেন বলিষ্ঠ পত্রিকা ঘর্ঘর-এর মাধ্যমে।

সংহতি : আশির দশকে বড়খলার রসেন্দ্র শর্মা মজুমদারের সম্পাদনায় শিলচর থেকে সাপ্তাহিক সংহতি নামক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলিষ্ঠ ও উদার। শর্মা মজুমদার অনেক চেষ্টা করেও পত্রিকাটিকে দীর্ঘজীবী করতে সক্ষম হননি।

স্বদেশবাণী : প্রয়াত মণিলাল দেব শিলচর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত রংপুর থেকে স্বদেশবাণী পত্রিকা সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন সাংবাদিকতার মান সমুন্নত রেখে সম্পাদক তাঁর পত্রিকা পরিচালনা করে গেছেন। সম্পাদক অকালে পরলোকগামী হন। তাঁর মৃত্যুর পর স্বদেশবাণী আর প্রকাশিত হয়নি।

কাছাড় টাইমস্ : শিলচর থেকে আশির দশকে প্রকাশিত প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন বাংলা সাপ্তাহিক কাছাড় টাইমসের সম্পাদক ছিলেন অভিজ্ঞ সমাজসেবী ভূদেব ভট্টাচার্য। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি নানা প্রতিকূল পরিবেশের দরুন। সম্পাদক কিন্তু সাংবাদিকতায় বলিষ্ঠতার ছাপ রেখেছেন। শিলচরের যুব নেতা দীপন দেওয়ানজি সম্প্রতি এর স্বত্ব ক্রয় করে অর্ধ সাপ্তাহিকরূপে বের করছেন।

মহাকাল : হাইলাকান্দি শহর থেকে জ্বলন্ত সেনগুপ্ত আশির দশকে মহাকাল নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

সোনার দেশ : শিলচরবাসী তরুণ সাংবাদিক প্রাণগোপাল রায় সাপ্তাহিক সোনার দেশ পত্রিকা স্বীয় সম্পাদনায় প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতার প্রতি অবিচল আস্থাবান সম্পাদক স্বীয় মুদ্রণালয় থাকায় পত্রিকাটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

পূর্ব দিগন্ত : শিলচর শহর থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন হরিকুমার সিং। কিছুকাল চলার পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

অগ্নিবান : শিলচর থেকে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম বেরোয় ১৯৪৯ সালে। সম্পাদনা করতেন সুবিমল এন্দো এবং সহ সম্পাদক ছিলেন মুকুন্দ দাস ভট্টাচার্য। ছাপা হত শিলচর প্রেস থেকে। তিন বছর চলার পর অর্থাৎ ১৯৫২ সালে অগ্নিবান পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

ঈশান কোন : শিলচর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। বর্তমানে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী অমর সিংহ সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন।

আঞ্চলিক বার্তা : বাংলা সাপ্তাহিক। প্রকাশের স্থান শিলচর। সম্পাদক সজলকান্তি বিশ্বাস।

নববার্তা প্রসঙ্গ : ১৯৮৬ ইংরেজিতে করিমগঞ্জ শহর থেকে সাপ্তাহিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসেবে নিয়মিত বেরোচ্ছে। সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন হবিবুর রহমান চৌধুরী। নববার্তা প্রসঙ্গ সংবাদপত্র জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

প্রবাহ : বদরপুর থেকে কফিল আহমদের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

আসাম দর্পণ : বাংলা সাপ্তাহিক। প্রকাশস্থল শিলচর। সম্পাদক দুলাল মিত্র। পত্রিকাটির দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল। সম্পাদনায় দক্ষতার ছাপ রয়েছে।

সাময়িক উপহার : শিলচর থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক। সম্পাদনা করছেন স্বপনকুমার দেব।

প্রান্তরেখা : বাংলা সাপ্তাহিক। শিলচর হচ্ছে প্রকাশস্থল। সম্পাদনার গুরু দায়িত্বে রয়েছেন বিমানবিহারী দেব।

অঙ্কুশ : পাক্ষিক পত্রিকা। ১৯৭৫ ইংরেজিতে আত্মপ্রকাশ করে শিলচর থেকে। বিশিষ্ট লেখক অতীন দাশ অঙ্কুশের সম্পাদনা করেছেন।

গণসূর্য্য : শিলচর শহর থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে। ১৯৮৪ ইংরেজিতে গণসূর্য্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদনা করেছেন চন্দন ঘোষ।

কুশিয়ারা : বাংলা সাপ্তাহিক। বের হয় করিমগঞ্জ শহর থেকে। সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন রামকৃষ্ণ বণিক।

আনন্দজ্যোতি : প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৩ ইংরেজিতে, করিমগঞ্জ থেকে। সম্পাদনা করেছেন বিশিষ্ট দেশসেবী জিতেন্দ্রলাল গোস্বামী। আনন্দজ্যোতি বর্তমানে বন্ধ। প্রবীণ সম্পাদকও আর ইহজগতে নেই।

কাছাড় লিপিকা : শিলচর থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক। সম্পাদনা করছেন মিতু ভট্টাচার্য।

আগামী শতাব্দী : বাংলা সাপ্তাহিক রূপে শিলচর থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন উমা রায়।

বার্তালিপি : বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। শিলচর থেকে প্রথম প্রকাশ আশির দশকে। সম্পাদনার দায়িত্বে ব্রতী রয়েছেন সনৎকুমার কৈরী।

পল্লীবাণী : সোনাই থেকে পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন জয়নুল হক মজুমদার।

শিবায়ণ : সাপ্তাহিক পত্রিকা। শিলচর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনার গুরু দায়িত্বে ছিলেন নির্মলেন্দু পালচৌধুরী।

যুববাণী : পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদনা করেছেন কে দাহার আহমেদ মজুমদার। শিলচর শহর থেকে প্রকাশিত।

বরাক দর্পণ : ১৯৮৬ ইংরেজিতে শিলচর শহর থেকে সাপ্তাহিক বরাক দর্পণ পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদিকা বাবলী অধিকারী। প্রহ্লাদ প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত হচ্ছে। সম্পাদনায় বলিষ্ঠতার ছাপ প্রত্যক্ষ করা গেছে।

বরাক প্রবাহ : শিলচর শহর থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশনা আরম্ভ করে। সম্পাদনা করতেন দেশবন্ধু সিংহ।

তৃর্ষ : শিলচর থেকে সমীরকুমার দেবের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে যাত্রাপথে পদচারণা আরম্ভ করে।

মৈত্রীবাণী : ১৯৮৯ ইংরেজিতে শিলচর মালুগ্রাম থেকে পাক্ষিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মুখ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজকুমার দাস এবং সম্পাদকমণ্ডলীতে রয়েছেন পুষ্পরঞ্জন গুপ্ত, চন্দন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিলাল চৌধুরী। নির্দলীয় সংবাদ পাক্ষিক হিসেবে পারস্পরিক মৈত্রী ও সংহতি রক্ষার ভূমিকা পালনে ও শোষণমুক্ত বিকেন্দ্রিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মৈত্রীবাণী স্বীয় নামের স্বার্থকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলেছে।

ধনুর্বাণ : বাংলা সাপ্তাহিক। মুদ্রিত হয় শিলচর শহরে। কর্মস্থল শিলচরের উপকণ্ঠ বেরেঙ্গায়। সম্পাদনা করতেন কল্যাণ দাস।

জনমন : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থেকে বের হচ্ছে, ১৯৯২ সাল থেকে। সম্পাদনা করছেন মাহবুব হাসান।

জাগো : পাক্ষিক সংবাদপত্র। শিলচর থেকে প্রথম প্রকাশ। সম্পাদনা করতেন অতীন দাশ, জহর ভট্টাচার্য ও স্বদেশ বিশ্বাস।

বর্তমান : সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম। একজন কবি হিসেবে তাঁর বিপুল খ্যাতি ছিল।

মুক্তিনায়ক : অখিলবন্ধু চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বের হত। অখিলবাবু ছিলেন একজন শক্তিশালী লেখক।

নবদিগন্ত : সাপ্তাহিক হিসেবে শিলচর থেকে ১৯৭০ সালে বের হয়। সম্পাদনা করতেন বেরেঙ্গাবাসী আব্দুল মুছব্বির বড়ভূইয়া।

অসমশীর্ষ : সাপ্তাহিক হিসেবে শিলচর থেকে নিয়মিত বেরোচ্ছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক স্বদেশ বিশ্বাস এই পত্রিকার সম্পাদক।

জনমত : সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত হত। সম্পাদক ছিলেন অমূল্যরতন সেনগুপ্ত।

শতভিষা : করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক হিতেন্দু দত্ত।

করিমগঞ্জ সংবাদ : সাপ্তাহিক পত্রিকা। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক আর রায়।

ডাক দিয়ে যাই : সম্পাদক ছিলেন সিরাজ উদ্দিন বড়লস্কর। কাছাড়ের বড়যাত্রাপুর থেকে পাক্ষিকরূপে বের হয়েছিল। বর্তমানে প্রকাশনা বন্ধ।

পল্লীবাণী : সম্পাদক ছিলেন সুবোধচন্দ্র রায়। বর্তমানে লুপ্ত।

মিল্লতের ডাক : সম্পাদক ছিলেন মৌলানা ইলিয়াস আহমদ। ১৯৮৮ ইংরেজিতে ভাঙ্গাবাজার থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

শিলচর টাইমস : শিলচর থেকে প্রকাশিত নবজাত দৈনিক। সাংবাদিক সনৎকুমার কৈরীর সম্পাদনায় ১৯৯৪ সালেই আত্মপ্রকাশ করেছে। ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে।

আমার বরাক : ১৯৯৩ সালে সাপ্তাহিক হিসেবে শিলচর থেকে যাত্রা শুরু করে নিয়মিতভাবে বর্তমানে বেরোচ্ছে। যুব নেতা নীহারেন্দু ধর আমার বরাক পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও স্বত্ত্বাধিকারী।

চ্যালেঞ্জার বার্তা : করিমগঞ্জের একমাত্র ইংরাজি সাপ্তাহিক। নববার্তা প্রকাশনী নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে। শ্রী ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য (অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আমলা) এই পত্রিকার সম্পাদনা করছেন।

ক্রনিকল : দেশ বিভাগের পর শ্রীহট্ট থেকে আগত প্রেমেন্দ্রমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় শিলচর থেকে ক্রনিকল নামে একটি ইংরাজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পর তা বন্ধ হয়ে যায়।

দি ইস্টার্ন গার্ডিয়ান : তরুণ সাংবাদিক শান্তনু ঘোষের সম্পাদনায় সত্তর দশকে ইংরাজী সাপ্তাহিক হিসেবে বেরিয়েছিল। বর্তমানে আর নেই।

নয়া দুনিয়া : করিমগঞ্জ থেকে বেশ কয়েক বছর পূর্বে যজ্ঞেশ্বর দাসের সম্পাদনায় 'নয়া দুনিয়া' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হত। কিছুদিন প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

স্টার : এক সময় কাছাড়ের একমাত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল স্টার। শিক্ষক ও সাংবাদিক মহেন্দুভূষণ দত্ত ছিলেন অন্যতম সম্পাদক।

জাগরণ : সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক জাগরণ বেরোত। কিছুকাল চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

সীমান্তিক : মতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। আয়ু ছিল স্বল্প।

নবশক্তি : নবশক্তি নামক স্বল্পায়ু পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন আশুতোষ কর।

দি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার টাইমস্ : সম্পাদক ছিলেন কালীকৃষ্ণ দেব ক্রোড়ী। কিছুদিন পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

দ্য ভয়েস : হাইলাকান্দি থেকে কুশীরঞ্জন শর্মা পুরকায়স্থের সম্পাদনায় দ্য ভয়েস নামে ইংরাজি সাপ্তাহিক প্রকাশনা শুরু করে। কিন্তু ছ মাস পর বন্ধ হয়ে যায়।

প্রান্তিক : একসময় অমূল্য চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রান্তিক নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা হাইলাকান্দিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বেশিদিন টিঁকে থাকেনি।

জনকল্যাণ : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল জনকল্যাণ নামে একটি সংবাদপত্র বের করেছিলেন। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়।

নবধারা : নবধারা নামক পত্রিকার সম্পাদনা করতেন পূর্ণচন্দ্র পুরকায়স্থ। বেরোত হাইলাকান্দি থেকে।

সজাগ : সাংবাদিক শক্তিধর চৌধুরী হাইলাকান্দি থেকে সজাগ নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

জাগরণী : নৃপেন্দ্র চৌধুরী জাগরণী নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিছুদিন বের করেছিলেন। পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সীমান্তিক : ১৯৫০ ইংরেজির জুন মাসে করিমগঞ্জ থেকে সাপ্তাহিক সীমান্তিক আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন নবকুমার ভট্টাচার্য।

নাগরিক : সুলেখক ললিতমোহন করের সম্পাদনায় করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশনা অনেক আগে থেকেই বন্ধ।

নবায়ণ : হাইলাকান্দি থেকে পাক্ষিক পত্রিকা রূপে বের হত। সম্পাদনা করতেন হরিপ্রসন্ন সেন।

দ্য ইস্টার্ন ক্রনিকল : ১৯১৪ সালে শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ করিমগঞ্জ থেকে দ্য ইস্টার্ন ক্রনিকল প্রকাশ করেন। এর তিনি আগে ১৮৯৯ সালে শ্রীহট্ট থেকে সাপ্তাহিক ক্রনিকল প্রকাশ করেছিলেন।

সাংবাদিকতার জগতে বহির্বরাকের প্রতিনিধিরা : সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার সাংবাদিকদের যথাযোগ্য ও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। অবিভক্ত ভারতের ও বিভক্ত ভারতের বড় বড় নগর থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবরাখবর সরবরাহ এবং প্রকাশ করার কাজে বরাক উপত্যকায় যে সকল সাংবাদিক নিষ্ঠার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে গেছেন সে সম্পর্কিত যতটুকু প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে—

(ক) শিলচরের প্রখ্যাত আইনজীবী স্বর্গীয় উপেন্দ্রশংকর দত্ত কলকাতার অভিজাত ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। স্বনামখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মরহুম হুরমত আলি বড়লস্কর প্রকাশনা লগ্ন থেকে দীর্ঘদিন কলকাতার দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার শিলচরের প্রতিনিধি ছিলেন। অবিভক্ত ভারতে প্রকাশিত কলকাতার মাসিক নওরোজ, সাপ্তাহিক হানাফী, মোহাম্মদী সিলেটের জনশক্তি, যুগভেরী, অভিযান, আলইসলাহ এবং পরবর্তীকালে আনন্দবাজার, যুগান্তর ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অজস্র লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আইনবিদ ও সাংবাদিক স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র চৌধুরী আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকাদ্বয়ের শিলচরস্থ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আইনবিদ ও সুসাহিত্যিক নগেনচন্দ্র শ্যাম ও ধীরেন্দ্রমোহন দেব সাংবাদিক হিসেবে কৃতিত্ব রেখে গেছেন। স্বর্গীয় রায়চান্দ নাথ দৈনিক অসমীয়া পত্রিকার এবং সুনীলমোহন এন্দ ইউ পি আই ও আসাম ট্রিবিউন পত্রিকার প্রতিনিধিত্বে রত ছিলেন। জননেতা প্রয়াত মহীতোষ পুরকায়স্থ বোম্বের ফ্রি প্রেস জার্নাল ও কলকাতার দৈনিক লোকসেবক এবং ইউ পি আইর প্রতিনিধি ছিলেন। এছাড়া আরও বহু পত্র পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য তথ্যভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গীয় রবীন্দ্রকান্ত সেন পি টি আই-এর শিলচরের দীর্ঘকালীন প্রতিনিধি ছিলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রয়াত বিনয়েন্দ্র কুমার চৌধুরী যুগান্তর ও আসাম ট্রিবিউন-এর স্থানীয় প্রতিনিধির দায়িত্ব দীর্ঘকাল পালন করে গেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক অমিতকুমার নাগ দীর্ঘকাল শিলচরে যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকাদ্বয়ের প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষতার নিদর্শন রেখেছেন। বর্তমানে তিনি ওই দুই পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি হিসেবে গুয়াহাটিতে অধিকতর

দায়িত্ব সহকারে কাজ করছেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক অতীন দাশ দৈনিক বসুমতী ও আসাম এক্সপ্রেস পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। বাবুল বরুয়া পি টি আই-র বর্তমানে শিলচরের প্রতিনিধি।

(খ) করিমগঞ্জের প্রখ্যাত সাংবাদিক স্বর্গীয় বিধুভূষণ চৌধুরী দীর্ঘকাল ইউ পি আই-র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। ধীরেন্দ্রকুমার দত্ত আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকাদ্বয়ের প্রতিনিধিত্বে ছিলেন। আজীবন সাংবাদিক রমেশচন্দ্র দাস পি টি আই ও আনন্দবাজার-এর এবং স্বদেশরঞ্জন বিশ্বাস ছিলেন দৈনিক বসুমতী-র সংবাদদাতা। বিনয় সেনগুপ্ত হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার, রবীন্দ্রচন্দ্র দাস যুগান্তর পত্রিকার প্রতিনিধি, চুনীলাল দত্ত কিছুকাল ইউ পি আই-এর সংবাদদাতার কাজ করেছেন। হরিপদ দত্ত ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার করিমগঞ্জের প্রতিনিধি। শচীন্দ্রমোহন দত্ত দৈনিক স্বরাজ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার দায়িত্বে রত ছিলেন।

(গ) হাইলাকান্দির খ্যাতনামা সাংবাদিক শক্তিধর চৌধুরী যুগান্তর, অমৃতবাজার ও আসাম ট্রিবিউনের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছেন। উৎপল রায় ছিলেন দৈনিক বসুমতী ও ইউ পি আই-র এবং নীতিশ ভট্টাচার্য কিছুকাল দৈনিক বসুমতীর নিজস্ব সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে সময় প্রবাহ-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন।

শিলচরের শান্তনু ঘোষ, আনন্দবাজার গোষ্ঠী-র, জ্যোতিলাল চৌধুরী দ্য সেন্টিনেল কাগজের, অশোক বার্মা হিন্দি সেন্টিনেল পত্রিকার, স্বদেশ চক্রবর্তী দৈনিক আজকাল পত্রিকার, গৌতম দত্ত দৈনিক সময় প্রবাহ-এর, স্বদেশ বিশ্বাস নর্থ ইস্ট অবজারভার ও হিমাশিস ভট্টাচার্য সময় প্রবাহ পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করছেন।

এছাড়াও বরাক উপত্যকার তিন জেলার অনেকেই উপত্যকার ও উপত্যকার বাইরে বহু পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, গবেষণামূলক, আলোচনামূলক এবং গল্প, কবিতা ও নিবন্ধ লিখে যাচ্ছেন। এরমধ্যে প্রাক্তন অধ্যক্ষ দেবব্রত দত্ত, ড° সুশান্ত কৃষ্ণ দাস, ড° কামালুদ্দীন আহমদ, ড° সুজিৎ চৌধুরী, এ

কে মতীন আহমদ বড়লস্কর, রঘুনন্দন দত্ত, পরিতোষ পালচৌধুরী, বদরুজ্জামান চৌধুরী, বিজিৎ চৌধুরী, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, নীতিশ ভট্টাচার্য, আব্দুল খালিক বাঙ্গাল, স্বদেশ চক্রবর্তী, আতিকুর রহমান চৌধুরী, দেবদাস পুরকায়স্থ, সন্তোষকুমার মজুমদার, প্রভাস সেন মজুমদার, চন্দন সেনগুপ্ত, অনুরূপা বিশ্বাস, আবুল হুসেন মজুমদার, মনোজিৎ দাস, ড° সুবীর কর, গৌতম দত্ত, মহবুবুল বারী, শংকর দেব, পরেশ দত্ত, বিজিৎ ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি নাথ ও সুশান্ত কর প্রমুখ উল্লেখ্যযোগ্য।

উদীয়মান সাংবাদিক : বরাক উপত্যকায় কতিপয় উদীয়মান লেখক ও সাংবাদিকের সন্ধান আমাদের শুধু ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিতই করছে না, বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে তাঁরা যে অবদান জোগাতে সক্ষম হবেন তা বলা অত্যুক্তি হবে না।

অরূপানন্দ গোস্বামী, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, মিলন উদ্দিন লস্কর, তমোজিৎ ভট্টাচার্য, দেবাশিস ভট্টাচার্য, জসিম উদ্দিন লস্কর, পীযূষকান্তি দাস, আবুল হায়াত রাজু, মিহির দেবনাথ, নুরুল হোসেন মজুমদার, আশীষরঞ্জন নাথ, শংকর দে, বিমলকান্তি দাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, মলয়কান্তি দাস, নজরুল ইসলাম বড়ভূইয়া, নিবেদিতা চৌধুরী, জলাল উদ্দিন লস্কর, শতানন্দ ভট্টাচার্য, সুলেমান খান, সঞ্জীব দেব লস্কর ও সাব্বির আহমেদ বড়ভূইয়া প্রমুখকে সাংবাদিকতার জগতে বরাকের আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি বলা যায় নিঃসন্দেহে।

বরাক উপত্যকার কতিপয় লেখক উপত্যকা বহির্ভূত স্থানে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র সেবায় রীতিমত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। এর মধ্যে প্রয়াত দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য (যুগান্তর), মরহুম মৌলানা মোহাম্মদ তাহের (কাফেলা ও ইনসানিয়ত), রামেন্দ্র দেশমুখ্য (যুগান্তর), অমিতাভ চৌধুরী (আনন্দবাজার, যুগান্তর, আজকাল), সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য (আনন্দবাজার), অমিতকুমার নাগ (অমৃতবাজার, যুগান্তর), বাহার উদ্দিন (আজকাল), ত্রিদিব মালাকার (বেতার, দূরদর্শন), এ এফ গোলাম ওসমানি (জনক্রান্তি), নজরুল ইসলাম মাঝারভূইয়া (কলম), সুবিমল চৌধুরী (পি টি আই), রবিজিৎ চৌধুরী (দ্য স্টেটসম্যান), পার্থ ভট্টাচার্য (সময় প্রবাহ) প্রমুখের নামোল্লেখ করা হচ্ছে।

ভাষা আন্দোলনের রূপরেখা

সুবীর কর

'মোদের গরব মোদের আশা,
আ' মরি বাংলা ভাষা।'

১৪০০ সাল। কালের পথ পরিক্রমায় আরেকটি শতাব্দী শেষ হল। বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গীয় সনের নিবিড় একাত্ম সহবাসের আরও একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ হল। এই বিদায়ী শতকেই বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অধিকারকে রক্ষা করতে প্রাণ বলি দিতে হল বাঙালিকে। একবার নয়, বারবার। প্রথমে বিদেশে, পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় ১৩৫৮ সনের ফাল্গুন মাসে। এরপর এই বরাক উপত্যকায় ১৩৬৮ ও ১৩৯৩ সনে। মাতৃভাষার মর্যাদা অটুট রাখার জন্যে রক্ত ঝরানোর এমন গৌরব পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অর্জন করেছে কি না তা জানা না গেলেও বাঙালি কিন্তু করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা আন্দোলন ছিল উর্দু ভাষার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আর বরাক উপত্যকার আন্দোলন অসমিয়া ভাষার সম্প্রসারণবাদের প্রতিরোধে। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল জাতীয় মুক্তি, বরাকের ভাষা সংগ্রাম ছিল স্বাধীন গণতান্ত্রিক স্বদেশে অর্জিত সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। 'বীরের রক্ত স্রোতে' বাংলা ভাষা জননীর 'অশ্রুধারা' মুছিয়ে দিয়ে বরাকের বাঙালি নিজেই ইতিহাস হয়ে উঠেছে।

শ্রীহট্টের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালির জীবনের স্বপ্ন সাধকে সমাধি দিয়ে স্বদেশ আমার স্বাধীন হল। ছিন্নমূল বাঙালির নতুন এক পরিচিতি জুটলো উদ্বাস্তু। আসাম সাহিত্য সভার অগ্রণী নেতা অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী বাঙালির ভাগ্য নির্ণয়ে র‍্যাডক্লিফ কমিশনকে পরামর্শ দিলেন, "It is our definite opinion that whatever sense there has been in retaining Sylhet as a whole in Assam, there is no justification whatsoever in these Cachar and Sylhet leaders trying to retain a few Hindu Majority thanas of the districts within Assam. Nor can the Boundary Commission, in our opinion, grant this demand. There is a little sense in trying to retain the junior partner of Sylhet the Cachar plains, at any rate, Hailakandi, Sub-division in Assam."

স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য আসামে স্বাধীনতার উৎসব বাঙালি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির তথাকথিত 'আধিপত্যবাদ' থেকে মুক্তি লাভের বিজয়োৎসবে পরিণত হল। ২০ জুলাই '৪৭ তারিখে The Assam Tribune লিখল "Eternal vigilance is the price of liberty. Culturally, racially and linguistically every non Assamese is a foreigner in Assam. In this connection we must bear in mind that Assam from very ancient times never formed a part of India. Mythology and legendary allutions apart, viewed in this perspective every foreinger who came and resided in Assam for trade and other purposes after the occupation of the provience by the British in 1826 A.D. might be treated as alien, and alien cannot be expected to take a dispassionate views of public affairs of our future free state."

আসামের মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ গোলাঘাটে ছাত্র সমাবেশে ঘোষণা করে বলেছিলেন,

"Undoubtedly Assam is for Assamese."

স্বাধীনতার শুরু থেকেই বাঙালিকে বিদেশী, বহিরাগত রূপে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে আসামের

প্রতি তার আনুগত্য নিয়ে সংশয়ই শুধু প্রকাশ করা হল না তাকে অসমিয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রতিপক্ষ ও অন্তরায় বলে চিহ্নিত করা হল। অথচ, ইতিহাস সাক্ষী যে, জঙ্গল আবাদ করে আসামকে শস্য-শ্যামল করেছে বাঙালি কৃষক, আধুনিক আসামের গোড়াপত্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বাঙালি। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, মণিরাম বড়বন্দর বরুয়া, যদুরাম বরুয়া প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় অসমিয়া মনীষীরা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙালির প্রতি অনুরাগী হয়ে বাংলায়ই তাঁদের মননক্ষেত্রকে কর্ষিত করেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে অসমিয়া ভাষা ও অসমিয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাংলা ভাষা ও বাঙালি বিদ্বেষ প্রচারের আন্দোলন হয়ে দেখা দিল। অথচ এই ভাষার প্রশ্নে আসামবাসী বাঙালি কখনও অসমিয়া ভাষার বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে কোনও বিরোধিতা করেনি। শুধুমাত্র নিজেদের ন্যায়সঙ্গত সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের জন্য দাবি উত্থাপন করেছে। বিনিময়ে সে শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয়নি- হিংস্র আক্রমণ, দাঙ্গা, নিপীড়ন ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারবার। শ্রীহট্টকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলার রাষ্ট্রসীমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে ১৮৭৪ সালে জুড়ে দিয়ে এই অঞ্চলের বাঙালির স্বার্থকেই শুধু বিঘ্নিত করা হয়নি, তার ভাষিক ও জাতিগত অস্তিত্বের পরিচয়কেই বিপন্ন করে তোলা হয়েছে। দেখা যায় যে, আসাম ভুক্তির পরপরই শ্রীহট্টবাসীর ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কটাক্ষপাত করা হয়েছে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড গেইট সম্পাদিত আদমসুমারীর রিপোর্ট, ১৯০৯-এর ইম্পেরিয়েল গেজেট ইত্যাদির মধ্যে সুরমা উপত্যকার বাঙালির ভাষা ও বাঙালিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি কোনও কোনও অসমিয়া পণ্ডিত সেইসময় সুরমা অঞ্চলের বাংলা ভাষাকে অসমিয়া উপভাষারূপে প্রতিপন্ন করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। আসলে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে আসামের বাঙালিদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচারাভিযান, কুৎসা, উচ্ছেদ ও দাঙ্গা সংঘটিত হতে শুরু করেছে। স্বাধীনতার পরপরই ছিন্নমূল দিশেহারা বাঙালি যখন আপন জন্মভূমি থেকে সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে আসামে এসে নতুন করে ঘর বাঁধতে শুরু করল, ঠিক তখনই শুধু বাঙালি এই অপরাধে সে হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হল। তখনও, স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি হয়নি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসেই গৌহাটি শহরে বাঙালিরা দাঙ্গার সম্মুখীন হল। সরকারিভাবে জানা যায় যে- সে দাঙ্গায় একজনের মৃত্যু, ৪০ জন আহত, বাইশটি বাড়ি লুটপাট, এগারোটিকে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া, দুটি ওষুধের দোকান সম্পূর্ণ ধ্বংস ও তিনটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সেদিন দাঙ্গাবাজদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালপাড়া জেলায় শুরু হল 'বঙ্গাল-খেদা' আন্দোলন। এ দাঙ্গায় প্রায় দুইলক্ষ বাঙালিকে বিতাড়িত করা হয়। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ইত্যাদি আক্রমণে আতংকগ্রস্ত অসহায় বাঙালি উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নিল। এইসব হতভাগ্যদের আসামে এই শর্তে পুনর্বাসন দেওয়া হল যে অসমিয়া ভাষাকে তাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে হবে।

১৯৫১ সালে আসামের জনগণনায় অসমিয়া ভাষা-ভাষীর সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্য জুড়ে সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত শুরু হয়। জনগণনায় দেখা যায় যে, অসমিয়াদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে শতকরা ১২০% গিয়ে দাঁড়ায়, অথচ এর আগে বৃদ্ধির আনুপাতিক হার ছিল ২১% থেকে ২২%। জনগণনায় সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালির সংখ্যা নেমে ১৭ শতাংশে দাঁড়াল আর অসমিয়াদের বেড়ে হল ৫৫ শতাংশ। লোকগণনার এই রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সমগ্র রাজ্যজুড়ে সংখ্যালঘুদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হল। ১০ লক্ষ অসমিয়ার সংখ্যা ২০ বছরে বেড়ে দাঁড়াল ৪৮ লক্ষে, আর ৪০ লক্ষ বাঙালির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হল ১৭ লক্ষ।

জনগণনার ভিত্তিতে আসামকে একমাত্র অসমিয়া ভাষী রাজ্যরূপে গড়ে তোলার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে দেখা দিল। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে হাইলাকান্দিতে বিমলাপ্রসাদ চালিহার সভাপতিত্বে কাছাড় উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে উদ্বাস্তু ছাত্রদের বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

ভর্তির সমস্যা নিয়ে অভিযোগ ওঠে। দেখা যায় যে, কটন কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা যদি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার স্থায়ী অধিবাসী হয় তাহলে কোনও সমস্যা থাকে না। অন্যদের জন্য বিশেষত কাছাড় জেলার অধিবাসী হলে ইচ্ছুক ছাত্রদের স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের নিকট থেকে এই মর্মে সার্টিফিকেট নিতে হয় যে, সে-প্রার্থী আসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সাব্যস্ত করেছে। আসলে বাঙালি ছাত্রমাত্রকেই উদ্বাস্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হত এবং তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চালানো হত।

ইতিমধ্যে ধুবড়ি, বরপেটা, মঙ্গলদৈ, নগাঁও ইত্যাদি বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে অসমিয়াকরণের প্রয়াস ব্যাপকভাবে চালানো হল। বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে লোকেল বোর্ড থেকে অনুদান প্রদানে এই বলে অসম্মতি জানানো হল যে যদি অসমিয়া ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা না হয় তাহলে অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। দেখা গেল যে, তিন বছরের মধ্যে একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলায়ই ২৫০টি বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়ে ৩টাতে দাঁড়াল। স্কুলের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্রটি এরূপ—

অসমিয়া মাধ্যম স্কুল

১৯৪৭-৪৮	—	৩৫৮
১৯৪৮-৪৯	—	৫৭২
১৯৪৯-৫০	—	৭৪৩
১৯৫০-৫১	—	৮৩৩

বাংলা মাধ্যম স্কুল

১৯৪৭-৪৮	—	২৫০
১৯৪৮-৪৯	—	১৩০
১৯৪৯-৫০	—	৪৫
১৯৫০-৫১	—	৩

অসমিয়া ভাষার এই সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া জেলায় বঙ্গভাষীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজ্য কমিশন গঠিত হলে বঙ্গভাষীরা এই জেলার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তি দাবি করে স্মারকপত্র প্রদান করেন।

১৯৫৪ সালেই আসাম বিধানসভায় অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্য ভাষারূপে গ্রহণ করার জন্য একটি বেসরকারি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এটি পেশ করেন কংগ্রেস বিধায়ক ধরণীধর বসুমাতারি। অবশ্য কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় এই প্রস্তাবটি সে সময় স্থগিত রাখা হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৫৪ সালের ১৯ জুন করিমগঞ্জ শহরে, আসাম-ত্রিপুরা-মণিপুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উগ্র অসমিয়া ভাষাপ্রেম, অনসমিয়াদের উপর অত্যাচার ও নিগ্রহ, আর্থ-সামাজিক ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কুশীমোহন দাস। নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অরুণ চন্দ্র গুহ। ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে আসাম পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একভাষিক অসমিয়া রাজ্য গঠনের লক্ষ্যে গোয়ালপাড়া জেলার দাঙ্গা স্তিমিত হয়ে এলেও বিদ্বেষ ও ঘৃণার বাতাবরণ ক্রমে রাজ্যের স্বাভাবিক পরিবেশকে অগ্নিগর্ভকরে তুলেছিল।

এদিকে ১৯৪৮ ইংরেজিতেই কাছাড় জেলা থেকে পৃথক পূর্বাঞ্চল রাজ্যের দাবি ওঠে। কাছাড়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরা এই কটি জেলা নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের জন্য দাবি উত্থাপিত হয় এবং কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি, ত্রিপুরা ও মণিপুরের কংগ্রেস কমিটি এবং মিজোরামের জনপ্রতিনিধিরাও

এই দাবিকে অনুমোদন করেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি। সর্বভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪৮ ইংরেজির ৮ সেপ্টেম্বর পূর্বাঞ্চল রাজ্য গঠনের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কার্যকারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। পঞ্চাশের দশকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে পুনরায় এই দাবি উত্থাপিত হলে কমিশন কোনও গুরুত্ব দেয়নি। মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম এই ৩টি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু পূর্বাঞ্চল রাজ্যের নেতৃত্ব যে জেলার উপর ন্যস্ত ছিল, সেটি আসামের সঙ্গে রয়ে গেল। এদিকে রাজ্য ভাষার প্রশ্নে একশ্রেণীর অসমিয়া জনগণেরও প্রশাসনের সহযোগিতায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র আসামকে শুধুমাত্র অসমিয়া ভাষী রাজ্য রূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য উন্মত্ততা জেগে ওঠে। জনগণনায় নির্লজ্জভাবে কারচুপি করেও অসমিয়া জনসাধারণের সংখ্যা শতকরা পঞ্চান্ন ভাগের উপর উঠতে সক্ষম হয়নি। অথচ কমিশনের সুপারিশ হল এই যে, এক ভাষিক রাজ্য হতে হলে সে রাজ্যের অন্তর্গত বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ কিংবা তার অধিক হতে হবে।

এদিকে সরকারিভাবে অসমিয়া ভাষা গৃহীত না হলেও বেসরকারিভাবে অসমিয়াকরণের একটি প্রয়াস সমগ্র আসাম জুড়ে চলতে থাকে। প্রচারপত্র, বিজ্ঞপ্তি, নিদর্শনপত্র ইত্যাদি অসমিয়া ভাষায় ছাপিয়ে সর্বত্র বিলিবণ্টন হতে শুরু করল। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন-অসমিয়াদের ওপর অলিখিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হল। দেখা যায়, নগাঁও জেলায় ও অন্যান্য স্থানে পনেরো বৎসরেরও বেশি কাল ধরে বসবাসকারী পাট্টাদার ও নিয়মিত রাজস্বদাতা বাঙালি পরিবারদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হল। বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হতে লাগল। কাছাড়ে গেজেটেড কর্মকর্তাদের শতকরা ৯০ জনই হলেন অসমিয়া। এমনকি ২০-২৫ টাকা মাইনের পাটোয়ারি, চাপরাশি, অফিস-পিয়ন ইত্যাদি পদে কাছাড় জেলার স্থানীয় মানুষকে বঞ্চিত করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে নিয়মিত অসমিয়াদের নিয়োগ করা হতে লাগল। বাঙালি, মিজো, খাসিয়া, গারো, নাগা, মণিপুরী ইত্যাদি অনসমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্রমে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলনের পথে পা বাড়ালেন।

একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্য ভাষা রূপে সরকারি স্বীকৃতি দানের জন্য ১৯৬০ সালের ২২ এপ্রিল আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা তখন এই বলে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, রাজ্যের অনসমিয়া ভাষাভাষীদের মধ্য থেকে এই প্রস্তাব এলে তা সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হতে পারত এবং এই লক্ষ্যে প্রয়াস চালানো প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আসাম বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে চাপ সৃষ্টি করার জন্য রাজ্যভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনসমিয়া, প্রধানত বঙ্গভাষীদের বিরুদ্ধে আবার অভিযান শুরু হল। এর প্রতিবাদে সমগ্র অনসমিয়া জাতিগোষ্ঠীর ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের লক্ষে এক তীব্র গণআন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে '৬০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শিলচর মিউনিসিপাল হলে বিধায়ক আব্দুল মতলিব মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় নিখিল আসাম বাংলা ভাষা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হল।

২১ জুন তারিখে রাজ্য সরকারের অসমিয়া ভাষা নীতির প্রতিবাদে শিলচর নরসিংটোলায় লোকসভা সদস্য দ্বারিকানাথ তেওয়ারির সভাপতিত্বে সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির এক বিশাল জনসভায় প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য আলতাফ হোসেন মজুমদার, শিলচর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক নন্দকিশোর সিংহ, গোলাম সবির খান, রথীন্দ্রনাথ সেন, লোকসভার সদস্য নিবারণ চন্দ্র লস্কর, প্রস্তুতি কমিটির

সাধারণ সম্পাদক শরৎ চন্দ্র নাথ প্রমুখ বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নন্দকিশোর সিংহ দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, প্রদেশ কংগ্রেসের বিগত গৌহাটি অধিবেশনে কাছাড়ের দশজন প্রতিনিধিই একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু সরকার এই ন্যায়সঙ্গত মতামতের প্রতি কোনও সহানুভূতিই প্রদর্শন করেননি। এই সভায় অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার আন্দোলনের নামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অনসমিয়া বিশেষত বাঙালিদের ওপর যে পরিকল্পিত উৎপীড়ন ও নির্ঘাতন সংঘটিত হয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এ-ধরনের অবাঞ্ছিত জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে সভাপতি এবং অধ্যাপক শরৎ চন্দ্র নাথকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলা ভাষা সম্মেলন করার জন্যে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়। অপর একটি প্রস্তাবে বাঙালি ও অন্যান্য ভাষিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ২ ও ৩ জুলাই ১৯৬০ ইং তারিখে শিলচরে সংসদ সদস্য চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অভূতপূর্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিল আসাম বঙ্গভাষা সম্মেলনের এই অধিবেশনে আসামের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল, উত্তর আসামের বিভিন্ন এলাকা, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, যোরহাট, নগাঁও এবং কাছাড়ও এই অঞ্চলের সংলগ্ন এলাকাগুলি থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার নরনারী যোগ দিয়েছিলেন। 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে' সঙ্গীত দিয়ে অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক তাঁর ভাষণে গভীর বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে অনসমিয়া ভাষা-ভাষীদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার ও 'আসাম সাহিত্য সভা ও কোনও উৎপীড়ন চলছিল সে সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন কোনও অসমিয়া দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা অসমিয়াকে রাজ্যভাষা রূপে দাবির সমর্থন করতে গিয়ে বিভেদের উগ্রবিষ ছড়াইতে থাকে যাহা এই রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী।'

এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ছিল এরূপ —

১। আসামের সরকারি ভাষারূপে অসমিয়ার প্রবর্তন স্থগিত রেখে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং রাজ্য বিধানসভায় উত্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত বিলটি প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবক - নিবারণ চন্দ্র লস্কর। সমর্থক সাংসদ দ্বারিকানাথ তেওয়ারি।

২। আগামী শরৎকালীন অধিবেশনে আসাম বিধানসভায় এই ভাষা বিলের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে কাছাড় জেলার সকল পরিষদ সদস্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবেন। যদি এই বিরোধিতা ব্যর্থ হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা যিনি কাছাড়ের বদরপুর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি, কৃষিদপ্তরের মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী সহ জেলার সকল পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করে পরিষদ ত্যাগ করবেন। প্রস্তাবক, সুরেশ চক্রবর্তী। সমর্থন - মোহিতমোহন দাস।

৩। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অত্যাচারিত-নির্যাতিত মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণের জন্য হাইকোর্টের ধর্মাধিকরণকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা ও তদন্তের ফল তিনমাসের মধ্যে প্রকাশ করার কথা বলা হয়। প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে সরকারকে কঠোর হস্তে গুণ্ডামি ইত্যাদি দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয় এবং অপমানিত, লাঞ্ছিত অসহায় নর-নারীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে একটি সংযোগ কমিটি গঠন করে সরেজমিন তদন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। - প্রস্তাবক, গৌরীশংকর দাস (পরিষদ সদস্য)। সমর্থক - রথীন্দ্র নাথ সেন।

৪। আসামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতি আক্রমণেরও নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবক

- সুরঞ্জন নন্দী, সমর্থক- বিধুভূষণ চৌধুরী।

৫। আগামী লোকগণনা অনুষ্ঠান যাতে নিরপেক্ষভাবে করা হয়, সেইজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়। প্রস্তাবক জ্যোৎস্না চন্দ, সমর্থক হুরমত আলি বড়লস্কর (পরিষদ সদস্য)।

৬। আসামের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি পর্যায়ে একটি ভাষা নির্ধারণ কমিশন গঠনের দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবক বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। সমর্থক- আলতাফ হোসেন মজুমদার।

৭। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবক সুকেশ রঞ্জন বিশ্বাস (ছাত্রনেতা)। সমর্থক : সুজিৎ চৌধুরী।

অষ্টম ও শেষ প্রস্তাবে এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে কার্যকরী করে তোলার জন্য জেলার সকল পরিষদ সদস্য ও লোকসভার সদস্যবর্গসহ অনসমিয়াদের ও ঐ স্তরের সদস্যদের নিয়ে একটি 'রূপায়ণ কমিটি' গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবক সতীন্দ্র মোহন দেব। সমর্থক তজমুল আলি বড়লস্কর।

একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে গ্রহণ করার জন্য সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাব্যাপী জুলাই মাসের ৪ তারিখে আবার ভয়াবহ 'বঙ্গাল-খেদা' শুরু হল। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি বর্বরোচিত এমন কোনও তাণ্ডব বাকি থাকেনি যা সেসময় সংঘটিত হয়নি। গুণ্ডারা অবাধে বন্দুক, পেট্রোল ও স্টিরাপ পাম্পসহ বাস ও ট্রাক বোঝাই করে বাঙালিদের উপর সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালালো। পাম্প নিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে হাজার হাজার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। এই নৃশংস অত্যাচারে শুধু দাঙ্গাকারীরাই অংশ নেয়নি, কংগ্রেসের এক শ্রেণীর গুণ্ডা নেতৃত্ব, প্রশাসনের উগ্র জাতীয়তাবাদী একদল কর্মকর্তা, এমনকি পুলিশের একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও যে এই হত্যাকাণ্ডে সক্রিয় ছিল, এরকম অসংখ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সরকারি হিসেব থেকেই জানা যায় যে সেসময় চল্লিশ জন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দশ হাজারের উপর বাড়িঘর ভস্মীভূত এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজারের উপর অনসমিয়া লোকজন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালি তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে এই হিংস্রতার প্রতিবেদন ও জঙ্গলের রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রকাশিত হলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংবাদপত্রের বদ্যুৎসব হয়। এমনকি আসাম সরকার তথাকথিত অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগ উত্থাপন করে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের এবং আসাম থেকে প্রেরিত Press Telegramme-এর উপর সেন্সর ব্যবস্থা আরোপ করেন। এই নির্মম অত্যাচার-হত্যাকাণ্ডের ফলে সমগ্র আসামে অনসমিয়া বিশেষত, বাঙালিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। নিগৃহীত হাজার হাজার বাঙালি পশ্চিমবঙ্গে ও কাছাড় জেলায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। সরকারি হিসেব মতে আসামের বিভিন্ন শিবিরে প্রায় পনেরো হাজার লোক, এবং পঁচিশ হাজারের উপর নির্যাতিত কাছাড় জেলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্য থেকে এই হত্যালীলার প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আশু হস্তক্ষেপের জন্য স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ৭ জুলাই তারিখে কাছাড় জেলার সব বিধায়ক ও সাংসদ এবং করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও কাছাড় এই তিন জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে আসামের দাঙ্গা বন্ধের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এরপর ১২ জুলাই তারিখে কাছাড় থেকে সাংসদ ও বিধায়কদের এক প্রতিনিধি দল দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসামের সংকটজনক পরিস্থিতির ব্যাপারে তাঁকে ভাবহিত করে এক স্মারকপত্র প্রদান করেন। এই স্মারকলিপিতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নির্যাতনের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করে বহু ভাষা-ভাষী আসাম রাজ্যে রাজ্যভাষা সম্পর্কিত বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, বিধানসভায়

রাজ্যভাষা বিল উত্থাপন স্থগিত রাখা এবং আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়। প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতি ড° রাজেন্দ্র প্রসাদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন, কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব রেড্ডি, রেলমন্ত্রী জগজীবন রাম, আইনমন্ত্রী অশোক সেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সাদিক আলি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি কে মালব্য ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন দ্বারিকানাথ তেওয়ারি, নিবারণ চন্দ্র লস্কর, সুরেশ চন্দ্র দেব, নন্দকিশোর সিংহ ও জ্যোৎস্না চন্দ।

আসামের সংকটজনক পরিস্থিতির বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু রাজধানী শিলঙে এসে উপস্থিত হন। ১৮ জুলাই তারিখে শিলঙে এক জনসভায় তিনি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সংঘটিত বর্বরোচিত ঘটনার নিন্দা করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বেদনা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নেহরু বলেন, 'আমি বর্ষাস্নাত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের মধ্যে গভীর ক্ষত দেখেছি, সেই ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের ফলে। সবার আগে একথা মনে রাখতে হবে যে, যেকোনও সভ্য সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কতকগুলি অধিকার আছে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে প্রত্যেকের তা ভোগ করার সংবিধান রয়েছে।'

১৮ আগস্ট তারিখে একদল সংসদীয় প্রতিনিধি অজিত প্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে কাছাড় জেলা পরিদর্শনে আসেন। কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির পক্ষ থেকে রাজ্যের বিপন্ন পরিস্থিতি লোকগণনায় কারচুপি, ভাষাজনিত সমস্যা, দাঙ্গা নির্যাতন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে দাঙ্গাকারীদের শাস্তি বিধান, সংখ্যালঘুর স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিধির বিষয়ে প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরপর ৫ ও ৬ অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পন্থের সঙ্গে কাছাড়ের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসে। অসমিয়া, বাঙালি ও পার্বত্য উপজাতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার পরও সহমত ভিত্তিতে কোনও সমাধান সূত্র আবিষ্কার না হওয়ায় পন্থজি এই মর্মে প্রস্তাব দেন যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অসমিয়া ভাষা, সেক্রেটারিয়েট পর্যায়ে ইংরাজীর পরিবর্তে হিন্দি ভাষা, পার্বত্য অঞ্চলসমূহে ইংরাজী এবং কাছাড়ে যেভাবে বাংলা ভাষা প্রচলিত আছে সেই অবস্থা বজায় রেখে চলাই হল মহত্তম পন্থা। কিন্তু পন্থজির এই সুপারিশ অসমিয়া নেতৃত্বের অনমনীয় মনোভাবের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না, তাঁরা অসমিয়াকরণের দাবিতেই অটল থাকলেন।

১০ অক্টোবর '৬০ আসাম বিধানসভায় প্রস্তাবিত রাজ্যভাষা বিলের খসড়া উপস্থাপিত হল। এই বিলে একমাত্র অসমিয়া ভাষাকেই রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব পেশ করা হল।

অপরদিকে, কংগ্রেস বিধান পরিষদীয় সভায় কাছাড়ের সকল কংগ্রেসি বিধায়ক অসমিয়ার সঙ্গে বাংলাকেও অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের জন্য প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অসমিয়া সদস্যগণ এই দাবি নাকচ করে দেন। নিরুপায় হয়ে কাছাড়ের সদস্যগণ ঘোষণা করেন যে এই বিল পরিষদে পেশ করা হলে তাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। বিধায়ক আব্দুল মতলিব মজুমদার ও বিমলাপ্রসাদ চালিহা ছাড়া কাছাড়ের সকল কংগ্রেস সদস্যই পরিষদীয় দলনেতার কাছে লিখিতভাবে দাবি পেশ করেন যে, বিধানসভায় প্রস্তাবিত ভাষাবিল-এর উপর বিতর্কে অংশগ্রহণে ও ভোটদানের জন্য যেন অবাধ অধিকার দান করেন। উত্তরে দলনেতা এই বলে সতর্ক করে দেন যে দলীয় শৃঙ্খলা নীতি হিসেবে এই ভাষা বিলকে সমর্থন করতে দলের বিধায়করা বাধ্য। এই অনমনীয় মনোভাবের ফলে কাছাড় জেলার কংগ্রেস কমিটিগুলির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নন্দকিশোর সিংহ, রণেন্দ্রমোহন দাস, হেমচন্দ্র চক্রবর্তী ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ মিলিতভাবে দলনেতার নিকট পদত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করে পত্র প্রদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী চালিহা কাছাড়ের বদরপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছিলেন। ১১ অক্টোবর তারিখে কাছাড়ের সাংসদ দ্বারিকানাথ তেওয়ারি, নিবারণ চন্দ্র লস্কর ও সুবেশ চন্দ্র দেব বিধায়কদের পদত্যাগের ব্যাপারটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান। চালিহা বিধায়কদের

পদত্যাগপত্র দিল্লিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নিকট পাঠিয়ে দেন।

১৪ অক্টোবর '৬০, বিধানসভায় বহু বিতর্কিত ভাষা বিলে একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাবের সঙ্গে শুধুমাত্র কাছাড়ের জন্য আঞ্চলিক ভাষারূপে বাংলাকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে অসমিয়াকরণের প্রকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য মহকুমা পরিষদের উপর দায়িত্ব প্রদান করে এক বিধি সংযোজিত হল। এই পরিস্থিতিতে ১৪ ও ১৫ অক্টোবর শিলঙে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সভায় প্রস্তাবিত বিলকে কেন্দ্র করে বিতর্কের ঝড় ওঠে। এবং প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। কাছাড়ের ১৩ জন এ পি সি সি সদস্য প্রস্তাবিত ভাষা বিলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করেন। এদিকে কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব রেড্ডি ১৮ অক্টোবর তারিখে মুখ্যমন্ত্রী চালিহার নিকট এক জরুরি বার্তা পাঠিয়ে কংগ্রেসের আসন্ন রায়পুর অধিবেশন পর্যন্ত প্রস্তাবিত ভাষা বিলটি স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। যদি বিলটি বিধানসভায় বিবেচনার পর্যায়ে পৌঁছে থাকে তাহলে তা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার প্রস্তাবও তিনি দেন। তিনি আরও জানান যে বিল সংক্রান্ত বিতর্কে সদস্যগণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন, এমনকি ভোটও প্রদান করতে পারবেন। তবে কোনও মন্ত্রী ইচ্ছা করলে ভোট দানে বিরত থাকতে পারেন। ১৮ অক্টোবর তারিখেই বিধানসভায় প্রস্তাবিত ভাষাবিলের প্রতিবাদে নন্দকিশোর সিংহ এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

২১ অক্টোবর জ্যোৎস্না চন্দ ও তজম্মুল আলি বড়লস্কর বিলের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে এই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, যেহেতু কেবলমাত্র কাছাড় ছাড়া আসামের আর কোনও জেলার ব্যাপারে মহকুমা পরিষদ বিধি প্রযোজ্য নয় সুতরাং এই প্রস্তাব বাতিল করা হোক। বিতর্কে যোগদান করে নন্দকিশোর সিংহ ও হেমচন্দ্র চক্রবর্তী হিন্দি, বাংলা ও অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার প্রস্তাব পেশ করেন। ২২ অক্টোবর তারিখে কাছাড়ের সাতজন কংগ্রেসি বিধায়ক এই ভাষা বিলটি আরও কদিনের জন্য স্থগিত রাখার আবেদন জানান। পরদিন কংগ্রেসের দলীয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোনও কংগ্রেস সদস্য সরকারি ভাষা বিলে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবেন না। সকল বিরোধিতা, দাবি, প্রার্থনা, অনুনয়, আইন অধিকার সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে ২৪ তারিখে বিধানসভায় রাজ্যভাষা বিলটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত হল।

সেদিনটি ছিল সংখ্যালঘুর দাবি ও অধিকারকে হত্যা করার দিন। এই কালো দিবসে রাজ্যভাষা বিলের প্রতিবাদে পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের সংগ্রাম পরিষদ সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়। প্রায় চল্লিশ হাজার নর-নারী রাজধানী শিলঙের পথে মিছিল করে সরকারের অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী ভাষানীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সমগ্র কাছাড় জেলায় এই বিলের প্রতিবাদে বন্ধ পালন করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে গণতন্ত্র হত্যা দিবস, অরন্ধন দিবস, কালাদিবস রূপে দিনটি প্রতিপালিত হয়। করিমগঞ্জে এক বিশাল জনসভায় জনসাধারণকে আসামের বঙ্গভাষী এলাকাসমূহকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের জন্য বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এবং কাছাড়ের সাংসদ, মন্ত্রী ও বিধায়কদের অবিলম্বে পদত্যাগ করার জন্য দাবি করা হয়। অবশেষে রাত প্রায় দশটায় আসাম রাজ্য বিধানসভায় ৫৬-০ ভোটে একমাত্র অসমিয়াকে রাজ্যভাষা রূপে স্বীকার করে নিয়ে ভাষাবিল গৃহীত হল।

ভাষা বিল নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা শুরুর প্রারম্ভেই প্রতিবাদ জানিয়ে পার্বত্য নেতৃ সম্মেলনের সংগ্রাম পরিষদের প্রতি অনুগত সদস্যরা উইলিয়ামসন সাংমার নেতৃত্বে ও কাছাড় জেলার কংগ্রেসি সদস্যরা রণেন্দ্র মোহন দাস ও তজম্মুল আলি বড়লস্করের নেতৃত্বে বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করেন। পার্বত্য জেলাগুলির তিনজন কংগ্রেসি সদস্যের মধ্যে মহান সিং বিধানসভা ভবনে উপস্থিত থেকেও সভাকক্ষে প্রবেশ করেননি। অপর দুই সদস্য ছত্র সিং টেরন ও সোই সোই টেরাং (পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি) সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী প্রশ্নোত্তরের কালে বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন

কিন্তু ভাষা বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হবার আগেই তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। কাছাড় জেলার অপর সদস্যদের মধ্যে আব্দুল মতলিব মজুমদার (কংগ্রেস), বিমলাপ্রসাদ চালিহা (মুখ্যমন্ত্রী) ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় (প্রজাসমাজতন্ত্রী) বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন। উপাধ্যায় বিলের উপর এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা অগ্রাহ্য হয় এবং তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। গোপেশ চন্দ্র নমঃশূদ্র (কম্যুনিস্ট) বিধানসভা শুরু হবার পর কক্ষে প্রবেশ করেন এবং মহকুমা পরিষদ ধারার বিরোধিতা করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। রণেন্দ্র মোহন দাস বিধানসভা কক্ষ ত্যাগ করার আগে সরকারের সম্প্রসারণবাদী চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী দুমুখো নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে অবশেষে উগ্রজাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আসামের দাঙ্গা আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই ভাষা বিল গৃহীত হবে ঠিক, কিন্তু এর ফলে আসামের ভাঙন কেউ রোধ করতে পারবে না — এটাই ইতিহাসের নির্দেশ।

ভাষা বিল পাশ হলে লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত মানুষ ক্ষোভে-ক্রোধে ও বেদনায় ফেটে পড়ল। আসামের উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর তার পোষা গুণ্ডা বাহিনীর অত্যাচারে বিপর্যস্ত ও সন্ত্রস্ত মানুষ নিজের অস্তিত্ব ও ভাষার অধিকার রক্ষার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে এল। ৬ ও ৭ নভেম্বর তারিখে হোজাইতে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সম্মেলন-এর এক অধিবেশন আহ্বান করা হল। দুদিনের এই অধিবেশনে আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সর্বস্তরের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। বৈদ্যনাথ মুখার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে আসামের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনা করে সংখ্যালঘু বিশেষত বাংলাভাষী গোষ্ঠীর সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা, মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভ ও অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে সম্মেলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করে সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতি করা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে বিধানসভায় ভাষা বিলের প্রতিবাদে রাজ্যপালের নিকট এক স্মারকপত্রও প্রদান করা হয়। গোরেশ্বর তদন্ত কমিশনকে সফল করে তুলতে ও দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য এই সমিতি অক্লান্ত শ্রম ও প্রয়াস চালিয়ে যায়। আইনগত বিষয়ের সুবিধার জন্য তদন্ত কমিশনের নিকট দুটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। যার একটি সমিতির পক্ষ থেকে আর অপরটি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তরফ থেকে। এন সি চ্যাটার্জি সমিতির পক্ষ হয়ে আর সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় নিপীড়িত মানুষের পক্ষে ওকালতি করেন। কাছাড় জেলার জনমানসে আসাম রাজ্য ভাষা-বিল নিয়ে যে শঙ্কা ছিল বাস্তবে তাই ঘটলে স্বভাবতই সমগ্র জনমানস ক্ষোভে ও বেদনায় এর প্রতিকারের দাবিতে অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে পা বাড়াল। যেহেতু আসাম সরকার কংগ্রেস দলেরই সরকার এবং সমগ্র আসামে রাজনৈতিক নেতৃত্বে কংগ্রেসিদেরই প্রাধান্য তাই মাতৃভাষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বাঙালির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে জনগণের কাছে কংগ্রেসিরাই সবার আগে দায়বদ্ধ। কাছাড়ের কংগ্রেসি নেতৃত্বের গরিষ্ঠ অংশ দীর্ঘ দিন ধরে রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে এই নিয়ে দলীয় সভায় ও বিধানসভায় লড়াই চালিয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরাস্তই হতে হয়েছে। তাই রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষে কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি এই তিন জেলার কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি ২৬ ডিসেম্বর '৬০ তারিখে শিলচরে এক যৌথ সভা আহ্বান করেন। শিলচর জেলা কংগ্রেস ভবনে সন্তোষ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে আসাম বিধানসভায় অনসমিয়া জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে অগ্রাহ্য করে আসাম রাজ্য ভাষা বিল গ্রহণ ও রাজ্যপাল কর্তৃক তাতে স্বাক্ষর দানের পর উদ্ভুত পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনা ক্রমে জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলির কার্যকরী কমিটির সদস্যদের যৌথসভা সর্বসম্মতভাবে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রথম প্রস্তাবটি ছিল এই যে সংবিধানের ৩৪৭ ধারা অনুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট ৩০ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষী লোকের মাতৃভাষা বাংলাকেও আসামের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য দাবিপত্র পেশ করা হোক। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শরৎ চন্দ্র নাথ এবং সমর্থন করেন হরমৎ আলি বড়লস্কর।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই যে রাজ্যভাষা বিল গ্রহণের পর কাছাড়ের জনগণ ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অনসমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাগ্রত ক্ষোভ ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে উপনীত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কাছাড় কংগ্রেসের ভূমিকাকে জনসাধারণের মধ্যে যথার্থভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। এই মর্মে, 'আসামের ভাষা বিতর্ক ও কাছাড়' শিরোনামে তথ্য সম্বলিত এক পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২ ডিসেম্বর তারিখে শিলচরে কাছাড় করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি, এই তিন জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি আবার এক যৌথ সভায় বসে এবং করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রণেন্দ্র মোহন দাসকে আহ্বায়ক করে করিমগঞ্জ শহরে কংগ্রেস কর্মীদের এক কনভেনশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৫ জানুয়ারি করিমগঞ্জে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাবে কাছাড় কংগ্রেসকে আসাম কংগ্রেস থেকে আলাদা করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা এবং তৃতীয় প্রস্তাবে কাছাড়কে আলাদা করে এক পৃথক শাসনতান্ত্রিক সংস্থা রূপে গঠন করার দাবি করা হয়। এরপর ২০ জানুয়ারি তারিখে কংগ্রেস সভাপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি কাছাড় সফরে এলে তাঁর নিকট কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করে আসামের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ও ভাষা সংকট নিরসনে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়।

কাছাড় জেলা কংগ্রেস কনভেনশনের পর সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে সভাপতি, নলিনী কান্ত দাসকে সাধারণ সম্পাদক, নীরদ ভূষণ দে ও নৃপতি রঞ্জন চৌধুরীকে সহ-সম্পাদক ও নিরঞ্জন চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ করে এক শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করে করিমগঞ্জে কাছাড় জেলা জন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে করিমগঞ্জ টাউন ব্যাংক প্রাঙ্গণে হাইলাকান্দির বিশিষ্ট নাগরিক, লোকাল বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে কাছাড় জেলা জন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শিলচরের বিশিষ্ট নাগরিক অনিল বর্মন। সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক শরৎচন্দ্র নাথ। এই সম্মেলনে সমগ্র জেলা থেকে প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রাতঃকালীন বিষয় নির্বাচনী সভায় ও প্রকাশ্য অধিবেশনে মুনীন্দ্র কুমার দাস, রণেন্দ্র মোহন দাস, অরবিন্দ দত্ত চৌধুরী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের দাবি করা হয়, অন্যথায় ১ বৈশাখ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হুরমত আলি বড়লস্কর, বিনয়েন্দ্র চৌধুরী, যতীন্দ্র নাথ দে, পরিতোষ পালচৌধুরী, সনৎ কুমার চক্রবর্তী, হাইলাকান্দির শক্তিধর চৌধুরী, অমিয় কুমার নন্দী, করিমগঞ্জের রথীন্দ্রনাথ সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী, কুমুদ রঞ্জন লুহ, ভূপেন্দ্র সিংহ, বিলঙ্গময়ী কর প্রমুখ বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য অধিবেশনে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সর্বস্ব পণ করে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে অনিল কুমার বর্মন বলেন, 'আমরা ভাষা আইনের জন্য দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়েছি। গত জুলাই মাসে আমরা শিলচর সম্মেলনে যে যুক্তিপূর্ণ দাবি জানিয়েছিলাম তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে কুখ্যাত ভাষা আইন গ্রহণ করতে আসাম উপত্যকায় যে অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল তার বীভৎসতার তুলনা মেলে না। আসাম বিধানসভায় কাছাড়ের সদস্য ও কাছাড়ের লোকসভার প্রতিনিধিগণের দ্বিধাজড়িত আচরণে কাছাড়ের মানসম্মান আহত ও স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। শিলচর সম্মেলনের

মাধ্যমে কাছাড় জেলাবাসী দাবি করেছিল যে, অসমিয়াকে একমাত্র রাজ্য ভাষা করে ভাষা বিল সভায় উপস্থিত হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগ করবেন। যে কংগ্রেস সরকার শাসন ক্ষমতা হাতে রেখে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নারকীয় কাণ্ডের ও নির্মম অত্যাচারের প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা করতে পারেনি সেই কংগ্রেসের নামে কংগ্রেস সরকারের বিধানসভায় থাকা কোনও অবস্থায়ই সম্মানজনক বিবেচিত হতে পারে না। পূর্ববঙ্গে বাঙালিগণ বাংলা ভাষার জন্য স্বার্থ তুচ্ছ করে যে সংগ্রাম করেছেন আমাদের উচিত তাদের সংগ্রাম থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করা।'

প্রধান অতিথি অধ্যাপক শরৎচন্দ্র নাথ তাঁর ভাষণে বলেন, 'আজ এই সম্মেলনে কাছাড়ের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বিবেচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে আমরা উপস্থিত হয়েছি। গত ১৩ বছর ধরে আমাদের এই জেলার কোনও প্রকার আর্থিক উন্নতি হয়নি কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য। অধিকন্তু আজ আমাদের ভাষা, আমাদের কৃষ্টি বিপন্ন। শুধু বাংলা ভাষা-ভাষী আমাদের নয় - এই রাজ্যের অন্যান্য অনসমিয়া ভাষা এবং তাঁদের কৃষ্টিও বিপন্ন। পশ্চিম মহাদেশে বহু রাজ্য আছে, বহু ভাষা-ভাষী। কিন্তু সেখানে প্রত্যেক ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই ভাষা সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সেখানে একভাষা একচ্ছত্র প্রাধান্য নিয়ে অন্য ভাষাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যুগোশ্লাভিয়া ও ইজরাইলের কথা। যুগোশ্লাভিয়ায় মাত্র ৮০ হাজার ইটালিয়ান আছেন। মোট জনসংখ্যার তুলনায় ইটালিয়ানরা অত্যন্ত নগণ্য কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় ইটালিয়ান ভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শুধু তা নয় তাঁদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সরকার অকৃপণহস্তে অর্থদান করেছেন। আমাদের সরকারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেও দেখেন না। ভাষা ও কৃষ্টির সমস্যা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু ভোট দিয়ে মীমাংসা হয় না। শিলচর সম্মেলনে আমাদের যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি কি কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকার কেউই দৃষ্টি দেননি। রাজ্যের সমস্যা আপোষে ও সর্বসম্মতিতে মীমাংসায় পৌঁছানোই সত্যিকারের গণতন্ত্র। সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ সংখ্যাগুরুর অযৌক্তিক অভিমত চাপানো সত্যিকারের গণতন্ত্র নয়। এটা গণতন্ত্রের বিকার। ভাষা আইনের সৃষ্ট সংকটজনক পরিস্থিতিতে আমাদের বলিষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমরা আমাদের ভাষা ও কৃষ্টিকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করতে চাই। আজ আমাদের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে।'

সম্মেলনে অবিলম্বে অবিচারমূলক রাজ্যভাষা আইন প্রত্যাহার করে বাংলাকে অসমিয়ার সঙ্গে অন্যতম রাজ্যভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের জন্য দাবি জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই দাবিকে চরমপত্ররূপে বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ঘোষিত হয় যে যদি আগামী ১৩ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য ভাষা আইন বাতিল করা না হয় তাহলে ১৪ এপ্রিল থেকে সমগ্র জেলায় আন্দোলন চলবে।

আব্দুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতি ও নলিনীকান্ত দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট 'কাছাড় জেলা গণ সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ৯ এপ্রিল কেশব চন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনও ফলপ্রদ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় গণ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আগামী ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) দিনটি সমগ্র জেলায় সংকল্প দিবস রূপে পালন করা হবে এবং ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত সভা, শোভাযাত্রা, পদযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে সমগ্র উপত্যকাব্যাপী সর্বস্তরের গণ চেতনাকে আন্দোলনমুখী করে গড়ে তোলা হবে। প্রত্যয়দীপ্ত দৃঢ়কণ্ঠে ১ বৈশাখ উচ্চারিত হল শপথের বাণী 'জান দেব তবু জবান দেব না।' মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত বাঙালি নববর্ষের প্রথম দিনটি উদ্যাপন করে 'সংকল্প দিবস'রূপে। ১৯ এপ্রিল শুরু হল ঐতিহাসিক পদযাত্রা। করিমগঞ্জ মহকুমার পদযাত্রী দল ২ মে ফিরলেন শহরে। শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের পদযাত্রীরা ২৪ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে ফিরে এলেন ২ মে। ১৩ তারিখে হাইলাকান্দি মহকুমার গ্রাম-গ্রামান্তর পরিক্রমা করে ফিরে এলেন পদযাত্রী দল। জেলার সর্বত্র হাজার হাজার মানুষ তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা

জানালেন। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করে ভাষা সেনানীদের বরণ করলেন মা-বোনেরা - এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। হাজার হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত হল সংগ্রামী শপথ। গৃহীত হল গণ সংগ্রামের কার্যসূচি। ঘোষিত হল ১৯ থেকে সমগ্র জেলায় অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে। রেল, বিমান, সরকারি অফিস আদালত যানবাহন সব অচল থাকবে। শিশু-বৃদ্ধ, ছাত্র-যুব-জনতার ঐক্যশক্তি এক দুর্বার আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলল। সমগ্র জেলার ছাত্র সমাজ, যাঁরা সকল সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী তাঁরা 'জীবন-মৃত্যু'কে 'পায়ের ভৃত্য' করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভয়াবহ দাঙ্গা, অসমিয়াকে রাজ্যভাষা করার উদ্দেশ্যে দমন-পীড়ন ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকার ছাত্র সমাজে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে '৫৯ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্র নেতা কল্যাণব্রত ভট্টাচার্যকে সভাপতি সুকেশ রঞ্জন বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক করে শিলচর ছাত্র সমিতি গঠিত হয়। ২ ও ৩ জুলাই শিলচরে অনুষ্ঠিত বাংলা ভাষা সম্মেলনকে সফল করে তুলতে শিলচর-হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের ছাত্রসমাজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। করিমগঞ্জে ৭ জুলাই নিশীথ রঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র সংগ্রাম সমিতি গঠিত হয়। বিজিৎ চৌধুরীকে সভাপতি ও অসীম সেনকে সম্পাদক করে গঠিত সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে ১১ জুলাই করিমগঞ্জে বন্ধ পালন করা হয়। ১৩ জুলাই তারিখে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জীব রেড্ডি ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধিনাথ শর্মা কাছাড় সফরে এলে শিলচর সদরঘাটে কয়েক সহস্র ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ক্ষুব্ধ উত্তেজিত ছাত্র জনতার প্রতিবাদে ও রোষে শেষপর্যন্ত সিদ্ধিনাথ শর্মাকে বরাকের অপর পারে রেখে সঞ্জীব রেড্ডি শিলচর শহরে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। এই ছাত্র বিক্ষোভে করিমগঞ্জ হাইলাকান্দির ছাত্র নেতাদেরও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। উত্তাল বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে রেড্ডি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এর ফলে তিনি করিমগঞ্জ সফরের কার্যসূচি বাতিল করে দেন। করিমগঞ্জ ছাত্র সমিতির উদ্যোগে জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জুলাই শ্রীগৌরীতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিজিৎ চৌধুরী। সর্বশ্রী নিশীথ রঞ্জন দাস, নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, সুজিত চৌধুরী, আবদুর রৌফ প্রমুখ বিশিষ্ট ছাত্র নেতারা এই সম্মেলনে দাঙ্গা ও ভাষা সম্পর্কিত উদ্ভুত জটিল পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে ছাত্র যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। এদিন সন্ধ্যায় প্রায় চার হাজার ছাত্র মশাল মিছিল করে শ্রীগৌরী থেকে বদরপুর পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করেন। কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্যে সমগ্র জেলার ছাত্র সমাজ দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

বরাকের বাঙালির মাতৃভাষার পবিত্র অধিকার রক্ষার অহিংস আন্দোলনকে দমন করার জন্য সমগ্র জেলায় সরকার পক্ষে যেন যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি শুরু হল। সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স, আসাম রাইফেলস, বর্ডার ট্রুপস আর আসাম পুলিশ বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে লাগল কাছাড়বাসীর বুকের উপর দিয়ে। ৫ মে তারিখে এই জেলার পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একজন স্পেশাল ডি আই জি পাঠানো হল। এরমধ্যে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল হায়দার হোসেন সরেজমিনে কাছাড়ের পরিস্থিতি পরিদর্শন করে গেছেন। রাজধানী শিলঙে সেক্রেটারিয়েট ভবনে বিশেষ সেল খোলা হল। এদিকে কংগ্রেসের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্বের তরফে কাছাড় জেলার কংগ্রেস কর্মীদের সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার জন্যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল। এমনকি রাজ্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের তরফ থেকেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। কিন্তু কাছাড়বাসী তখন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-রাজনীতির দলীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সঙ্কল্পে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ।

সংগ্রাম সংগ্রাম চলছে
জনতার সংগ্রাম চলবে

সরকার তো নয় সে শয়তান
বেইমান চালিহা সাবধান।
যত আন মিলিটারি স্টেনগান
মাভৈ
মায়ের চরণে মোরা দিব বলিদান
সংগ্রাম চলছে, চলবে সংগ্রাম।

১৮ মে, সংগ্রাম পরিষদ সরকারি দমন নীতি ব্যবস্থা, বিভাজনের কূট-কৌশল ও হীন-হিংসা ষড়যন্ত্রের প্রতি জনসাধারণকে সজাগ ও সতর্ক থেকে আন্দোলনকে সফল করে তোলার আহ্বান জানান হল।

সেদিন ছিল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার শেষদিন। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র-যুব-জনতার মিছিলে সামিল হল। শিলচর-হাইলাকান্দি-করিমগঞ্জ সর্বত্রই একচিত্র। আন্দোলনের পীঠস্থান হল করিমগঞ্জ। কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ওই শহরে। নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্র নাথ সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী, মোহিতমোহন দাস প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও অন্য সহযোগীরা সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ দান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় সরকার নির্দেশিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে আন্দোলনের অঙ্গরূপে বরণ করে নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। স্থির হল যে করিমগঞ্জের নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী, নিশীথ রঞ্জন দাস গ্রেপ্তার এড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে আত্মগোপন করবেন। এদিকে শিলচর মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে পরিতোষ পাল চৌধুরীকে সংগ্রাম পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে ডিক্টেটর পাল চৌধুরীকে সর্বাবস্থায় গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলতে হবে। সেদিন বিকেলে শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভার পর হাজার হাজার জাগ্রত জনতার মিছিল শহরতলির পথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় শিলচরে বেরোল বিশাল মশাল মিছিল। ১৮ মের রাতেই করিমগঞ্জ শহরে গ্রেপ্তার হলেন নলিনী কান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী ও নিশীথ রঞ্জন দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

— "ওরে ওঠ ত্বরা করি
তোদের রক্তে-রাঙা ঊষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী।"

১৯শে মে, '৬১ ভোর তখন প্রায় ৪টা। করিমগঞ্জ স্টেশন প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ পথে একদল পুলিশ তখন পাহারায়। আরেক দল দাঁড়িয়ে রয়েছে রেল সাইডিং-এ। স্টেশন চত্বরের প্রবেশ পথে তখন দশজন মহিলা সত্যাগ্রহীর এক দল উপস্থিত হলে পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা এল। ক্রমে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন নারী-পুরুষ মিলে প্রায় পাঁচশত জন। পাশ কাটিয়ে অনেকে তখন ঢুকে পড়েছেন ভেতরে। চাপের মুখে কর্ডন গেল ভেঙে। পশ্চিমে রেলগেট, উত্তরের ঘাটলাইন আর পূব দিকের জনবসতির পাশ দিয়ে প্রবেশ করে প্রায় তিন হাজার সত্যাগ্রহী গোটা রেল স্টেশনের দখল নিয়ে নিল। হতচকিত দিশেহারা পুলিশের দল তখন রানিং রুমের পাশে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আধঘণ্টার মধ্যে বিশাল বাহিনী এসে পৌঁছল স্টেশন চত্বরে। সত্যাগ্রহীদের অবস্থান আর সংখ্যাধিক্য দেখে করণীয় কর্তব্য স্থির করতেই কিছুটা সময় তাদের কেটে গেল। শিলচরগামী ট্রেন ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে কিন্তু লোকোশেডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ইঞ্জিন নাড়তে পারল না। মরিয়া হয়ে পুলিশ তখন লাঠি আর বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সত্যাগ্রহীদের উপর। কিন্তু প্রচণ্ড মারেও কাউকে একচুল নড়ানো গেল না। ট্রেন ছাড়ার সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। শান্ত হয়ে পড়ল অত্যাচারী পুলিশ বাহিনী। এরপর দলে দলে গ্রেপ্তার করা হল সত্যাগ্রহীদের। স্থায়ী-অস্থায়ী সকল জেল ভরে গেল বন্দীতে। কোথাও আটকে রাখার জায়গা নেই। এরপর বাস আর ট্রাকে তুলে নিয়ে শহরের বাইরে অনেক দূরে ছেড়ে আসা হল সত্যাগ্রহীদের। পিছনে পিছনে ছুটল সংগ্রাম পরিষদের গাড়ি। দলে দলে আবার সবাই ফিরে আসে সংগ্রাম ক্ষেত্রে। বেলা ৮টার মধ্যে প্রায় ২০ হাজার মানুষ সমগ্র রেল স্টেশন চত্বর ঘিরে ফেলল।

শিলচর পুলিশের কাছে নাকি খবর ছিল যে বন্ধ ও সত্যাগ্রহের কার্যসূচি শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে। সে অনুযায়ী ভোর ৫-২০ মিনিটের ট্রেনটির যাত্রাসূচি ঠিক রেখে পরবর্তী সময়ের সবগুলি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয় এবং পুলিশ প্রশাসনের দিক থেকে সেভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৮ মে শেষরাতের দিকে দলে দলে সত্যাগ্রহীদের রেল স্টেশনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে পুলিশ কর্তাদের চক্ষু চড়কগাছ। কোনও সূত্র থেকেই এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এমন সম্ভাবনারও খবর ছিল না। স্টেশনে সে সময় যে নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশ দল ছিল তাদের পক্ষে সংগ্রামী সেনাদের ঠেকানো সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত তৎপরতায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর এক বিশাল দল ভোর চারটায় সেখানে উপস্থিত হল। এরই মধ্যে প্রায় দেড় হাজারের উপর সত্যাগ্রহী রেল লাইন, ইঞ্জিন, কামরা ও গোটা স্টেশন চত্বর দখল করে নিয়েছে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে প্রায় দশ থেকে বারো হাজার জনতা সমগ্র স্টেশন এলাকা, রাস্তাঘাট ও পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর, দোকানপাট ইত্যাদির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ও পথ জুড়ে সমবেত হয়েছে। সত্যাগ্রহীরা রেলপথে অবস্থান নেওয়ায় ইঞ্জিন ও কামরার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হতে পারেনি। ট্রেন ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, জয়ী হল সংগ্রামী জনতা। ভোরের আকাশ প্রকম্পিত করে হাজার হাজার কণ্ঠে উল্লাস ধ্বনিত হল —— 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ, বাংলাভাষা জিন্দাবাদ।'

অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্প, দৃপ্ত আত্মশক্তি আর গরিমায় বলীয়ান অহিংস মাতৃ ভাষা-সেনাদের কাছে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার দোয়ারা, ডি আই জি পুলিশ লালা, বি কে দে, সেনা ও পুলিশের কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল বাহিনী এই পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ৭-৩০ মিনিটে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ। ছোঁড়া হল কাঁদানে গ্যাস। সত্যাগ্রহীরা কাপড়, রুমাল, জল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়েই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। ব্যর্থ হল পুলিশের সেই প্রয়াস। এরপরই শুরু হল লাঠি চার্জ। বুটের লাথি, বন্দুকের বাঁটের আঘাত, বেধড়ক লাঠি পেটা, টেনে হিচড়ে বল প্রয়োগ করে কোনও অবস্থাতেই এক চুল নাড়ানো গেল না সত্যাগ্রহীদের। ক্রমে পুলিশের পোশাকের আড়ালের মানুষগুলো হিংস্র জানোয়ার হয়ে উঠল। 'কুকুরর পোয়ালি', 'কেলা বঙাল', 'হারামি কা বাচ্চা' ইত্যাদি অকথ্য, অশ্লীল বিদ্বেষ ও ঘৃণা মিশ্রিত গালাগালের সঙ্গে শুরু হল অবর্ণনীয় পৈশাচিক তাণ্ডব। নারী, পুরুষ, শিশু, তরুণ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা কেউ সেই বর্বরতা থেকে রেহাই পায়নি। বীরাঙ্গনা মা-বোনেরা জীবন পণ করে রেলপথ আঁকড়ে পড়ে আছেন, পায়ে, মাথায়, পিঠে দমাদম বুটের লাথি, ডাণ্ডা পড়ছে, তবু সত্যাগ্রহীরা অনড়, অটল হয়ে রইলেন। নিরুপায় পুলিশ দল বেঁধে এক একজনকে জোর করে টেনে দূরে পাথরের উপর আছড়ে ফেলছে- এ এক নিদারুণ, নিষ্ঠুর, ভয়াবহ চিত্র। করিমগঞ্জ রেলস্টেশনেও পুলিশি গুণ্ডাদের এই একই ধরনের অত্যাচার চলছে। মহিলা সত্যাগ্রহীদের চুলে ধরে টেনে তুলতে ব্যর্থ হয়ে কাপড় ধরে টান মেরে বিবস্ত্র করে পাঁজাকোলা করে সেই রেল পথের উপর, পার্শ্ববর্তী ডকের উপর ছুঁড়ে মেরেছে। অত্যাচারের এই বীভৎসতা উপস্থিত জনতাকে উত্তেজিত করে তুলেছে, তবু অসীম ধৈর্য নিয়ে সবাই শান্ত ও সংযত থেকেছেন। শিলচর রেলস্টেশনে আহত সত্যাগ্রহীদের তুলে নিয়ে সেবাদল তাদের পৌঁছে দিচ্ছেন স্টেশনেরই দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জনপ্রিয় নেতা সতীন্দ্র মোহন দেবের বাড়িতে। সেখানে ধীরেন্দ্র দেবের চেষ্টায় রেডক্রস রিলিফ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অপূর্ব দত্ত, ডাঃ নাথ, ডাঃ ভৌমিক, ডাঃ মোহন্ত, ডাঃ সান্যাল ও তাঁদের সহযোগীদল অনেক শ্রম ও যত্নে এই কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছেন। বেলা দশটার মধ্যেই ৫২ জন আহত সত্যাগ্রহীদের সেখানে শুশ্রূষার জন্য নিয়ে আসা হল। এঁদের মধ্যে অনেকের আঘাত বেশ গুরুতর হওয়ায় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। গ্রেপ্তার-অত্যাচার-লাঠি —— এভাবেই চলল বেলা ১২টা পর্যন্ত। অহিংস সংগ্রামের নৈতিক বলের কাছে নিপীড়ন ও অত্যাচার যখন হার মানল তখন রাজদণ্ড তার হিংস্র থাবাকে গুটিয়ে নিল। কিন্তু গোপনে তখন চলছিল অপর

এক হীন অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। এরই মধ্যে পুলিশ এইবলে ডায়েরিতে নথিবদ্ধ করল যে সত্যাগ্রহীরা নাকি এক পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বেলা তখন ২-৩০ মিনিট। কাটিগড়া থেকে ৪ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে হাতে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ বেষ্টিত একটি ট্রাক এসে প্রবেশ করল শিলচর শহরে। সে সময় তারাপুরে রেল স্টেশনের প্রবেশ পথে, বাস স্ট্যান্ডের মধ্যে, রাস্তায় হাজার হাজার লোকের ভিড়। ট্রাকটি পুলিশের নির্দেশে ভিড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ল। হাতকড়া বাঁধা সত্যাগ্রহীদের দেখে সমবেত জনতা 'বন্দে মাতরম', 'মাতৃভাষা জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তুলল। ড্রাইভার ট্রাকটি সেখানে দাঁড় করিয়েই সরে পড়ে। পুলিশেরা ট্রাক থেকে নেমে যান্ত্রিক গোলযোগের অছিলায় বনেট খুলে যন্ত্রপাতি দেখার ভান করতে লাগল। এর মধ্যে ট্রাকে লেগে গেল আগুন। পুলিশের সন্দেহজনক কাজ-কর্ম ও পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিণতির ভয়াবহতার কথা ভেবে সঙ্গে সঙ্গে সত্যাগ্রহী ও স্বেচ্ছাসেবকের দল আগুন নেভাতে তৎপর হয়ে ওঠে। রেডক্রস-রিলিফ কার্যালয় থেকে দমকল বাহিনীকে খবর পাঠানো হল। ডি আই জি ও পদস্থ মান্যগণ্যরা যখন ঝড়ের বেগে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তার আগেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। জনতার মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই, ট্রাকের পুলিশেরা 'আগুন আগুন' চিৎকার করেই পালিয়ে গেছে। সবকিছুই ঠিকঠাক, তবু আসাম রাইফেল্স-এর জোয়ানদের লেলিয়ে দেওয়া হল শান্ত, অহিংস জনতার উপর। শুরু হল বন্দুক আর বেয়নেট দিয়ে চার্জ। পরিকল্পিতভাবে সমবেত জনতাকে স্টেশনের প্রবেশ পথের দিকে ঠেলে দিয়ে ডি আই জি, লালা বি কে দের নেতৃত্বে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করল সামরিক বাহিনী। দলবল নিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই তারা অতর্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। ঘড়িতে সময় তখন ২-৩৫ মিনিট। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তাজা প্রাণ। অত্যাচার ও বুলেটকে বুকের রক্তে অভ্যর্থনা জানাল বীর মাতৃ-ভাষা সেনানীরা।

রেড ক্রস কার্যালয়ে বীর শহীদদের গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝরা দেহ ঘিরে জনসমুদ্র তখন স্তব্ধ ও হতবাক। কোনও হাঙ্গামা নেই, ন্যূনতম প্ররোচনা নেই, কোনও সতর্কীকরণ নেই, কিন্তু একী —— একী বর্বরতা, নৃশংস হত্যাকাণ্ড! একটি বুলেটও শরীরের নীচে নয়, পিঠে নয় সবই পেট, বুক আর মাথা লক্ষ্য করে ছোড়া হল। স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক সরকারের একী নারকীয় বীভৎস হিংস্র আচরণ! রেডক্রস-কার্যালয়ে প্রথম যে দেহটি স্বেচ্ছাসেবকেরা পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলেন সেটি ছিল শহীদ শচীন্দ্র মোহন পালের। ভাষা জননীর রক্ত-ঋণ শোধ করতে একে একে শহীদ হলেন চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হীতেশ বিশ্বাস, তরণী দেবনাথ, কুমুদ দাস, সুকোমল পুরকায়স্থ, সুনীল সরকার, কানাইলাল নিয়োগী ও কুমারী কমলা ভট্টাচার্য। বিদ্যুৎ বেগে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র শিলচর শহর ও জেলার সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এল। হত্যাযজ্ঞ সাঙ্গ করে শস্ত্র বলে বলীয়ান কাপুরুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা শহর জুড়ে। জারি করা হল কার্য্য। অহিংস পূজারীদের খুন করে হত্যাকারীরা চাইল সন্ত্রাস জাগিয়ে আন্দোলন ও ক্ষোভের টুটি টিপে মারতে। সরকারি যন্ত্র থেকে প্রচারিত হল যে, শান্তি ভঙ্গের আশংকায় জনগণের জান মাল রক্ষার দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। কী নিষ্ঠুর পরিহাস। লক্ষ লক্ষ জনতার অধিকারকে দমন করতে নর রক্তে রঞ্জিত হয়ে সেই রক্তপিপাসুরাই জনগণের জন্য শান্তি স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

এদিকে ঊনিশ মে বরাকের বুকে যখন হিংস্র তাণ্ডব চলছে তখন কাছাড় জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বের একদল প্রতিনিধি গৌহাটিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুজির সঙ্গে বৈঠকের জন্য অবস্থান করছেন। রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে এ দিকে যে সরকার শহীদের উষ্ণ রক্ত স্রোতে দুহাত রঞ্জিত করে পিশাচ তাণ্ডবে মত্ত, গৌহাটি শহরের বুকে, সেই সন্ধ্যায়, সেই সরকারেরই আয়োজিত রবীন্দ্র শতবর্ষ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী চালিহা কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গুণ কীর্তন করলেন। নেহরু এক ভাষণে বললেন যে, 'আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ ভাষার দাবি

আদায়ের পথ নয়। কাছাড়ের বাঙালিদের এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

সমগ্র বরাক উপত্যকার লক্ষ লক্ষ মানুষ উত্তেজনায় ক্ষোভে ও মর্মবেদনায় বিনিদ্র রাত কাটাল। সে রাতেই হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছে গেল দেশের সর্বত্র। ২০ মে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেত লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী ও শত শত নাগরিক ভাষা শহীদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃতি দেবার জোরালো দাবি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও অন্যান্য বাম দলগুলি সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কার্যসূচি গ্রহণ করে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ সহ, আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই জঘন্যতম অপরাধের প্রতিবাদে সভা, মিছিল ও শোকদিবস পালিত হয়। এদিন বরাক উপত্যকার সর্বত্র পালিত হয় প্রতিবাদ হরতাল। কালো ব্যাজ ধারণ করে, ঘরে ঘরে কালো পতাকা তুলে নীরবে ধিক্কার জানাল লক্ষ লক্ষ বরাকবাসী। স্থানীয় বণিক সভা, পুলিশ ও জামরিক বাহিনীর সবধরনের খাদ্য দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করে দিল। যে সমস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পুলিশ বিভাগের লোক হত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিল, তাদেরও সামাজিকভাবে বয়কট করা শুরু হল। শিলচর ও করিমগঞ্জ জেলে বন্দী সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে অন্যান্য কয়েদিরা এদিন সন্ধ্যায় উপবাস থেকে এক শোকসভার আয়োজন করে। ছাত্র যুব সংগ্রাম সমিতি এক সভায় মিলিত হয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে হত্যাকাণ্ড ও দমন-পীড়নের প্রতিবাদে আসন্ন ডিগ্রি পরীক্ষা বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে সর্বত্র সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এদিন সন্ধ্যায় শিলচরের বুকে বেরোল এক অভূতপূর্ব শোকমিছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক' সামিল হল সেই অন্তিম যাত্রায়। মহাশ্মশানে চোখের জলে নয়টি শবদেহকে শেষপ্রণাম জানিয়ে লেলিহান চিতার আগুন স্পর্শ করে শপথ নিল শোকাহত সংগ্রামী জনতা —

শহীদের রক্ত ঋণ শোধ করব।
জান দেব তবু জবান দেব না।
শহীদ তোমাদের ভুলব না।

এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী চালিহা সংগোপনে গোহাটি থেকে শিলচরে এসে পৌঁছন। কড়া সামরিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে সারাদিন তাঁকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটাতে হয়। এদিনই সকাল বেলা শিলচর রেলস্টেশনের পার্শ্ববর্তী পুকুর থেকে উদ্ধার করা হল শহীদ সত্যেন্দ্র কুমার দেবের ক্ষতবিক্ষত দেহ। রাতে খবর এল হাসপাতালে বীরেন্দ্র সূত্রধরও শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন।

২১ মে সমগ্র বরাক উপত্যকা জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বন্ধ-হরতাল অব্যাহত রইল। আসামের রাজ্যপাল জেনারেল নাগেশ শহীদ পরিবারদের সমবেদনা জ্ঞাপন করে শোকবার্তা পাঠালেন শিলচর পৌরসভার সভাপতি মহীতোর পুরকায়স্থের কাছে। পুরকায়স্থ সেই বার্তা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

'বল আর কতজনকে হত্যা করবে?
প্রাণ নিয়েছ, আরও প্রাণ বলি দেব
বল কত প্রাণ চাও?'

—— কালো পতাকা আন্দোলিত করে ধিক্কার ধ্বনি তুলে, কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাল ক্ষুব্ধ জনতা। শিলচর, সহ কাছাড় জেলার সর্বত্র রেল কর্মচারীরা প্রতিবাদে এদিন কর্মবিরতি পালন করেন। শহীদ কানাইলার নিয়োগী ছিলেন শিলচর রেল স্টেশনেরই একজন কর্মচারী। করিমগঞ্জ ও শিলচরের বার অ্যাসোসিয়েশন সুপ্রিম কোর্টের একজন, বিচারপতিকে দিয়ে ১৯ মের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। রণেন্দ্র মোহন

দাস এক বার্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে উদ্ভুত সংকটজনক পরিস্থিতির আশু সমাধান প্রার্থনা করেন। করিমগঞ্জ। জেলা কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে দাস কংগ্রেস দলীয় নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সদস্য, সকল সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার পদাধিকারীদের অবিলম্বে পদত্যাগ করে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য অহিংস আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান। এ দিনই জ্যোৎস্না চন্দ, রণেন্দ্র মোহন দাস ও বিশ্বনাথ উপাধ্যায় তাঁদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। শিলচর মহকুমার সংগ্রাম পরিষদের নেতা পরিতোষ পাল চৌধুরী এক আবেদনে সংগ্রামের পরবর্তী কার্যসূচি ঘোষণা করেন।

এদিন সন্ধ্যায় শিলচর শহরে হাজার হাজার শোকার্ত নর-নারী নীরবে শহীদ সত্যেন্দ্র দেব ও শহীদ বীরেন্দ্র সূত্রধরের শবদেহ নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা করে পথ পরিক্রমা করে। শোকসন্তপ্ত শহীদ পরিবার ও পরিজনদের উদ্দেশে আসামের রাজ্যপাল জেনারেল নাগেশের প্রেরিত শোকবার্তা জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা মারফত হাতে এলে তীব্র ঘৃণায় শহীদ পরিবারের লোকেরা সেই বার্তাটি চিতার আগুনে নিক্ষেপ করেন। মহাশ্মশানে সেই রাতে শোকাহত হাজার হাজার নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবক নীরব হাহাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চোখের জলে চিতার আগুন নিভিয়ে বীর শহীদদের পূত চিতাভস্মে ললাট টীকা ধারণ করে শ্মশানের উত্তাপ বুকে নিয়ে স্তব্ধ মৌনতা ভেঙে গভীর রাতের পৃথিবীর বুক প্রকম্পিত করে হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হল 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি। হুংকারে গর্জে উঠল শোকাহত সংগ্রামী জনতা —

'বীর শহীদদের অপর নাম সংগ্রাম,
সংগ্রাম —
সংগ্রাম চলছে চলবে।'

গণ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ২১ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত সমগ্র জেলায় প্রতিবাদ হরতালের কার্যসূচি ঘোষণা করা হল। ২৪ মে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পালিত হল প্রতিবাদ দিবস। প্রায় ৭৫ হাজার জনতা এক শোক মিছিল করে শহীদদের চিতাভস্ম বহন করে আদি গঙ্গায় সেই পূত ভস্মাধার বিসর্জন দিলেন। শিলচর শহরে এদিন রাখীবন্ধন উৎসব পালন করে ২০ হাজার সত্যাগ্রহী সংগ্রামের শপথ নিলেন। ২৫ মে আসাম রাজ্য কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ফণী বরা এক বিবৃতি প্রকাশ করে কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করে দলীয় সদস্য ও সমর্থকদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার আহ্বান জানান। ২৬ মে তারিখে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে সমগ্র জেলায় ঈদের নামাজের পর বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে ১৯ মের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শোক মিছিল নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। এদিন গৌহাটির আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকার নির্লজ্জ ভূমিকার নিন্দা করে শিলচর থেকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ২৭ মে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপের সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির যৌথ নেতৃত্বে হাজার হাজার প্রতিবাদী জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও কালো ব্যাজ ধারণ করে শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এদিন চালিহার প্রস্তাবিত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে করিমগঞ্জ, শিলচর ও হাইলাকান্দি এই তিন জেলা কংগ্রেস কমিটি এক সভায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এদিনই শিলং থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বার্তায় গোপালজি মেহরোত্রাকে চেয়ারম্যান করে ১৯ মের গুলিচালনার বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়।

২৯ মে ছিল ভাষা শহীদ তর্পণ দিবস। এদিন সমগ্র কাছাড় জেলায় হরতাল, অরন্ধন, চিতা ভস্ম। নিয়ে মিছিল, মন্দিরে মন্দিরে যজ্ঞ, বেদপাঠ, নাম সংকীর্তন, মসজিদে মসজিদে বিশেষ প্রার্থনা, গীতা, কোরাণ, বাইবেল পাঠ ইত্যাদির মধ্য নিয়ে শহীদ তর্পণ করা হয়। শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে

সমষ্টিগত শ্রাদ্ধ বাসরেরও আয়োজন করা হয়। বরাক, কুশিয়ারা, ধলেশ্বরী, লঙ্গাই, সোনাই প্রভৃতি নদীতে চোখের জলে চিতাভস্মাধার বিসর্জন দিয়ে, অব্যাহত সংগ্রামের শপথ নিয়ে বরাক উপত্যকাবাসী সেদিন। গভীর রাতে ঘরে ফেরে। এদিনই শিলঙে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা-ভাষী সমিতির কার্যকরী কমিটির এক সভায় মিলিত হয়ে ৪ জুন তারিখে সমগ্র আসামে 'দাবি দিবস' উদ্যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।। সমগ্র ত্রিপুরায়ও দিনটি শোক দিবস রূপে প্রতিপালিত হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী রাজ্যভাষা সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে ৩ জুন শিলচর এসে পৌঁছলে প্রায় দশ হাজার নরনারী বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি দুদিন ধরে কাছাড়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেও কোনও মীমাংসা সূত্রে উপনীত হতে পারলেন না। শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে কটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবগুলির একটির মধ্যে বলা হয় যে, বাংলা ভাষাকে কাছাড়ে জেলা পর্যায়ে স্বীকৃতি দান করতে হবে এবং সরকারি কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে কাছাড়ের সঙ্গে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হবে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোনও জেলায় শতকরা অন্তত ১৫ ভাগ অধিবাসী যদি দাবি করে তাহলে বাংলা কিংবা অন্যান্য সংখ্যালঘু যে কোনও ভাষিক গোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে কয়েকটি প্রস্তাবও রাখেন। মাননীয় মন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, আসামে বঙ্গভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম করার জন্যে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরে যাতে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন রূপে গণ্য করা হয় তার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। তিনি এও জানান যে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের জন্য শীঘ্রই এম এ ক্লাশ শুরু করা হবে। মহকুমা পরিষদ বিধি বাতিল করা ও কাছাড় জেলায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ ও সত্যাগ্রহীদের অবিলম্বে বন্দী দশা থেকে নিঃশর্ত মুক্তিদানের দাবিও আলোচনায় উত্থাপিত হয়।

শিলচর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, বার অ্যাসোসিয়েশন এবং ছাত্র প্রতিনিধিদের এক সম্মিলিত সভায় শাস্ত্রী বলেন যে, অতীত ঘটনাবলির আলোচনা করে লাভ নেই, এখন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটি স্থায়ী সমাধানের পথে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে সকল পক্ষকে কিছুটা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। সমগ্র আসামে বঙ্গ ভাষাভাষী ও অসমিয়া ভাষীদের মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন যে, সবার আগে এই সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটানো প্রয়োজন। ১৯ মের গুলিবর্ষণের প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে 'ইহা শোচনীয় এবং ভীতিজনক।' শাস্ত্রী আলোচনা শেষে হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে আহত সত্যাগ্রহীদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, শিলচর সফরকালে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শাস্ত্রীজির কোনও আলোচনা-বৈঠক হয়নি, কার্যত তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হয়। গৌহাটি ফিরে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে আলোচনা শেষে তিনি রাজবানী শিলঙে মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহার সঙ্গে মিলিত হন। শাস্ত্রীজি অবশ্য তাঁর এই সফরকে বিশেষ আশাব্যঞ্জক বলেই অভিহিত করেছেন এবং বিভিন্ন আলোচনার মধ্য থেকে কাছাড় এমনকি সমগ্র আসামের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে বলে একটি সমাধান সূত্রও প্রদান করলেন। ৬ জুন তারিখে আসাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শাস্ত্রীজি প্রদত্ত মীমাংসা সূত্রের প্রস্তাবগুলির সংক্ষিপ্ত বয়ান ছিল এরকম : -

"1. The Assam Official Langnage Act may be amended to do away with the provision relating to Mahakuma Parishads.

2. Communication between State Head Quarters and Cachar and the Autonomous Hill Districts to continue in English until replaced by Hindi.

3. At State level English will continue to be used for the present. Later, English will continue to be used along with Assamese.

4. The linguistic minorities in the state will be accorded the safeguards contained in the Government of India's Memorandum dated September 19, 1956.

5. Clarification may issue that under the provisions of Act 348(3) of the Constitution all Acts, Bills, Ordinances, Regulations and Orders etc., will continue to be published in the Official Gazette in English, even where these are published in Assamese under the Second Proviso to Section 3 of the Official Language Act.

6. Some arrangements to be considered for effective implementation of development Schemes at the District level.

7. The agitation in Cachar should be withdrawn.

8. The Assam Government may consider the release of all prisoners detained in connection with the movement, except those charged with crimes involving violence and sabotage, as soon as they are satisfied that the movement will not be resumed."

মুখ্যমন্ত্রী চালিহা উক্ত প্রেস বিবৃতিতে আশ্বাস দিলেন যে, Having taken into consideration the feeling in Cachar against the provision concerning Mahakuma Parishad in Section 5 of the Official Language Act, and the advice of the Prime Minister and the Union Home Minister, the Government have decided to Sponsor an amendment to the Act deleting this provision. This should allay the apprehension in the minds of Cachar people regarding the use of Bengali Language at district level in Cachar.

The rules consistent with the basic principles of the act will be so framed that the correspondence with Cachar and Autonomous District administrations from the Secretariate and the Heads of the Departments would be in English and when replaced, in Hindi.

Of the qualifications for recruitment to the Assam Civil Service and allied provincial Posts, the knowledge of Assamese or Bengali or a Tribal Language of the State is essential. This is proposed to be continued even after the enforcement of the Assam Official Language Act. There is no intention to make the knowledge of Assamese Compulsory for recrueitment to service. In this connection attention to proviso (c) to clause 7 of the Assam Official Language Act is also drawn.

শাস্ত্রীজির সূত্র, মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক রাজ্যভাষা আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনীতে মহকুমা পরিষদ বিধি বাতিল ইত্যাদি বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সঞ্চার ঘটল আর বরাক উপত্যকায় সংগ্রাম পরিষদের নেতারা আন্দোলনের কার্যসূচি অনুযায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তেই আপাতত অটল থাকলেন।

কাছাড় জেলা গণ সংগ্রাম পরিষদের কার্যক্রম অনুযায়ী ৬ জুন পর্যন্ত নব পর্যায়ের আন্দোলন সমগ্র উপত্যকায় আবার শুরু হল। এই কার্যসূচির মধ্যে ছিল গ্রামে — (১) সভা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে গ্রামে গণ সংযোগ ও প্রচারের দ্বারা রাজ্য সরকার ও তার পোষা দালালদের দ্বারা সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক

বিদ্বেষ ভাব ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনমত সংহত করা, (২) কাছাড় জেলার লোকসভা, বিধানসভা, মিউনিসিপ্যালিটি, টাউন কমিটি, মহকুমা পরিষদ, গাঁওসভা, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত প্রভৃতির মনোনীত কিংবা নির্বাচিত সদস্যদের পদত্যাগ করে সরকারের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগের আহ্বান, (৩) রাজ্য সরকারের অফিস ও আদালতগুলিতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং ও অবস্থান ধর্মঘট, (৪) ১৪৪ ধারা কিংবা সান্ধ্যআইন জারি হলে শান্তিপূর্ণ ও অহিংসভাবে তা অমান্য করা।

৯ জুন করিমগঞ্জ শহরে সংগ্রাম পরিষদের এক জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয় এবং এই বৈঠকে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর, সমাধানসূত্র ও পরবর্তী পরিস্থিতিতে সংগ্রাম পরিষদের কর্তব্যকর্ম নিয়ে বিস্তর পর্যালোচনা ক্রমে আরও তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫ জুন দিল্লি থেকে প্রেরিত এক বার্তায় শাস্ত্রীজি সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সদিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বৈঠকে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৬ জুনের সভায় শাস্ত্রীজির প্রস্তাবিত আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামের কার্যসূচি পুনর্বিবেচনা করে তা আপাতত স্থগিত রাখার এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং যে- পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহীদের জেল থেকে মুক্তি দান করা হয় সে-বিষয়েও বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। এই সভা আসন্ন দিল্লি বৈঠকে যোগদান করার জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল নির্বাচন করে এবং বিগত কাছাড় জেলা জন সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক দাবিপত্র পেশ করারও প্রস্তাব গ্রহণ করে। শাস্ত্রীজির প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ও সম্মান জানাতে ১৭ জুন থেকে আন্দোলনের কার্যসূচি তিনমাসের জন্য স্থগিত রাখার এক প্রস্তাবও সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অপর দিকে শাস্ত্রীজির অনুরোধক্রমে নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা-ভাষী সমিতিও তাঁদের প্রস্তাবিত 'সারা আসাম দাবি দিবস' পালনের কার্যসূচিও বাতিল করে দেন। ১৯ জুন, কাছাড়ের গৌরবময় ইতিহাসের এক কলংকজনক দিন। যে-বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে জেলার সচেতন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঐক্য ও সম্প্রীতিকে অটুট রাখার জন্যে নিরলস সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করলেন, প্রতিক্রিয়াশীল, দাঙ্গাবাজ, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে বারবার সতর্ক করে দিলেন, তা ব্যর্থ হল। বাঙালির জাতিসত্ত্বা বিরোধী এক পাশবিক শক্তি আসাম সরকার ও একদল অসমিয়া সম্প্রসারণবাদী প্রবক্তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনকে, সংখ্যালঘু বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য হিংস্র হাঙ্গামায় লিপ্ত হল। এই স্বজাতিদ্রোহী পিশাচরা ধর্মের জিগির তুলে, বাঙালি হয়েও 'অসমিয়া আমাদের মাতৃভাষা' এই ধ্বনি তুলে লুণ্ঠন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি সব ধরনের অপরাধই সংঘটিত করল। হাইলাকান্দি শহরে এ-দিন পুলিশের গুলিতে ১০ জন দাঙ্গাবাজ নিহত হল। সমাজ-বিরোধী ও অপরাধপ্রবণ মানুষদের সংগঠিত করে সৃষ্ট এই সন্ত্রাস ছিল একতরফের ও ষড়যন্ত্রমূলক। আশা ও ভরসা ছিল এই যে, কাছাড় জেলার জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জাগ্রত জনতার দৃঢ়তা পরিকল্পিত এই হাঙ্গামার প্রসার ঘটতে দেয়নি এবং সমগ্র জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অটুট রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই হাঙ্গামার পিছনে যে শয়তানি নেতৃত্ব এই জেলায় তৎপর ও সক্রিয় ছিল সেই শক্তিই নানাভাবে ভাষা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়ে তাঁদের সামাজিকভাবে হেনস্থা করার চেষ্টায়ও রত ছিল। এই আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন মূলত এই কাছাড় জেলারই মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট সংগ্রামী রাজনীতিক ও সুধীজন যাঁরা সকল সমাজের নিকটই শ্রদ্ধেয় রূপে গণ্য ছিলেন। হাইলাকান্দিতে সংঘটিত এই উন্মত্ত তাণ্ডবে লিপ্ত অপরাধীদের আড়াল করা, এসব সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং তাদের অপকর্মকে ভাষা আন্দোলনের যথাযথ ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে অভিমত ব্যক্ত করার জন্যে মাননীয় মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে সেসময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নিকট অভিযোগও করা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আসাম সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যে সংঘটিত সন্ত্রাস, ৬০-এর ভয়াবহ

পরিকল্পিত গণহত্যা, অত্যাচার এবং রাজ্য ভাষাকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত সমস্যাবলির প্রেক্ষিতে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেবার দাবি জানিয়ে এক স্মারকপত্র গণ সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ দিল্লিতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নিকট প্রদান করেন। ২ ও ৩ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রতিনিধি দল ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে সংখ্যালঘু অনসমিয়া ভাষিক গোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকারকে সুরক্ষিত করা এবং বাংলা ভাষাকে অসমিয়া ভাষার সঙ্গে রাজ্য ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও এই স্মারকপত্রে দাবি করেন। কার্যত এই বৈঠকেও কোনও ফলপ্রসু ঐকমত্যে কোনও পক্ষই পৌঁছতে পারেননি বলে মনে হলেও কাছাড় জেলার জন্য বাংলা ভাষার অধিকারকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার স্বীকার করে নেবার ফলে, গণ সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে, শাস্ত্রীজির সূত্রকে মেনে নিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার সপক্ষে জোর তৎপরতা শুরু হয়। অপরদিকে, সংশোধনী প্রস্তাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সংখ্যালঘু বাংলা ভাষা-ভাষীদের ভাষিক অধিকার রক্ষার দাবিকে সম্পূর্ণভাবেই অস্বীকার করার ফলে ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে নতুন করে আন্দোলনের কার্যসূচি নিয়ে ২০ আগস্ট তারিখে এক যুব কনভেনশন আহ্বান করা হয়। কাছাড় জেলা গণ সংগ্রাম পরিষদও উদ্ভুত পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ২৪ ডিসেম্বর তারিখে করিমগঞ্জে 'কাছাড় জেলা জন সম্মেলন' আহ্বান করেন।

বাংলা ভাষাকে আসামের দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা রূপে স্বীকৃতি ঘোষণা এবং অন্যান্য অনসমিয়া ভাষার যোগ্য মর্যাদা আদায়ের দাবিতে শিলচর শহরে সুধীর কুমার রায়ের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করা হয় এবং দাবির প্রতি সমর্থন ও জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লি অভিমুখে পদযাত্রার কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়। এই অভিযানকে সফল করে তুলতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানিয়ে জনগণের উদ্দেশে এক আবেদনপত্র প্রচার করা হয়। এই পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সতীন্দ্র মোহন দেব, মহীতোষ পুরকায়স্থ, তারাপদ ভট্টাচার্য, গোবিন্দলাল পাল, গোলাম ছবির খান, সুখময় সিংহ ও হুরমত আলি বড়লস্কর। দিল্লি সফর শেষ করে পদযাত্রীদল ১ এপ্রিল, '৬২ তারিখে শিলচরে এক সভার আয়োজন করেন। পদযাত্রীদলের কার্যনির্বাহী কমিটির এই সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'বাংলাকে আসামের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি ঘোষণার এবং অন্যান্য প্রতিটি অনসমিয়া ভাষার যোগ্য মর্যাদা আদায়ের ইতিপূর্বের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার পক্ষপাতী এবং বদ্ধপরিকর। সভা প্রয়োজন হইলে আবারও জনগণকে এই দাবি আদায়ে চরম ডাক দেওয়ার পক্ষপাতী।'

সভায় গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাবে কাছাড় জেলা গণ সংগ্রাম পরিষদ ও নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষা-ভাষী সমিতিকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সক্রিয় বৃহত্তর সংগ্রামী ব্যবস্থা গড়ে তোলারও আহ্বান জানানো হয়।

আসামে রাজ্য ভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাজ্য ভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে যে-আন্দোলন ৬০ সালে শুরু হয়েছিল তার সূচনা কাছাড় জেলাতেই ঘটে এবং এখানেই ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় গণ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল। একাদশ শহীদের রক্তের বিনিময়ে একমাত্র কাছাড় জেলায়ই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র রাজ্য জুড়ে কোনও ব্যাপক গণ আন্দোলন বাংলা ভাষার স্বপক্ষে সংঘটিত করা সম্ভব হয়নি এবং বাস্তবে তা অসম্ভবও ছিল। শাস্ত্রীজির সূত্রের উপর ভিত্তি করে বিধানসভায় গৃহীত সংশোধিত ভাষা আইনে কাছাড়ে বাংলা ভাষার অধিকারকে স্বীকার করে নেবার পর কার্যত বাংলাভাষা আন্দোলনের অবসানই ঘটে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দলীয় রাজনীতি আর ভোটের বাক্সের হারজিতের খেলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শহীদের রক্তস্রোতকে ন্যস্ত স্বার্থের নোংরা নর্দমায় টেনে নামিয়ে সেসময় ভাষা সংগ্রামের গৌরবকেই শুধু অপমান করা হয়নি,

বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাগরণের যে ভিত্তি গড়ে তোলা হয়েছিল সেটিকেও পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার সুযোগ করে দেওয়া হল। এর অনিবার্য পরিণাম প্রত্যক্ষ করতে কাছাড় জেলা তথা সমগ্র আসাম রাজ্যের ভাষিক সংখ্যালঘু বিশেষত বাঙালিদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ -এই সময়কালের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল আসাম। বিভাজনের রাজনীতি, ন্যস্ত স্বার্থের দালালি, পরগাছাবৃত্তি, চাকুরিকে পণ্য করে সওদা, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ পরিবেশ সৃষ্টি সমগ্র রাজ্যে বিশেষত কাছাড় জেলায় এক ভয়াবহ সার্বিক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটাল। সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে শিক্ষার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে শুরু হল আবার তাণ্ডব। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকারকে হরণ করে সামগ্রিকভাবে আসামের বাঙালির ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তাকে চিরকালের জন্য পঙ্গু ও অসহায় করে অনুগ্রহ আশ্রিত ও পরজীবী করে তোলার প্রয়াস অব্যাহত থাকল। অসমিয়া ভাষা রাজ্য ভাষা হোক কিংবা শিক্ষার মাধ্যম অসমিয়া ভাষা করা হোক এর বিরুদ্ধে বাঙালি আপত্তি তোলেনি, কিন্তু সেই সঙ্গে সে তার মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের ন্যায়সঙ্গত ও সংবিধান স্বীকৃত অধিকারটি লাভ করার দাবি উত্থাপন করেছে মাত্র। শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে, পুনরায় রাজ্য ভাষা প্রণয়নের সময়কালের মত বিতর্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টি হল। আসামের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র ও সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা-নীতি নির্ধারক শক্তি, উগ্রতাবাদী ছাত্রসমাজ ও শাসকগোষ্ঠীর সম্প্রসারণবাদী আমলা পক্ষ ও রাজনীতিক, একমাত্র অসমিয়াকে শিক্ষার মাধ্যম করার স্বপক্ষে যে ভূমিকা পালনে অগ্রণী হয়ে উঠলেন তা সংখ্যালঘু বিশেষত বাংলা ভাষা-ভাষীদের পক্ষে আবারও আতংক ও ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াল। প্রগতিবাদী, মুক্তবুদ্ধি ও উদার মানবিক যে অসমিয়া গোষ্ঠী তাঁরা উগ্রজাতীয়তাবাদীদের চণ্ড রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে কিংবা অসহায় দর্শক মাত্র হয়ে উঠতে বাধ্য হলেন। মুষ্টিমেয় যে দু-একজন এই উগ্রতার প্রতিবাদে কিছুটা সোচ্চার হতে সচেষ্ট হলেন তাঁদের লাঞ্ছিত হতে হল।

২৬ মার্চ '৬৭, শিক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সূত্র ধরে, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসমিয়া ও ইংরাজীকে নিয়ে দ্বিভাষিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের প্রস্তাব করেন। ২৭ এপ্রিল '৬৮ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিল শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে শিক্ষা কমিশনের সূত্রগুলি পর্যালোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে- "As regards the Post-Graduate stage, the council accepts the recommendation of the Vice Chancellors' Conference which says that the question of medium of instruction loses its meaning in the Post-Graduate Course as students will have to depend on books and journals in English and other World Languages. The Council also agrees that the importance of English should be fully recognised and adequate arrangements made for the study at Under Graduate level."

১৬ মে '৭০, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আংশিক পরিবর্তন করে ঘোষণা করেন যে, "the change over to regional Language in the Pre-University Course be affected from 1972-73 and the previous decision regarding medium of instruction be adhered to and instruction be imparted only in Assamese or English but option should be given to the students to answer in Assamese or in Bengali or English and Hindi."

১৯ ফেব্রুয়ারি '৭২-এ একাডেমিক কাউন্সিল এক সভায় মিলিত হয়ে বিশেষ আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত নেন যে, "The Academic Council held on 19-2-72 while discussing implementation of its decision relating to change over of the medium of instruction in the

two-year Pre-University Course followed by two-year Degree Course arrived at the consensus that Assamese would be the medium of instruction. Only to midgate the difficulties of Linguistic Minorities English was permitted as an alternative Media. Regarding Bengali in Cachar the Council agreed that the matter should be again taken up after the General Election."

৬ জুন '৭২-এ একাডেমিক কাউন্সিল পুনরায় বিষয়টি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "So far as the Medium of Instruction is concerned throughout jurisdiction of this University, it should be either Assamese or English. As for the medium of Examination in concerned the Council agrees to adhere to its previous decision of 16-5-70." ইতিমধ্যে সমগ্র আসাম জুড়ে শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে অশান্তির দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন গণ সংগঠন, শিক্ষক সংস্থা, ছাত্র সংগঠন, সংবাদপত্র এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট দাবিপত্র পেশ করতে শুরু করে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় ও বিভিন্ন চাপের মুখে ১২ জুন তারিখে একাডেমিক কাউন্সিল এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, "The Council on reconsideration and after due deliverations is of the view that if a language which is not a medium of instruction is allowed as the medium of Examinations it may lead to complications besides defeating the vary purpose of instructions of the Regional Language as medium of instructions."

In partial modification of its earlier decision the Academic Council resolves that :

(i) Assamese shall be the medium of instruction in all Colleges under the jurisdiction of Gauhati University.

(ii) English shall continue as an alternative medium of instruction till such time, not exceeding ten years, as may be considered necessary by the Academic Council.

(iii) Students shall have the option to answer either in Assamese or English in the University Examination.

(iv) The above decision shall come into force with effect from the session 1972-73 in respect of T'vo-year Pre-University Course and from the Session 1974-75 in respect of Two-year Degree Course.

আসামের শিক্ষা জগতের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক অন্যতম একটি সংস্থার এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত বিষয়কে আরও জটিল করে তোলার সুযোগ দিল। কালক্ষেপ ও চাপের মুখে ঘড়ি ঘড়ি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন এবং কাছাড়ের ভাগ্যকে পরবর্তী নির্বাচনের উপর সমর্পিত করার পিছনে একাডেমিক কাউন্সিলের রাজনৈতিক অভিসন্ধির ব্যাপারটি আর গোপন থাকল না। রাজ্য ভাষা আইনের বিধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কার্যত ভাষা আন্দোলনে রক্ত ঝরিয়ে কাছাড় যে-অধিকার অর্জন করেছিল তাকেই অপমান ও অস্বীকার করা হল। রাজ্য সরকারও বললেন যে, সমগ্র আসাম ও কাছাড়ের জন্য অসমিয়া ভাষায় পঠন-পাঠন হবে বাধ্যতামূলক। স্বভাবতই কাছাড় জেলাবাসীকে তার অধিকার আদায়ের জন্য পুনরায় আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে হল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বহুল প্রচারিত অসমিয়া সংবাদপত্রগুলি রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে ও একাডেমিক কাউন্সিলের ভূমিকাকে অসমিয়া জাতীয়তাবাদের অনুকূল স্বার্থে ব্যবহার করার লক্ষ্যে উত্তেজক পরিস্থিতিকে ধরে রেখে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়াতে লাগল।

৬ জুন ৭২, *The Assam Tribune* পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হল, "If the University

wants to solve it on the basis of the Assam Official Language Act of 1960, a scope of political difficulties, though these connot be foreseen and defined at this stage, is likely to rise in the course of implementation. One should not be surprised if in the process a miniature type of University with Bengali as the medium of instruction tends to grow within the Gauhati University itself if Bengali is made another medium of instruction in certain areas under its jurisdiction."

৭ জুন '৭২ 'নীলাচল' পত্রিকা সম্পাদকীয় কলামে লিখল, "অসমত এই উত্তেজনার প্রধান উৎস হ'ল বাংলাভাষী কছার জিলাখন। ভাষার ভিত্তিত রাজ্যসমূহর পুনর্গঠন করার সময়ত এই জিলাখন অসমর পরা বাদ দিয়া হলে অসমত ভাষা সমস্যাটোর জটিলতা বহুখিনি কমিলহেঁতেন বুলি আশা করিব পারি। নানা রাজনৈতিক কারণত সেইটো করিবর সময় এতিয়াও পার হৈ যোৱা নাই। সম্ভব হলে কছার জিলাখন এতিয়াও অসমর পরা বাদ দিয়াটো উচিত বুলি আমি ভাবোঁ।"

১৮ জুন, শিলচরের পৌর সভাপতি দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের আহ্বানে হাইলাকান্দির পৌর সহ-সভাপতি হরিদাস দেবের পৌরোহিত্যে, শিলচর শহরে রাজ্য সরকার ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কার্যকর গণ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেখা গেল যে, আলোচনার সূচনায়ই আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস ও সি পি এম, মুখ্যত এই দুই রাজনৈতিক দলের নেতা ও অনুগামীদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ ও মতপার্থক্য প্রবল হয়ে দাঁড়াল। বিধায়ক সুরঞ্জন নন্দী, সাংসদ নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যায় ভূমিকার নিন্দা করলেও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাকে সহানুভূতিশীল বলে বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের উপর সরকারি হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা কাছাড়বাসীর সমস্যার সমাধানকল্পে কাছাড়ের জন্য প্রয়োজনে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। সুপ্রিম কোর্টে হরিয়ানা মামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শিলচর গুরুচরণ কলেজের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করার যে প্রস্তুতি চলছে তাকে স্বাগত জানাতে তাঁরা সভাকে আহ্বান জানান এবং এই বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে কোনওধরনের আন্দোলনে যাবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এর পরই জোর বাক্-বিতণ্ডা সভার পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলল এবং প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোলের মধ্যে ২৮ জুন তারিখে 'কাছাড় বন্ধ' কার্যসূচি গ্রহণ করে এই 'বন্ধ'কে সফল করে তোলার জন্য 'কাছাড় জেলা সংগ্রাম কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে সভার কাজ শেষ করা হল। অপর পক্ষে কাছাড় জেলা ছাত্র ও যুব সংগ্রাম পরিষদ নামে আরও একটি ছাত্র কমিটি গঠন করা হল। ২০ জুন তারিখে করিমগঞ্জ মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠনের জন্য পৌর সভাপতি প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরীর আহ্বানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ প্রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অরবিন্দ চৌধুরী, সুরঞ্জন নন্দী, রথীন্দ্রনাথ সেন, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী সহ কংগ্রেস দলের নেতারাও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দ এই সভায়ও আন্দোলনের কার্যসূচির বিরোধিতা করে ২৮ জুনের কার্যসূচি বাতিলের দাবি করেন। প্রচণ্ড বাদানুবাদের পর আন্দোলন বিরোধীদের দাবি অগ্রাহ্য করে করিমগঞ্জ মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে ছাত্র যুব সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি ওঠে এবং সেদিনের মত বাধ্য হয়ে সভার কাজ স্থগিত রাখতে হয়। পরদিন প্রাক্তন সাংসদ সুরেশ চন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে করিমগঞ্জ পৌরসভা ভবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিভিত্তিক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২৭ জন সদস্যকে নিয়ে মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সিদ্ধান্ত হয় যে ছাত্র যুব সংগ্রাম পরিষদ মহকুমা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশানুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে।

প্রস্তাবিত 'কাছাড় বন্ধ'-এর কার্যসূচিকে সফল করে তুলতে ২৫ জুন শিলচর গান্ধীবাগে এক প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনেও বন্ধ পালনের কার্যসূচি প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়ে কংগ্রেস দলীয় প্রতিনিধিরা সোচ্চার হয়ে উঠলে সভার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তীব্র বাদানুবাদের পর ২৪ ঘণ্টার কার্যসূচিকে ১২ ঘণ্টার করে প্রস্তাবিত বন্ধ পালনে সকলপক্ষ একমতে পৌঁছান। এরপরই স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাজ কী ধরনের হবে এ নিয়ে তুলকালাম বেঁধে গেল। শেষ পর্যন্ত ২৮ জুনের বন্‌ধ-এর কার্যসূচি সফল হলেও রাজনৈতিক বিরোধ প্রবল হয়ে দেখা দিল। সেদিন অপরাহ্নে করিমগঞ্জে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জনসমক্ষে দলীয় কোন্দলের নগ্ন স্বরূপটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ৭ জুলাই তারিখে সংগ্রাম পরিষদের অধিবেশন বসে হাইলাকান্দি শহরে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী। অধিবেশনের শুরুতে ২৫ জুন তারিখে প্রস্তাবিত সংগ্রামের নীতিবিষয়ক খসড়া দলিল উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ২ জুলাই তারিখে শিলচরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস দলের গণ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে চূড়ান্ত দলিল রচনার দাবি ওঠে। অনেক ঝামেলার পর ৫ সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটি চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিল করলেন। এই প্রস্তাবে উল্লিখিত রাজনৈতিক দলের আচরণবিধির বাধ্যবাধকতা নির্দেশক অংশটির বিরোধিতায় সি পি এম দলের প্রতিনিধিরা সোচ্চার হয়ে উঠলে সভায় পুনরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটি আচরণবিধি গৃহীত হয় এবং পরবর্তী অধিবেশন বদরপুরে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬ আগস্ট বদরপুরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনেও রাজনৈতিক বিরোধ এড়িয়ে সংঘবদ্ধ সংগ্রামী ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই অধিবেশন কংগ্রেস দল সম্পূর্ণভাবেই বয়কট করল। এদের অনুপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই সংগ্রাম পরিষদ ৩০ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কার্যসূচির মধ্যে গণ সাক্ষর সংগ্রাম অভিযান, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট স্মারকপত্র প্রদান, ১২ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত জেলার সরকারি কার্যালয়সমূহের সম্মুখে ২ ঘণ্টার গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন, ২২ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত গণ অবস্থান ও সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২ আগস্ট তারিখে করিমগঞ্জ ফৌজদারি কার্যালয়ের সম্মুখে অবস্থানরত সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ আকস্মিকভাবে বিনা প্ররোচনায় লাঠি চার্জ করে ও নিপীড়ন চালায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সমগ্র শহরে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। এদিন বিকালে এক প্রতিবাদ সভায় পুলিশি অত্যাচারের নিন্দা করে ঘটনার তদন্ত দাবি করা হয়। সভায় ১৪ আগস্ট তারিখে সর্বাত্মক বন্‌ধ ও ধর্মঘটের কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কার্যসূচীতে সামিল না-হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আন্দোলন বিরোধীপক্ষ জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাল। এ বন্ধের আবেদন ও পাল্টা আবেদনের ফলে স্বভাবতই জনমনে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভাষার অধিকারকে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের উদ্যত খড়্গের হাত থেকে বাঁচাতে দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই করিমগঞ্জ তথা কাছাড়বাসী কামনা করে। একষট্টি সালের ভাষা আন্দোলন তার রক্তে যে সংগ্রামী চেতনার জন্ম দিয়েছিল, বর্তমান আন্দোলনের মধ্যে দলীয় রাজনীতির কদর্য কোন্দল সেই চেতনাকে জাগিয়ে তোলা তো দূরের কথা শ্রদ্ধাবোধটিকে পর্যন্ত ধূলায় লুণ্ঠিত করল। বিভ্রান্ত ও ত্রাসিত মানুষের মনে যে শংকা ছিল পরদিন তাই বাস্তবে পরিণত হল।

১৪ আগস্ট '৭২, সকাল দশটা থেকে শুরু হল ধর্মঘট। সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁদের কার্যসূচিকে সফল করে তুলতে অফিস-আদালতের সামনে পিকেটিং করে চলেছেন। দু-একটি সরকারি কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ধর্মঘট বিরোধীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বিক্ষিপ্ত বচসাও চলছে। এভাবেই

কাটল একঘণ্টা কাল। বেলা এগারোটার পর পরই সুভাষ নগরে পূর্ত বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দুই দলের বিরোধ হঠাৎ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। খবর পেয়ে সংগ্রাম পরিষদের নেতারা দ্রুত সেদিকে ছুটে গেলেন, কিন্তু পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক অঘটন, ঘাতকের হাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সংগ্রাম পরিষদের যুব নেতা বাচ্চু চক্রবর্তী। মুহূর্তে সমগ্র শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। জারি করা হল কাফু। ১৬ আগস্ট রাত ১২-৩০ মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অকালে ঝরে পড়ল একটি জীবন। রাজনৈতিক ন্যস্ত স্বার্থ ৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী ঐক্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য বরাক উপত্যকার বুকে যে-ভ্রাতৃঘাতী বীজের জন্ম দিয়েছিল, সেই বীজই মহীরুহ হয়ে বাচ্চুর বুকে বিষ ছোরা হয়ে আঘাত হানল।

২২ সেপ্টেম্বর, শিলং-এ শরৎ চন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভা আহ্বান করা হল। সভায় শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে বিস্তর বিতর্কের পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, "অসমিয়া ভাষা এবং বিকল্প হিসাবে ইংরাজী হবে গৌহাটি ও ডিব্রুগড় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম। বাংলাভাষী কাছাড় জেলায় একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হবে।"

সভাশেষে তথ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়া বললেন যে, কাছাড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সেটা কাছাড়বাসী স্থির করবেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এই সভায় আসামের সাংসদরাও সেদিন আমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত ছিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর, শনিবার আসাম রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের গৃহীত সিদ্ধান্তটি প্রস্তাবাকারে পেশ করা হলে মাত্র ত্রিশ মিনিটের মধ্যে অতি দ্রুত অনুমোদন লাভ করে। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত এই অনুমোদিত বিলের বক্তব্য ছিল এই যে, "Resolution : On the University Medium Issue adopted by Assam Legislative Assembly on September 23, 1972.

This Assembly do now resolve that the medium of instruction at the University stage for the Gauhati and Dibrugarh University should be Assamese. English should however be continued as the medium of instruction.

In the spirit of the official Language Act, this Assembly do further resolve that a separate University be set up to territorial jurisdiction over the district of Cachar and that the Govt. of India be moved in the matter."

সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩০ ধারায় গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কলেজ থেকে যে মামলা করা হয়েছিল, ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে একাডেমিক কাউন্সিলের এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী না করার নির্দেশ প্রদান করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে কাছাড়ের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-প্রস্তাব রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হয়েছিল তার প্রতিবাদে 'সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা' (আসু) সমগ্র রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ১ অক্টোবর রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শিলচর শহরে 'সমগ্র কাছাড় জেলা গণতান্ত্রিক কনভেনশন' আহ্বান করেন। এই অধিবেশনে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বলা হয় যে, রাজ্যের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে কাছাড়ের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব একটি ভাঁওতা মাত্র। অধিবেশনে এই বলে দাবি করা হয় যে, রাজ্যের প্রধান সংখ্যালঘুর ভাষা বাংলাকে সমগ্র রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা হোক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুর ভাষাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত সরকারি প্রস্তাবটি প্রত্যাহারেরও আহ্বান জানানো হয়। ৫ অক্টোবর তারিখে আসু পুনরায় সমগ্র রাজ্যব্যাপী বন্ধ আহ্বান করে। গৌহাটি, তেজপুর ও ডিব্রুগড় থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদপত্র শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে একমাত্র অসমিয়া ভাষার ব্যবহার

নিশ্চিত করতে কাছাড়ের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানিয়ে বাঙালির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। উগ্র জাতি বিদ্বেষের আগুন আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিরপরাধ বাঙালির ঘর বাড়ি জ্বালাতে শুরু করে দিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আন্দোলন আর হাঙ্গামা আবার সমার্থক হয়ে দেখা দিল। প্রথমদিনই মঙ্গলদৈ, খারুপেটিয়া আর ডবকায় সন্ত্রাস শুরু হল। পরদিন চাপারমুখ, ধিংবাজার, নগাঁও, বরপাথার, রহা, সরুপাথার, হোজাই, ডিব্রুগড় প্রভৃতিতে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল। হোজাই শহরে বাঙালির ঘরবাড়ি লুটপাট, দাঙ্গা ও অগ্নিসংযোগ করতে এসে হামলাবাজদের নেতা অনিল বরা নিখোঁজ হয়। পুলিশ দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে না গিয়ে অত্যাচারিতদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ-প্রশাসন-উগ্রজাতীয়তাবাদ-দাঙ্গাবাজ একজোট হয়ে রাজ্যের অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাল। বাঙালি আবার উদ্বাস্তু হল। লামডিং, ডিমাপুর, আলিপুর দুয়ার, কাছাড় - প্রভৃতি নিরাপদ অঞ্চলে নিপীড়িত হতভাগ্যরা আশ্রয়ের সন্ধানে আবার ছুটতে লাগল। ইতিমধ্যে ধুবড়ি, বিলাসীপাড়া, গোলাঘাট, নলবাড়ি, তিনসুকিয়া প্রভৃতি স্থানে অবাধ অত্যাচার, হত্যা ও লুণ্ঠনের রাজত্ব চলতে লাগল। ১৪ অক্টোবর তারিখে বকপাড়া চা বাগানে ঘাতকের হাতে নিহত হলেন ডাঃ মনীষ দাস। এই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, এরপর থেকে তার আর খোঁজ মেলেনি। আসামের ভয়াবহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদকে প্রেরণ করলেন। এরপর এলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামনিবাস মির্ধা, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব গোবিন্দ নারায়ণন। নেতৃবৃন্দ উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন-নিবেদন করেন, কিন্তু দাঙ্গাবাজদের উন্মাদনায় এতটুকু ভাঁটা পড়ল না। 'নীলাচল' পত্রিকায় (২৫ অক্টোবর সংখ্যায়) আসুর আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে লেখা হল, 'স্বাধীনতার পূর্বে শ্রীহট্ট জেলাখন যেতিয়া অসমর লগত আছিল, তেতিয়া অসম উপত্যকার সকলো ন্যায্য দাবী আরু আশা-আকাঙক্ষার বিরুদ্ধে পদে পদে বাঁধার সৃষ্টি করিছিল এই এখন মাত্র জিলাই। সেই তিক্ত স্মৃতি অসমিয়া জাতির মনর পরা কেতিয়াও সহজে মটখাই যাব নোয়ারে। অসমর ডিঙিত গলগ্রহ দরে লাগি ধরা এই জিলাখনক কেতিয়া কেনেকৈ ছিঙি দলিয়াই পেলাব পারি সেইটোয়ে আছিল তেতিয়া অসমিয়াসকলর অন্যতম প্রধান চিন্তা। ঘটনাক্রমে শ্রীহট্ট জিলা নিজে নিজেই এদিন অসমর পরা আঁতরি যাব লগা হল। কিন্তু শ্রীহট্ট জিলাই এরি থৈ যোৱা সেই প্রাচীন ভূমিকাত এতিয়া অবতীর্ণ হৈছে কাছাড়। আর এরিলেও কর্পটিয়ে নেযার দরে প্রাচীন শ্রীহট্টবাসীসকলেই ব্যাপক প্রব্রজনর দ্বারা কাছাড় দখল করি ঠিক অতীতর দরে অসমর চুকতে থাকি বুকত কামোরার চেষ্টা করি যাব ধরিছে। ... আমি ছাত্র সমাজর নেতৃত্বত চলা ভাষা আন্দোলনর মৌলিক লক্ষ্যটো সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিও অসমর ভাষা সমস্যার স্থায়ী আরু চূড়ান্ত সমাধানর কারণে কাছার জিলাক অসমর পরা বিচ্ছিন্ন করি দিবার পোষকতা করোঁ।"

অসমিয়া সংবাদপত্রগুলিতে ছাত্র আন্দোলনের নামে সংঘটিত দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজ-কর্মে লিপ্ত কুকর্মকে সমর্থন জানিয়ে উগ্র জাতি বিদ্বেষ প্রচার হতে থাকলেও আসাম সরকার এ ধরনের সংবাদের প্রতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে উদাসীন থেকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করলেন। এ-ধরনের নীচ পক্ষপাতমূলক দুরভিসন্ধির প্রতিবাদে কলকাতা ও দেশের অন্যত্র সমালোচনার ঝড় উঠলে আসাম সরকার এই নিষেধ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। ২৪ অক্টোবর আসামে সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ কমিটির প্রতিনিধি দল কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এর প্রতিকারের দাবি জানিয়ে ঘটনাবলির নিরপেক্ষ তদন্ত প্রার্থনা করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সোনারাম থাউসেন, চরণ নার্জারী, সমর ব্রহ্ম, তারাপদ ভট্টাচার্য, কালীপদ ঘটক, সাধন সরকার ও রথীন্দ্রনাথ সেন। ৩ ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস সভাপতি শংকর দয়াল শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওম মেটা ও মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ কাছাড় সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে কাটিগড়ায় বিশাল গণ বিক্ষোভের সম্মুখীন হন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনরোষ

এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, বাধ্য হয়ে তিনি শিলচরের পথ ছেড়ে হাইলাকান্দির দিকে ছুটে যান। এদিকে শিলচর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তারাপুরে শর্মার গাড়ি অবরোধ করে ক্ষুব্ধ উত্তেজিত জনতা আসামের পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান দাবি করেন। জনরোষে এখানে শর্মার গাড়ি সেদিন ক্ষতিগ্রস্তও হয়। এরপরই শুরু হয় নির্বিচার পুলিশি তাণ্ডব। এদিন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রজিৎ যাদব গুয়াহাটিতে ছাত্র আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানান। এরপর ৬ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী এলেন আসাম সফরে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে একশ্রেণীর কংগ্রেসি জড়িত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। 'সদৌ অসম ছাত্র সংস্থা'র প্রতিনিধি দল রাজ্য বিধানসভা থেকে বিগত ২৩ সেপ্টেম্বরে গৃহীত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার দাবি জানালে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে তাঁর ক্ষোভ ও অসম্মতি ব্যক্ত করেন। দেখা গেল যে, প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের পরদিন থেকেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হাঙ্গামা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ১১ নভেম্বর শরৎ চন্দ্র সিংহ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন যে, রাজ্যের সব অনসমিয়া স্কুলগুলিতে অসমিয়া ভাষা অবশ্য পাঠ্য করা হবে। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাষা সমস্যার সমাধান করা হবে। ২৩ সেপ্টেম্বরে গৃহীত বিধানসভার প্রস্তাব আগামী অধিবেশনে পুনর্বিবেচনা করা হবে। কার্যত আসুর দাবির প্রতি আনুগত্য জানিয়েই মুখ্যমন্ত্রী উগ্রজাতীয়তাবাদীদের স্বার্থ পুনরায় রক্ষা করতে অগ্রণী হলেন। সে দিনই গভীর রাতে ২-৪৫ মিনিটে এক জরুরি সভা আহ্বান করে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে আসু আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

এদিকে কাছাড় জেলায় ছাত্র যুব সংগ্রাম পরিষদ ও কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে নতুন করে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির নেতৃত্বে ডিসেম্বর মাস থেকে সমগ্র জেলায় পুনরায় হরতাল-বন্ধ-বিক্ষোভ-মিছিল প্রভৃতি কার্যসূচি পালিত হতে লাগল। ৩ জানুয়ারি '৭৩, কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিদের এক দল প্রধানমন্ত্রী সকাশে দিল্লি যাত্রা করলেন এবং উদ্ভুত সমস্যাবলির নিরসনে দ্রুত হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানালেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষ করে নেতৃবৃন্দ কাছাড় জেলার জনগণের নিকট আন্দোলন প্রত্যাহার করার আহ্বান রাখলেন। ৪ জানুয়ারি শিলচর ও হাইলাকান্দিতে আটজন বামপন্থী নেতাকে MISA আইনে গ্রেপ্তার করা হল। ২৩ মার্চ বিরোধী রাজনৈতিক দলের আহ্বানে সমগ্র কাছাড় জেলায় পালিত হল বন্ধ। ১৬ মার্চ তারিখে বসল রাজ্য বিধানসভার বৈঠক। ১৭ ও ১৮ এপ্রিল শিলং-এ সংগ্রাম পরিষদ সমন্বয় কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে সি পন্থও বৈঠকে বসলেন। এই আলোচনা বৈঠকে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, মাধ্যমিক পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষার স্থান কী হবে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এলাকাগুলির উন্নতি বিধানে কী ব্যবস্থা কার্যকরী করা উচিত- এই তিনটি বিষয় চুক্তিপত্রে বিশদ স্থান পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে বলা হল : - "the State Govt. has respected the decisions of the Academic Councils of the two Universities. The Dibrugarh University has recently revised its earlier decision, and included English as an alternative medium for a period not exceeding 10 years on the lines of the Gauhati University. This is a welcome step.

The leaders of Cachar have welcomed the decision of the Dibrugarh University regarding English but have expressed their desire and hope that both the Universities of Gauthati and Dibrugarh will continue English as a medium on a long term basis. The leaders of Cachar have pressed for the special need of Cachar regarding the medium of instruction in their colleges. It may be recalled that the Assembly had earlier adopted a resolution

on the 23rd September, 1972 proposing to set up a seperate University for Cachar. As this could not be put into effect the Assembly rescinded this resolution. Let us hope that with the all round improvement in the atmospher and growing Understanding and good will, the leaders of Cachar would take up this matter with the Universities who are primarily concern with taking a decision in the matter of medium. In the process of finding an amicable solution the Govt. of Assam, the Govt. of India and the Academic community of the country will naturally extend all possible co-operation."

"Regarding the study of the regional language in the Secondary stage, there appears to be some reservation in the minds of some linguistic minority groups. The growth and study of the mother tongue and the regional language are complementary. In fact the linguistic minorities would themselves benefit by learning the regional language. The Chief Minister has, however repeatedly clarified that for practical considerations it will not be possible for the state Government to introduce a compulsory study of the regional language for the current year. Also in accordance with the wishes of the Cachar leaders, the Ministry of Home Affairs have to give their interpretation of Shastri formula in the context of all developments including the Assam Official language Act and the latest policy of the Govt. of India. Therefore, this issue is not an immediate one. The circular of March 30, 1973 defining the curriculum has caused some unintended misunderstanding and is therefore being suitably revised." [চুক্তিপত্রের অংশবিশেষ]।

এই পত্রে স্বাক্ষরকারীরা হলেন মুখ্যমন্ত্রী শরৎ চন্দ্র সিংহ, মৈনুল হক চৌধুরী এম পি, মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী, এম এল এ ও সভাপতি কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ, নীহাররঞ্জন লস্কর, এম পি, বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এম এল এ, মহীতোষ পুরকায়স্থ মন্ত্রী, আসামের শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্র নাথ তালুকদার, সুনীল রায়, সম্পাদক, কাছাড় জেলা ছাত্র-যুব সংগ্রাম পরিষদ, যতীন্দ্ররঞ্জন দে, তারাপদ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক, কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ, মতিলাল জায়গীরদার ও আব্দুল কায়ুম চৌধুরী।

স্বাক্ষরিত এই চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন পর্ব শেষ হল, কিন্তু যথার্থ অর্থে দাবি পুরণ হল না। কাছাড়বাসীর জন্য রাজ্য পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একদিকে আসু ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন, অপরদিকে কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গটি বাতিল হয়ে গেল। শিক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে সংখ্যালঘুর ভাষিক অধিকারের দাবিকে উপেক্ষা করে গৃহীত সিদ্ধান্তে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলেও আগ্রাসন কিন্তু বন্ধ থাকল না। শিক্ষার মাধ্যমকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ঘোষিত বৈষম্যমূলক ক্যারিকুলামের বিরুদ্ধেও রাজ্যের অনসমিয়া ভাষিক গোষ্ঠীকে লড়াই করতে হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর, '৭২-এর ক্যারিকুলাম, ৩০ মার্চ '৭৩-এ সংশোধন করে পুনরায় ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে পরিবর্তন করা হল। এ-ধরনের বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পিছনে একটি মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল, আর তা হল অসমিয়াকরণ। আবশ্যিক পাঠ্যরূপে অসমিয়া ভাষাকে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণী থেকে প্রচলন করার কারণরূপে বলা হল যে, আগামী দশ বছর পর যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেকে ইংরাজী মাধ্যম তুলে দেওয়া হবে তখন অনসমিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। অসমিয়াকরণের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকার জনগণ বিশেষ করে শিক্ষক সমাজ দৃঢ়

প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং ৪ ফেব্রুয়ারি '৭৩ তারিখে করিমগঞ্জে সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের এক গণ অভিবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবিত ক্যারিকুলাম বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অসমিয়ার সঙ্গে ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দিকে বিকল্প স্থায়ী মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার এক প্রস্তাব এই অভিবর্তনে গৃহীত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য মেহরাব আলি লস্করের সভাপতিত্বে 'শিক্ষক সমন্বয় সমিতি' গঠন করে বিভিন্ন কার্যসূচিও গৃহীত হয়। সমন্বয় সমিতির আহ্বানে সমগ্র উপত্যকার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলি এই ক্যারিকুলাম প্রত্যাখ্যান করে। বাধ্য হয়ে সরকার ও শিক্ষাপর্ষদ ক্যারিকুলামের অসমিয়া ভাষা সংক্রান্ত অংশের প্রয়োগ স্থগিত রাখেন। রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বারবার নির্দেশনামা ঘোষণা ও চাপের মুখে তা স্থগিত রাখা একটা সাধারণ নিয়ম হয়ে পড়ায় বরাক উপত্যকার শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী সমাজ কার্যকরী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে এক অধিবেশনে 'শিক্ষক সমন্বয় সমিতি'-কে 'শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি' নামে রূপান্তরিত করেন। ১৯৭৭-এর ১৫ নভেম্বর ক্যারিকুলাম সমস্যার সমাধানকল্পে শিক্ষা পর্ষদ ও শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতিকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শরৎ চন্দ্র সিংহ এক যৌথ বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে মুখ্যত আঞ্চলিক ভাষার সংজ্ঞা নিয়ে কোনও ঐকমত্য না হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এ-ব্যাপারে নির্দিষ্ট বাখ্যা চেয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত না-জানা পর্যন্ত ক্যারিকুলামে উল্লিখিত অসমিয়া ভাষাকে আবশ্যিক করা সংক্রান্ত বিধি স্থগিত রাখা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। প্রকৃত পক্ষে ৬১ সালে গৃহীত শাস্ত্রী সূত্রের বিধানকে অগ্রাহ্য করেই এ-ধরনের একটি সিদ্ধান্ত আলোচনা সভায় চাপিয়ে দেওয়া হল। এরপর আবার ২৪ ডিসেম্বর '৮২ তারিখে রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করলেন যে, বিদ্যালয়গুলির পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে অসমিয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে শিক্ষান্ত পরীক্ষায় এই ভাষা তৃতীয় ভাষা রূপে পরীক্ষিতও হবে। এই অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকায় তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপিত হল এবং ১৯৮৩ সালের ১৪ মে শিলচর শহরে এক গণ অভিবর্তনে এই নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রয়োজনে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ৫ আগস্ট তারিখে শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকীয়ার নিকট প্রদত্ত এক স্মারকপত্রে শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ প্রত্যাহার করার ও ক্যারিকুলাম বাতিলের দাবি জানালে মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি স্বীকার করে নেন।

এদিকে ১৯৭৯ সালে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন শুরু হলে সমগ্র রাজ্যে বিশেষত বাঙালি জাতির উপর আবার আঘাত নেমে এল। নিরবিচ্ছিন্নভাবে যে-জাতিগত বিদ্বেষ, হিংসা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব আবার এই অভিশপ্ত রাজ্যের উপর জেগে উঠল তার বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী অসমিয়া সমাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসে এগিয়ে এলে তাঁদেরও নির্যাতিত হতে হল, এমনকি অনেককে প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দিতে হল। আসামে নাগরিক জীবনের এই চরম সংকট সময়ে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, মানবাধিকারের দাবিতে ১৯৮৪ সালের ১১ ও ১২ আগস্ট, শিলচর শহরে নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটির 'বরাক উপত্যকা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্যর্থ হল সকল আবেদন-নিবেদন, জয় হল উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদের। ১৫ আগস্ট, ১৯৮৫, নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে নিখিল আসাম ছাত্র সংস্থা আর নিখিল আসাম গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আসাম চুক্তি নামে কথিত এই চুক্তির ফলে সমগ্র রাজ্যে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে শঙ্কা ও ত্রাস দেখা দিল। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেন অসম গণ পরিষদ দল। উগ্র অসমিয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের হাতে রাজ্যের ভাগ্য হল সমর্পিত।

আসাম চুক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্য জুড়ে শুরু হল প্রতিবাদ আন্দোলন। ২২ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল ছাত্র-যুব সংগ্রাম কমিটির গণ অভিবর্তন। এই অভিবর্তনে আসাম চুক্তি বাতিলের আহ্বান

জানিয়ে ছয়দফা দাবি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তাব গৃহীত হল। শিক্ষা সংরক্ষণ সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন থেকেও আসাম চুক্তির প্রতিবাদে ঝড় উঠল। এরই মধ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি '৮৬ তারিখে আসাম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ক্যারিকুলাম সংক্রান্ত আবারও এক নির্দেশ জারি করল। এই নির্দেশনামার প্রতিবাদে বরাক উপত্যকায় আবারও সংগঠিত হল প্রতিরোধ আন্দোলন। ৬১ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদের রক্তের মূল্যে বরাক উপত্যকাবাসী যে-অধিকার আদায় করে নিয়েছিল, সেই অধিকারকে হরণ করে নিতে এবার সম্প্রসারণবাদী সরকার উদ্যত হয়েছে। এবার এই আগ্রাসন নীতির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নেতৃত্ব কাঁধে তুলে নিলেন ছাত্রও যুব সম্প্রদায়। শুরু হল সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ২১ জুলাই, আসামের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত এলেন করিমগঞ্জ সফরে। সেদিন বরাক উপত্যকার সংগ্রাম সমন্বয় সমিতি মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে ভোর পাঁচটা থেকে ১২ ঘণ্টার বন্ধ, মুখ্যমন্ত্রীকে কালো পতাকা প্রদর্শন ও তাঁর জনসভা বয়কট ইত্যাদি কার্যসূচি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ৫ এপ্রিল তারিখে প্রতিবাদী আন্দোলন দমন করতে শিলচর শহরে পুলিশ গুলি চালায়। ১১ জুলাই চলে ব্যাপক ধরপাকড়। সমগ্র উপত্যকায় ছাত্র যুব দল SEBA সার্কুলারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুললেন। সদৌ আসাম ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জ পৌঁছুলেন সকাল নটায়। টিলার উপরে পুরাতন সার্কিট হাউসে তিনি যখন অবস্থান করছিলেন তখন প্রায় ছ'শ গজ দূরে সমতল রাস্তায় নিরস্ত্র, অহিংস আন্দোলনকারীরা হাতে কালো পতাকা ধারণ করে, বুকে কালো ব্যাজ পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। পুলিশ বাহিনীর মধ্য থেকে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে অশ্লীল ভাষায় ঘন ঘন গালাগাল চলতে থাকলে, অপমানিত ছাত্রদল ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উপস্থিত নেতৃস্থানীয়দের তৎপরতায় তারা শান্ত হয় কিন্তু পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনও হুঁশিয়ারী নেই, সতর্কীকরণ নেই, হঠাৎই চলল ঝাঁক ঝাঁক গুলি। অব্যর্থ নিশানায় জীবন হারাল দুই তরুণ – জগন আর যীশু। শহর ছেড়ে পালালেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। রক্তের স্রোত, অত্যাচারিতদের যন্ত্রণা আর হাহাকারকে মাড়িয়ে পিছনে ছুটে গেল পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনী। উত্তেজিত জনতার ক্রোধে নিহত হল ক'টি নিরীহ পুলিশ কর্মী। এর পরের ঘটনাবলি হিংস্র হায়নাদেরও হার মানায়। মাতৃভাষায় মর্যাদা রক্ষায় যগন-যীশু শহীদ হল। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়, আর কত ? উগ্রজাতীয়তাবাদের আগ্রাসন, জাতি বিদ্বেষের রাজনীতি তরুণ প্রাণের তপ্ত রক্তপান — এসবই কি রাজনীতির স্বার্থে আবহমান কাল ধরে চলতেই থাকবে ?

'কাল প্রবাহে আরও একটি শতাব্দী বিদাল নিল। নতুন শতাব্দী অতীত রক্তের দাগ মুছে ফেলে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের রাখী বেঁধে দিক। চিরতরে অবসান ঘটুক সকল হিংসা আর বিদ্বেষের, — এই হোক পঞ্চদশ শতকের প্রার্থনা।